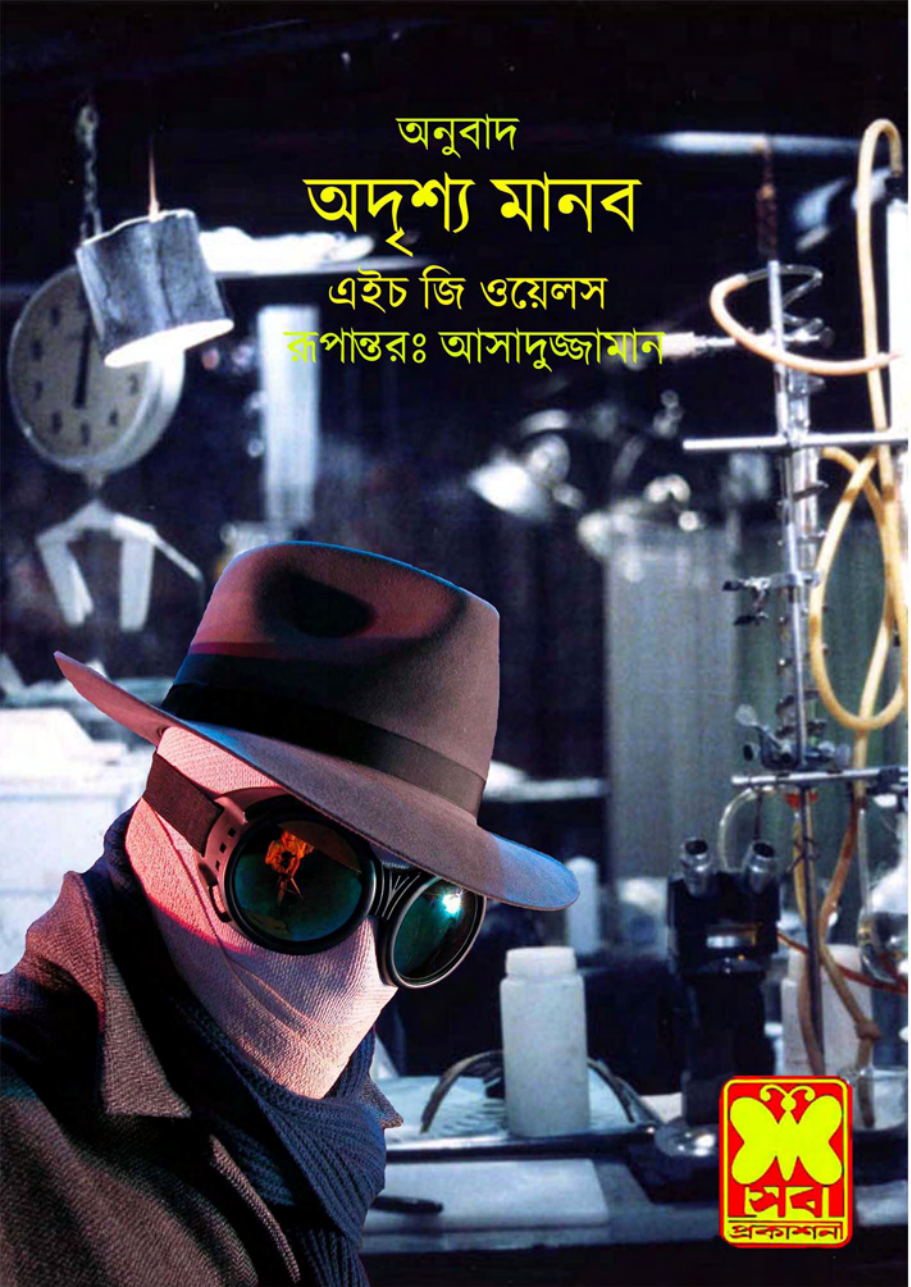

অনুবাদ

অদৃশ্য মানব

এইচ জি ওয়েলস

রূপান্তরঃ আসাদুজ্জামান

সেবা প্রকাশনী

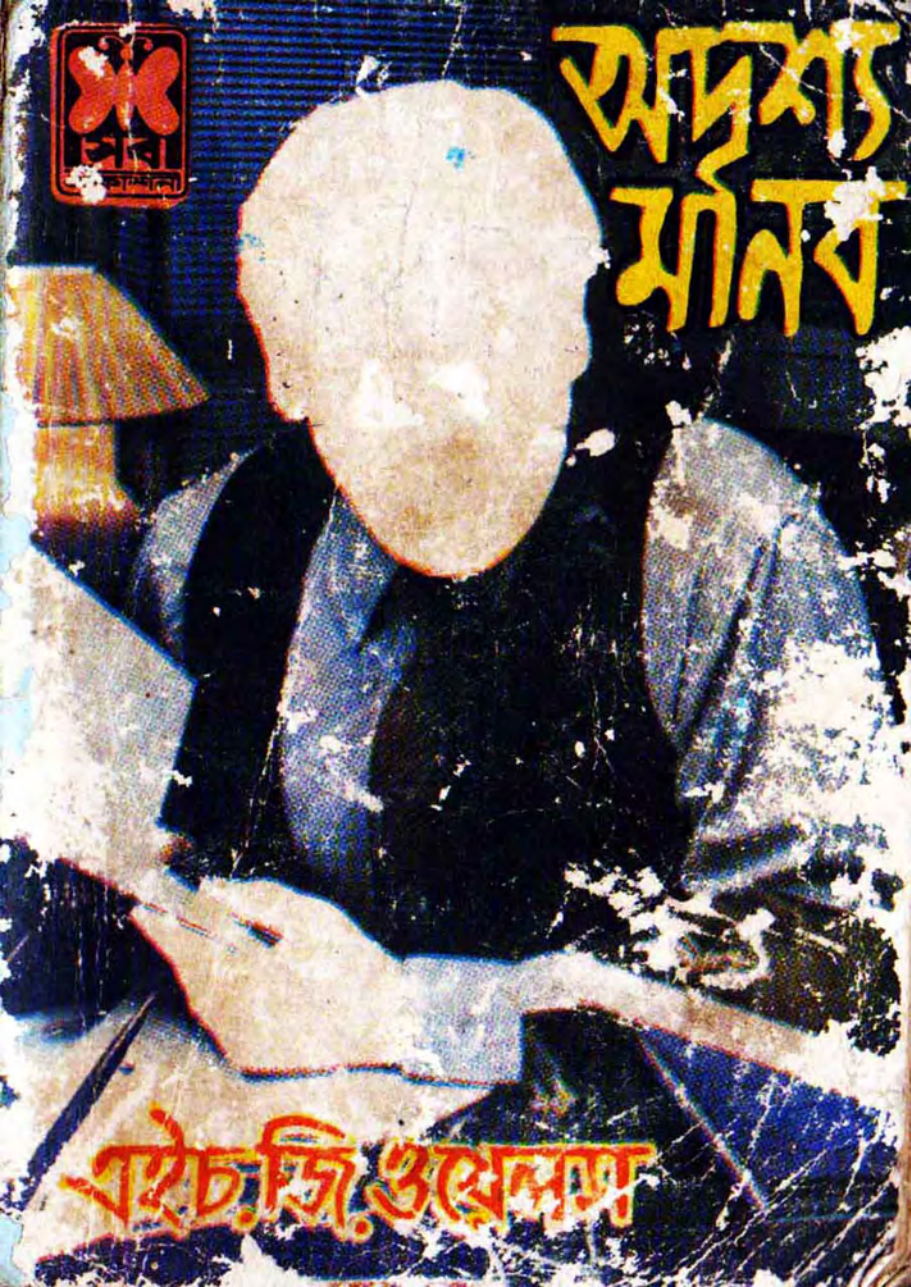

অদৃশ্য মানব
এইচ. জি. ওয়েলস

অনুবাদ

অদৃশ্য মানব

মূলঃ এইচ জি ওয়েলস
রূপান্তরঃ আসাদুজ্জামান

সাসেক্সের শান্ত নিরিবিলি গ্রাম আইপিংয়ে হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো অদ্ভুতদর্শন এক রহস্যময় অতিথি। সরাইখানার অন্ধকার পারলারে সারাদিন কি নিয়ে মগ্ন থাকে সে?
চারিদিকে জল্পনা কল্পনা, চাপা উত্তেজনা-
তারপর একদিন গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস, মহা আতঙ্ক।
ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল এক অত্যাশ্চর্য চমকপ্রদ কাহিনী।
সে কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনই করুণ। কিশোর পাঠকদের হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দেয়ার মত ক্লাসিক।
অসংক্ষেপিত, দক্ষ হাতের চমৎকার ঝরঝরে অনুবাদ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি অনুবাদ

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা—জিম করবেট/কাজী আনোয়ার হোসেন
আতংকের দ্বীপ—এইচ জি ওয়েলস/মুনতাসীর মামুন
ভয়াল উপত্যকা—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/মুনতাসীর মামুন
গড ফাদার—মারিয়ো পুজো/শেখ আবদুল হাকিম
পাতাল অভিযান—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
সাগর তলে—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
রহস্যের দ্বীপ—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
আশিদিনে বিশ্বভ্রমণ—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
গুপ্ত রহস্য—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
বেগমের রত্নভাণ্ডার—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
ড্রাকুলা—ব্রাম স্টোকার/রকিব হাসান
ছয় রোমাঞ্চ—গল্প সংকলন/কাজী আনোয়ার হোসেন
নাইজারের বাঁকে—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
মরুশহর—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
নোঙর ছেঁড়া—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
কারপেথিয়ান দুর্গ—জুল ভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান—মাইক জান/রকিব হাসান
হারানো পৃথিবী—স্যার কোনান ডয়েল/কাজি মাহবুব হোসেন
বিষবলয়—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/রকিব হাসান
স্টার ওয়রস—গ্যারি কুর্জ/রকিব হাসান
ট্রেজার আইল্যাণ্ড—রবার্ট লুই স্টিভেনসন/রকিব হাসান
অশুভ সংকেত—ডেভিড সেলজার/কাজি মাহবুব হোসেন
প্যাপিলন—হেনরী শ্যারিয়ার/রেজোয়ান সিদ্দিকী

অদৃশ্য মানব

এইচ জি ওয়েলস-এর জগদ্বিখ্যাত
কল্প-কাহিনী, দি ইনভিজিবল ম্যান।

রূপান্তর :

আসাদুজ্জামান

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

গ্রন্থস্বত্ব : সেলিনা সুলতানা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি, পি, ও বক্স নং ৮০৫

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

The Invisible Man
H. G. Wells
Trans : Asaduzzaman

অদৃশ্য মানব

রূপান্তর

আসাদুজ্জামান

এক

কনকনে বাতাস আর তুষারের মাতামাতির ভেতর ব্র্যাম্‌ব্‌লহার্স্ট রেলওয়ে স্টেশনের ঢালু পথ ধরে নেমে আসছে একটি লোক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহ কাপড়ে মোড়া। পুরু দস্তানায় ঢাকা হাতে ঝুলছে একটি ছোট কালো পোর্টম্যান্টো। শুধুমাত্র নাকের চকচকে ডগাটুকু ছাড়া লোকটির সম্পূর্ণ মুখ আড়াল হয়ে আছে নরম ফেল্ট হ্যাটের কিনারার নিচে।

ফেব্রুয়ারি মাস। বিদায় নেবার আগে পুরোদমে জেঁকে বসেছে শীত। হিহি করে কাঁপছে লোকটা, হাঁটছে একটু কুঁজো হয়ে। কাঁধের ওপর তুষার জমে আছে। হাতের পোর্টম্যান্টোর ওপরও মুকুটের মতো লেগে আছে তুষার।

ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে 'কোচ অ্যাণ্ড হর্সেস' সরাইখানার ভেতর ঢুকে পড়লো লোকটি। ধপ করে পোর্টম্যান্টো নামিয়ে রেখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'আগুন চাই! একখানা ঘর আর একটু আগুন!'

বার-এ দাঁড়িয়ে পা ঠুকে শরীর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেললো সে। তারপর মিসেস হল্‌-এর পেছন পেছন গেস্ট পারলারের ভেতর

ঢুকে পড়লো। দর কষাকষি হলো নামমাত্র। সমস্ত শর্তে খুব সহজে রাজি হয়ে গেল লোকটি। পকেট থেকে বের করে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা রাখলো টেবিলে। সরাইখানায় আশ্রয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

আগুন জ্বেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিসেস হল্। অতিথির জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করবে বলে সে ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছে। শীতকালে আইপিং-এ রাত কাটাবার মতো অতিথি লাভ করা রীতিমতো আশ্চর্যের ব্যাপার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দরকষাকষির ব্যাপারেও লোকটা প্রায় কোনো উৎসাহই দেখায়নি। এমন সৌভাগ্যের পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অন্যায়।

প্রায় হয়ে এসেছে বেকন। বাছা বাছা কিছু বকুনি খেয়ে কাজের মেয়ে মিলিও কুঁড়েমি ছেড়ে একটু সচল হয়ে উঠেছে। দস্তরখান, থালাবাসন, গ্লাসবাটি নিয়ে মিসেস হল্ পারলারের দিকে পা বাড়ালো।

ঘরে ঢুকে একটু অবাক হলো সে। কয়লার আগুন গনগনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আগন্তুক তখনও হ্যাট-কোট কিছুই ছাড়েনি। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে বরফ-পড়া দেখছে। হাতের জিনিসগুলো খুব যত্নের সঙ্গে এক এক করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলো মিসেস হল্। তারপর আবার ফিরে তাকালো লোকটির দিকে

দস্তানাপরা দু'হাত পেছনে রেখে তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো, লোকটার কাঁধের ওপর এখনও বরফের ছোট ছোট কুচি জমে আছে। সেগুলো গলে ফোঁটা ফোঁটা জল হয়ে ঝরে

পড়ছে কার্পেটের ওপর।

'আপনার কোট আর হ্যাট খুলে দিন,' বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললো মিসেস হল্, 'রান্নাঘর থেকে শুকিয়ে আনি।'

'না,' না ঘুরেই জবাব দিলো আগন্তুক।

মিসেস হলের মনে হলো লোকটি তার কথা ঠিকমতো শুনতে পায়নি। কথাটা আবার বলবার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় নড়ে উঠলো লোকটি। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পেছনে।

'এখন হ্যাট-কোট ছাড়তে চাই না আমি,' স্পষ্ট, দৃঢ় গলায় বললো সে।

মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো লোকটার চোখ জুড়ে গাঢ় নীল রঙের বিশাল চশমা। মুখের দু'পাশে কোটের কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে ঝাঁকড়া জুলপি। সব মিলিয়ে মুখটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে।

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে,' বললো মিসেস হল্। 'এক্ষুণি ঘর গরম হয়ে উঠবে।'

কোনো উত্তর না দিয়ে লোকটি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো। কথাবার্তা এখন এগোবে না বুঝতে পেরে মিসেস হল্ টেবিলের ওপর জিনিসপত্রগুলো আরেকবার দ্রুত হাতে ঠিকঠাক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আবার এসে একই দৃশ্য দেখতে পেলো মিসেস হল্। তেমনি পাথরের মূর্তির মতো অনড় দাঁড়িয়ে লোকটি। পিঠ সামান্য নুয়ে আছে, কোটের কলার তোলা, হ্যাটের কিনারা নিচের দিকে নামানো। মুখ-কান কিছুই নজরে পড়ে না।

বেশ শব্দ করে ডিম আর বেকন নামিয়ে রাখলো মিসেস হল্।

একটু গলা চড়িয়ে বললো, 'আপনার খাবার দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো। কিন্তু নড়লো না লোকটি।

মিসেস হল্ আর দাঁড়ালো না। বারের পেছনে কিচেনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ চামচ নাড়ার খড়খড় শব্দ শুনে আঁতকে উঠলো সে।

'ওই যে! কাণ্ড দেখ, একদম ভুলে গেছি। ছুঁড়িটা জ্বালিয়ে মারলো! ওর কুঁড়েমির জন্যেই—'

নিজেই মাস্টার্ড মেশাতে বসলো সে অগত্যা। কাজ করতে করতে ধারালো কিছু কথার ছুরি চালালো মিলিকে লক্ষ্য করে। নিজের হাতে মাংস আর ডিম রান্না করেছে, টেবিল সাজিয়েছে, সব করেছে যা যা দরকার,— আর সেখানে মিলি কী করেছে? না, এক মাস্টার্ড তৈরি করতেই এতক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে! আহা, কী চমৎকার কাজের মেয়ে! মাস্টার্ড-পট ভর্তি করে সেটাকে রাজকীয় ভঙ্গিতে একটা সোনালি-কালো চায়ের ট্রে-র ওপর বসিয়ে পারলারের দিকে চললো মিসেস হল্।

নক্ করে সোজা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। খেতে বসেছিল আগন্তুক। দরজা ফাঁক হতেই চট করে শরীর বাঁকিয়ে টেবিলের আড়ালে মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। মিসেস হল্ মুহূর্তের জন্যে শাদামতো একটা আবছা চেহারা দেখতে পেলো শুধু। মনে হলো লোকটা কিছু একটা তুলছে মেঝের ওপর থেকে।

টেবিলের ওপর মাস্টার্ড-পট নামিয়ে রাখতে রাখতে মিসেস হল্ লক্ষ্য করলো, আগুনের সামনে একটা চেয়ারের ওপর লোকটা হ্যাট-কোট খুলে রেখেছে। ভিজে বুটজোড়া ফায়ারপ্লেসের স্টীল ফেনডারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা—মরচে ধরাবার চমৎকার বন্দো-

বস্ত। এগিয়ে গিয়ে বেশ দৃঢ় গলায় বললো মিসেস হল্, 'এখন নিশ্চয় এগুলো শুকোতে নিয়ে যেতে পারি ?'

'হ্যাটটা রেখে যান,' কেমন যেন অপরিস্ফুট গমগমে স্বরে বলে উঠলো লোকটা।

ঘুরে দাঁড়ালো মিসেস হল্। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। মাথা তুলে চেয়ে আছে লোকটা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের নিচের দিকটায় চেপে ধরে রেখেছে একখণ্ড শাদা কাপড়। ঠোঁট এবং চোয়াল সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। কাপড়টা চিনতে পারলো মিসেস হল্। একখানা ন্যাপকিন। লোকটারই হবে হয়তো। ঠোঁট ঢাকা বলে গলার স্বর অস্বাভাবিক লাগছে। কিন্তু শুধু এটুকুই বিস্ময়ের কারণ নয় মিসেস হলের। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নীল চশমার ওপর লোকটির সমস্ত কপাল, মুখের দু'পাশ, এমন কি কান পর্যন্ত শাদা ব্যাণ্ডেজে মোড়ানো। শুধুমাত্র নাকের চকচকে লালচে ডগাটুকু ছাড়া মুখের কোথাও একবিন্দু জায়গা খোলা নেই। গাঢ় বাদামি রঙের মখমলের জ্যাকেট পরেছে লোকটি, লিনেনের লাইনিং দেয়া কালো রঙের উঁচু কলার সম্পূর্ণ গলা বেষ্টন করে আছে। ঝাঁকড়া কালো চুলের অসংখ্য কোঁকড়ানো ডগা ক্রসব্যাণ্ডেজ ছাড়িয়ে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে লোকটির চেহারা দাঁড়িয়েছে কিম্ভূতকিমাকার। ব্যাণ্ডেজে মোড়া, কাপড়ে ঢাকা সেই অদ্ভুত মুখের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো মিসেস হল্।

মুখ থেকে ন্যাপকিন সরালো না লোকটি, তেমনি চেপে ধরে রইলো বাদামি দস্তানা পরা হাত দিয়ে। গাঢ় নীল চশমার ভেতর দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে মিসেস হলের দিকে।

'হ্যাটটা রেখে যান,' বেশ স্পষ্ট গলায় আবার বললো সে। কাপড়ের নিচে ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলো।

মিসেস হল্ সামলে উঠতে শুরু করেছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারের ওপর হ্যাটটা আবার নামিয়ে রাখলো। 'আ-আমি জানতাম না, আপনার—' বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে থেমে গেলো সে।

'ধন্যবাদ,' ক র্কশ গলায় বললো লোকটি। মিসেস হলের মুখ থেকে তার দৃষ্টি স'রে গিয়ে দরজার ওপর পড়লো, সেখান থেকে ফিরে এসে আবার স্থির হলো মিসেস হলের মুখে।

'আমি ভালো করে শুকিয়ে আনছি এগুলো, এক্ষুণি,' বলে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালো মিসেস হল্। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় আরেকবার তাকালো সে ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো চশমা-ঢাকা মুখটার দিকে। এখনও যথাস্থানে ধরা রয়েছে ন্যাপকিনখানা। দরজা বন্ধ করবার সময় শরীরে একবার মৃদু কাঁপুনি অনুভব করলো মিসেস হল্। বিমূঢ় চেহারায় বিড়বিড় করতে করতে ধীরপায়ে কিচেনে গিয়ে ঢুকলো। এখন মিলি কোন্ জিনিসটা পণ্ড করছে তা-ও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল সে।

ঘরের ভেতর আগন্তুক চুপচাপ কান পেতে বসে রইলো কিছুক্ষণ। মিসেস হলের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে সতর্ক চোখে একবার জানালার দিকে তাকালো সে। তারপর মুখ থেকে ন্যাপকিন সরিয়ে আবার খেতে শুরু করলো। এক গ্রাস খাবার মুখে দিয়ে আবার সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো জানালার দিকে, তারপর আরেক গ্রাস মুখে দিলো। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ন্যাপকিন হাতে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। ব্লাইণ্ড টেনে নামিয়ে দিলো নিচের শার্সির শাদা মসলিনের পর্দা পর্যন্ত। ঘরে আধো-অন্ধকার নেমে এলো। টেবিলের কাছে

ফিরে এসে এতক্ষণে কিছুটা সহজ ভঙ্গিতে খেতে বসলো সে।

'বেচারা নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিল, কিংবা অপারে-শন-টপারেশন কিছু হয়েছে,' রান্নাঘরে আপনমনে বিড়বিড় করছে মিসেস হল্। 'উহ্, আরেকটু হলেই ভিরমি গিয়েছিলাম ব্যাণ্ডে-জের বহর দেখে!' আরো কিছু কয়লা আগুনে ফেলে ক্লোদ্স্-হর্সের ওপর লোকটার ভেজা কোট বিছিয়ে দিলো সে। মাফলার ঝুলিয়ে দিল এককোণে। 'আর কী চশমা! মানুষ বলেই মনে হয় না দেখতে! আবার সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছে ন্যাপকিনে, কথাও বলছে অমনি করে!···মুখ বোধহয় থেঁতলে গেছে—মা গো!' বলতে বলতে শিউ-রে উঠলো মিসেস হল্।

টেবিল থেকে থালাবাসন আনতে গিয়ে মিসেস হলের ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো। জ্বলন্ত পাইপ হাতে বসে রয়েছে আগন্তুক। এবার মুখের নিচের দিকটায় জড়িয়ে নিয়েছে সিল্কের মাফলার। মিসেস হলের সামনে সে একবারও পাইপ মুখে তুললো না। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে পাইপে টান দেবার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে, কিন্তু পাইপের আগুন ধীরে ধীরে নিভে আসছে দেখে লোক-টা যে মৃদু উসখুস করছে তা মিসেস হলের চোখ এড়ালো না। ঘরের এককোণে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে সে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের উষ্ণ আবহাওয়ায় তার চড়া মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। চশমার বিশাল কাচে লাল আগুনের শিখা প্রতি-ফলিত হয়ে ভয়াবহ নিষ্প্রাণ চাউনিকে সামান্য সজীবতা দিয়েছে যেন।

'আমার কিছু মালপত্র আছে,' কথা বলে উঠলো আগন্তুক, 'ব্রামব্ল্হার্স্ট স্টেশনে। কী করে আনানো যায় এখানে, বলতে

পারেন ?'

উত্তরে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললো মিসেস হল্।

ব্যাণ্ডেজ-মোড়া মাথা ভদ্রভাবে মৃদু নুইয়ে লোকটি বুঝতে পারার ভঙ্গি করলো। 'আগামীকাল!' বললো সে, 'তার আগে সম্ভব নয়?'

'না।'

একটু নিরাশ মনে হলো আগন্তুককে। 'ঘোড়াগাড়িতে তুলে জিনিসগুলো আজই এনে দিতে পারবে এমন কাউকে এখন পাওয়া যাবে না?' আবার জানতে চাইলো সে।

এবারও না-সূচক জবাব দিতে হলো মিসেস হল্‌কে। লোকটার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে মনটা তার উসখুস করছে। ঘোড়াগাড়ির প্রসঙ্গটা লুফে নিলো সে, 'বড্ড খাড়া রাস্তা। গত বছর একখানা গাড়ি ওখানেই তো উল্টে গিয়েছিল। এক ভদ্রলোক মারা পড়েছিলেন, কোচোয়ানও বাঁচেনি। কখন কী ঘটে তা কি বলা যায়! চোখের নিমেষে ঘটে যায় দুর্ঘটনা, ঠিক বলিনি?'

দুর্ভেদ্য চশমার ওপার থেকে স্থির তাকিয়ে থেকে মাফলারের ভেতর দিয়ে লোকটি শুধু বললো, 'হুঁ।'

'কিন্তু কিছু একটা হয়ে গেলে আবার সহজে রেহাই মেলে না। আমার বোনপো টমের হাত কেটে গেল একবার—কাস্তেয়। আছাড় খেয়ে কাস্তের ওপর পড়ে গিয়েছিল—মা গো! তিন মাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়, বিশ্বাস করবেন না আপনি। তারপর থেকে কাস্তে দেখলেই ভয় লাগে আমার।'

'বুঝলাম,' নির্বিকারভাবে আগন্তুক বললো।

'এমন হয়েছিল অবস্থা, শেষে আমরা তো ভেবেছিলাম অপারেশন ছাড়া গতি নেই।'

হঠাৎ চাপা গোঙানির মতো একটা হাসির শব্দ শোনা গেল মাফলারের নিচ থেকে। পরক্ষণেই হাসিটা চাপা দিয়ে ফেলে বললো আগন্তুক, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি হাসছেন, কিন্তু ওদের কাছে ব্যাপারটা হাসির ছিল না মোটেও। আমারও ভোগান্তি কম হয়নি। ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতো আমার বোন। আমাকেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হতো, আবার সেই ব্যাণ্ডেজ খুলতে হতো।' এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে আবার মুখ খুললো মিসেস হল্, 'তা আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সাহস করে একটা কথা—'

'দেশলাই হবে?' আচমকা বলে উঠলো আগন্তুক। 'আমার পাইপ নিভে গেছে।'

অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল মিসেস হল্। লোকটা অভদ্র, মনে মনে ভাবলো সে, নয়তো এতো কিছু বলার পরেও কেউ এমন করে থামিয়ে দিতে পারে? খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলো সে। স্বর্ণমুদ্রাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। চলে গেল দেশ-লাই আনতে।

ফিরে এসে দেশলাই নামিয়ে রাখতেই একটিমাত্র শব্দে ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটি মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অপারেশন, ব্যাণ্ডেজ এসব নিয়ে আলাপ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। 'সাহস করে একটা কথা' আর মিসেস হলের জিজ্ঞেস করা হলো না। মেজাজটা ভয়ানক বিগড়ে গেল। সম্পূর্ণ ঝালটা সে ঝাড়লো রান্নাঘরে বেচারা মিলির ওপর।

বিকেল চারটে পর্যন্ত পারলারের ভেতর একা বন্দী হয়ে রইলো

আগন্তুক। ভেতরে ঢোকার আর কোনো ছিটেফোঁটা অজুহাতও মিসেস হল্ ভেবে বের করতে পারলো না। ঘরের ভেতর কোনো সাড়াশব্দ নেই বললেই চলে। বোধহয় অন্ধকারে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে পাইপ টানছে লোকটা, কিংবা ঝিমোচ্ছে।

কয়লা উস্‌কে দেবার আওয়াজ শোনা গেল দু'একবার। এক-সময় মনে হলো, লোকটা ঘরের ভেতর পায়চারি করছে—আপন মনে কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। একটু পরেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠলো আর্মচেয়ারখানা। বসে পড়েছে লোকটা আবার।

দুই

চারটে বাজে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বসে বসে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে মিসেস হল্। ভাবছে, এখন একবার গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করা যায় চা খাবে কিনা। এমন সময় বারে ঢুকলো টেডি হেনফ্রে।

'উহ্,কী সাংঘাতিক আবহাওয়া, মিসেস হল্। এই হালকা বুটে আর চলছে না,' বললো টেডি হেনফ্রে। 'বাইরে আরো দ্রুত বরফ পড়ছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো মিসেস হল্। লক্ষ্য করলো, টেডি হেনফ্রে ব্যাগ নিয়ে এসেছে সঙ্গে। তার মানে ঘড়ি মেরামতের যন্ত্রপাতি সঙ্গেই আছে। একটা জিনিস মনে পড়ে গেল তার। 'যখন এসেই পড়েছেন, মিঃ হেনফ্রে,' বললো সে, 'তখন পারলারের ঘড়িটা একটু দেখে দিন দয়া করে। ঘড়িটা চলছে ঠিকমতো, ঘণ্টাও বাজে, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা ছ'টার ঘর ছেড়ে নড়ছেনা অনেকদিন হলো।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে টেডি হেনফ্রেকে। পারলারের দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আগুনের সামান্য লাল আভা ছাড়া ঘরের ভেতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। সবকিছু ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট মনে হলো মিসেস হলের কাছে। একটু আগে বার-ল্যাম্প জ্বালতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায়

আরো বেশি অসুবিধে হচ্ছে দেখতে। আগুনের সামনে চেয়ারে বসে বোধ হয় ঝিমোচ্ছে লোকটা, মাথাটা কাত হয়ে আছে একপাশে। আগুনের আলোয় চশমার নীল কাচ জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু নুয়ে পড়া মুখটা অন্ধকারে ঢাকা। মুহূর্তের জন্যে মিসেস হলের মনে হলো, বিশাল হাঁ হয়ে আছে লোকটার মুখ। মুখের নিচের দিকের প্রায় সমস্তটা গ্রাস করে নিয়েছে অসম্ভব প্রকাণ্ড সেই হাঁ। শাদা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো মাথা, বিশাল চশমা-ঢাকা চোখ, বিকট হাঁ সব মিলিয়ে বীভৎস, ভূতুড়ে একটা প্রাণী বলে মনে হলো লোকটাকে। পরমুহূর্তে নড়ে উঠলো সে, সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে, মুখে হাত চলে গেল দ্রুত।

মিসেস হল্ সম্পূর্ণ খুলে দিলো দরজা। ঘরে কিছুটা আলো এসে পড়লো। লোকটাকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হাত দিয়ে মুখের ওপর আবার আগের মতো মাফলার চেপে ধরে আছে। অন্ধকারে নিশ্চয় ভুল দেখেছে চোখে, মনে মনে ভাবলো মিসেস হল্।

'কিছু মনে করবেন না আশা করি, ইনি ঘড়িটা একটু দেখবেন।' সামলে উঠে কোনরকমে বললো সে।

'ঘড়িটা দেখবেন?' ঘুমঘুম ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতের ফাঁক দিয়ে লোকটা বললো। তারপর যেন সজাগ হয়ে উঠলো পুরোপুরি, 'অবশ্যই।'

মিসেস হল্ আলো আনতে চলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো লোকটা। টেডি হেনফ্রে এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আলো হাতে মিসেস হল্ ফিরে আসতেই দরজার দিকে এগিয়ে এলো। ঘরের ভেতর পা দিয়ে চমকে উঠলো সে সামনেই ব্যাণ্ডেজ-মোড়া অদ্ভুত একটা মুখ দেখে।

'গুড আফটারনুন,' আগন্তুক বলে উঠলো।

গাঢ় কাচের চশমা-পরা লোকটাকে দেখে মুহূর্তের জন্য হেনফ্রের মনে হলো, যেন বিশাল একটা গলদা চিংড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। 'আশা করি বিরক্ত হচ্ছেন না আপনি,' বললো সে।

'তা হচ্ছি না,' বলে আগন্তুক মিসেস হলের দিকে ফিরে তাকালো। 'তবে আমি ধরে নিয়েছিলাম এ-ঘরটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে দেয়া হয়েছে।'

'আমি ভাবলাম,' মিসেস হল্ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'ঘড়িটা সারিয়ে দিলে আপনার—' বলতে যাচ্ছিলো, 'সুবিধে হবে।'

'নিশ্চয়,' আগন্তুক বললো,'সেটা ঠিক—কিন্তু চুপচাপ একা থাকতেই পছন্দ করি আমি।' হেনফ্রের মধ্যে ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'তবে ঘড়িটা মেরামত করা হচ্ছে বলে আমি অবশ্যই খুশি হয়েছি।'

হেনফ্রে কাঁচুমাচু মুখে প্রায় বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল। লোকটার কথা শুনে আশ্বস্ত হলো।

ফায়ারপ্লেসের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে বেঁধে লোকটি আবার বললো, 'ঘড়ি মেরামত শেষ হলে আমি এক কাপ চা খেতে চাই।' মিসেস হল্ বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি আবার বললো সে, 'এখুনি নয়, ঘড়ি মেরামত শেষ হলে খাবো বলেছি।'

এখন আর কথাবার্তা চালাবার কোনো চেষ্টা করছে না মিসেস হল্, হেনফ্রের সামনে সে অপ্রস্তুত হতে চায় না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য আবার পা বাড়াতেই পেছন থেকে ফের কথা বলে উঠলো লোকটি। জানতে চাইলো স্টেশন থেকে তার মালপত্র আনা-

নোর কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কিনা।

মিসেস হল্ বললো, ব্যাপারটা পোস্টম্যানকে জানানো হয়েছিল —কাল সকালে জিনিসগুলো একজন পৌঁছে দিতে পারবে।

'তার আগে সম্ভব নয় ?' জানতে চাইলো লোকটা।

নিঃশব্দে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো মিসেস হল্।

'আমার পরিচয় দেয়া উচিত,' হঠাৎ বলে উঠলো আগন্তুক। 'সাংঘাতিক ক্লান্ত ছিলাম বলে কথাটা বলা হয়নি আগে। আমি এক-জন গবেষক।'

'গবেষক !' মিসেস হলের চোখে-মুখে সমীহের একটা ভাব ফুটে উঠলো।

'নানা যন্ত্রপাতি,সাজসরঞ্জাম রয়েছে আমার বাক্সগুলোর ভেতরে।'

'তাহলে তো খুব দরকারী জিনিস,' মিসেস হল্ বললো।

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গবেষণার কাজ শুরু করতে চাইছি আমি।'

'নিশ্চয়, তা তো বটেই।'

'আমার আইপিং-এ আসার কারণ হচ্ছে—' থেমে একটু ইত-স্তত করে লোকটি বললো, 'আমি একটু নির্জনতা চাই। কাজের সময় কেউ বিরক্ত করুক আমি চাই না। তাছাড়া···আমি একটা দুর্ঘ-টনায় পড়েছিলাম—'

'যা ভেবেছি,' নিজের মনে বললো মিসেস হল্।

'সেজন্যেও আমার বিশ্রাম দরকার। মাঝে মাঝে চোখে খুব যন্ত্রণা হয়, কিছু দেখতে পাইনা। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। এখন অবশ্য মোটামুটি সুস্থ আছি। কখনো কখনো বেশি যন্ত্রণা হয়, মাঝেমধ্যে। তখন সামান্যতম উপদ্রবও আমার অসহ্য মনে হয়। এমন কি কেউ ঘরে ঢুকলেও প্রচণ্ড অসুবিধা

হয়।···এসব আগেই বলে নেয়া ভালো। সবার বোঝা দরকার জিনিসটা।'

'তা তো বটেই, নিশ্চয়,' মিসেস হল্ সায় দেয়। 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে, সাহস করে একটা কথা জিজ্ঞেস—'

'এটুকুই শুধু বলার ছিল আমার,' বলে আগন্তুক এমনভাবে কথা-বার্তার পরিসমাপ্তি টেনে দিলো যার ওপর আর কথা বলা চলে না। মিসেস হলের জিজ্ঞাসা এবং সহানুভূতি আগের মতোই তোলা রইলো ভবিষ্যতের জন্যে।

মিসেস হল্ চলে গেলে আগন্তুক আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে হেনফ্রের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো। শুধু ঘড়ির কাঁটা এবং ডায়ালই নয়, ঘড়ির সমস্ত কলকব্জা খুলে বিছিয়ে নিয়ে হেনফ্রে যতো ধীরে সম্ভব কাজ করবার চেষ্টা করছে। বাতিটা কাছে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছে সে। সবুজ শেড দেয়া বাতি থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে তার হাতে এবং ঘড়ির কলকব্জার ওপর। ঘরের বাকি সমস্ত অংশ ফিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত লোকটাকে নিয়ে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে হেনফ্রে, এমনিতেই সে বড্ড কৌতূহলী স্বভাবের। ইচ্ছে করে ঘড়ির কলকব্জা অকারণ খুলে ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে। মতলবখানা, একটু সময় পেলে হয়তো লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাটা একেবার চুপচাপ,অনড় দাঁড়িয়ে আছে। মনেই হচ্ছে না ঘরে হেনফ্রে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আছে। গা ছমছম করতে লাগলো হেনফ্রের। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে তাকালো সে। আধো অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ব্যাণ্ডেজে মোড়া মাথা, চোখে বিশাল গাঢ় চশমা—কাচের ওপর অস্পষ্ট সবুজ আলো প্রতি-

ফলিতহয়ে চিকচিক করছে। দৃশ্যটা এমন অবাস্তব আর ভূতুড়ে মনে হলো হেনফ্রের কাছে যে, সে ঝাড়া এক মিনিট শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটির মুখের দিকে। তারপর চট করে চোখ নামিয়ে নিলো। বড্ড অস্বস্তিকর অবস্থা। কিছু একটা বলা দরকার। আবহাওয়া নিয়ে কিছু একটা মন্তব্য করলে কেমন হয়?

আবার মুখ তুলে তাকালো হেনফ্রে। একটুখানি কেশে নিয়ে শুরু করলো, 'আবহাওয়াটা—'

'কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠছেন না কেন আপনি?' গম্ভীর আওয়াজে প্রায় ধমকে উঠলো অনড় ছায়ামূর্তি। অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখেছে সে, পরিষ্কার বোঝা যায়। 'ঘণ্টার কাঁটা অ্যাক্সল্-এর সঙ্গে জুড়ে দিলেই তো হয়। শুধু শুধু হাতড়াচ্ছেন কেন?'

'জী, জী—আর এক মিনিট। আমি খেয়াল করিনি—' থতমত খেয়ে বলে উঠলো হেনফ্রে। দ্রুতহাতে সমস্ত যন্ত্রপাতি জুড়ে ফেললো সে। কাজ শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে।

মেজাজ ভয়ানক বিগড়ে গেছে টেডি হেনফ্রের। জলকাদা পেরিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে আপনমনে গজর গজর করছে সে। 'গোল্লায় যাক ব্যাটা! নিশ্চয় হনুমানের মতো কুচ্ছিত চেহারা, মুখ দেখাতে চায় না তাই।' একটু চুপ করে থেকে আবার ফেটে পড়লো সে,'উহুঁ, বোধহয় পুলিশে খুঁজছে শালাকে! ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে ছদ্মবেশ নিয়েছে।'

রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখলো হেনফ্রে, হল্ আসছে। মাত্র কিছুদিন আগে হল্ বিয়ে করেছে সরাইখানার মালিক মহিলাকে। আজ-

কাল দরকার মতো আইপিং থেকে কোচ চালিয়ে নিয়ে যায় সে সিডারব্রিজ জংশনে। নিশ্চয় সিডারব্রিজে মৌজ করে ফিরছে হল্, নইলে এতো দেরি হবার কথা নয়

'কী খবর, টেডি?' কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠলো হল্।

'তোমার বাড়িতে এক চিজ এসেছে দেখোগে!' টেডি বললো।

গাড়ি থামালো হল্। 'তার মানে?'

'আজব এক কাস্টমার জুটেছে তোমাদের সরাইখানায়,' বললো টেডি, 'খোদার কসম।'

মিসেস হলের অদ্ভুত অতিথির বিস্তারিত বর্ণনা দিলো সে হলের কাছে। সবশেষে বললো, 'মনে হয় না, ছদ্মবেশ ধরেছে লোকটা? আমি হ'লে মুখ না দেখে কাউকে নিজের বাড়িতে জায়গা দিতাম না। মেয়েরা তো আবার কাউকে অবিশ্বাস করে না—অচেনা লোককেও না। লোকটাকে ঘরে জায়গা দিয়েছে তোমার বউ, অথচ তার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি।'

'কী বলছো তুমি,' হল্ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো। কোনো কথাই তার মাথায় সহজে ঢোকে না।

'ঠিকই বলছি,' টেডি বললো 'এক সপ্তার জন্যে ঘর ভাড়া নিয়েছে সে। যে-ই হোক ব্যাটা, এক সপ্তার আগে তাকে নড়াতে পারবে না। আগামীকাল তার অনেক মালপত্র আসছে, তা-ই বলেছে সে। খোদা জানে, কী আছে ওর বাক্স-পেটরায়।' কী করে টেডির মাসীকে এক আগন্তুক প্রতারণা করেছিল—কিছুই ছিলো না তার বাক্সে, সে-গল্প হল্‌কে বিস্তারিত শুনিয়ে দিলো সে।

'ব্যাপারটা দেখতে হয় তাহলে,' বলে গাড়ি ছোটালো হল্।

খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে টেডি নিজের পথ ধরলো।

ঘরে ফিরে এসে 'ব্যাপারটা দেখার' বদলে হল্‌কে অবশ্য প্রথমেই বউয়ের প্রচণ্ড বকুনি হজম করতে হলো দেরি করে ফেরার জন্য। পরে মিনমিন করে যেটুকু জানতে চাইলো সে, তারও সদুত্তর কিছুই পেলো না। কিন্তু বউ তাকে পাত্তা না দিলেও তার মনের মধ্যে টেডি যে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তা ধীরে ধীরে শিকড় ছড়াতে শুরু করেছে। 'মেয়েদের সবকিছু জানার কথা নয়,' বলে চুপ করে গেল সে। মনে মনে ঠিক করলো, লোকটা সম্পর্কে যেভাবেই হোক খোঁজখবর করতে হবে।

কিন্তু হুট করে পারলারে ঢুকে পড়ার সাহস তার হলো না। সাড়ে ন'টার দিকে লোকটা শুতে চলে গেলে গম্ভীর চালে পারলারে ঢুকলো সে। স্ত্রীর আসবাবপত্রগুলোর ওপর প্রখর দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখলো। ভাবখানা এই, ঘর ভাড়া নিয়েছে বলেই ব্যাটা এখানকার নবাব বনে যায়নি। কিসের যেন বিদঘুটে অঙ্ক কষে রেখেছে লোকটা। কাগজটা হাতে নিয়ে খুব অবজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখলো হল্। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসে বউকে নির্দেশ দিলো, লোকটার মালপত্র এসে পৌঁছুলে সেগুলো যেন সে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে।

'নিজের চরকায় তেল দাওগে তুমি,' খেঁকিয়ে উঠলো মহিলা, 'আমার কাজ আমি করবো।'

আসলে মিসেস হল্ নিজেও স্থির করতে পারেনি কী করবে। সেজন্যেই মেজাজ বেশি বিগড়ে রয়েছে তার। অদ্ভুত আগন্তুককে নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তেও সে কোনো কূল-কিনারা পায়নি। আশ্চর্য রহস্যময় লোকটা। সাংঘাতিক রকম অস্বাভাবিক কিছু একটা রয়েছে ঐ কিম্ভূত চেহারার আড়ালে। কিন্তু কী সেটা, মিসেস হল্ ধরতে পার-

ছে না। একই সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতূহল, ভয় আর অস্থিরতা অনুভব করছে সে।

মাঝরাতে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেল। বিরাট লম্বা গলার ওপর বসানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাদা মাথাঅলা অদ্ভুত সব প্রাণী তেড়ে আসছে তার দিকে। শাদা মাথার ওপর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কালো বিশাল চোখ। ধড়মড় করে উঠে বসে অনেক কষ্টে আতঙ্ক চাপলো সে। ঢক ঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে আবার শুয়ে পড়লো।

তিন

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি জলকাদার ভেতর আগন্তুকের মালপত্র এসে পৌঁছলো। দেখবার মতো মালপত্র সেসব। সবার যেমন থাকে তেমন গোটাকতক ট্রাঙ্ক তো রয়েছেই,সেইসঙ্গে রয়েছে মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা বড়ো একটা বাক্স, এবং আরো প্রায় ডজনখানেক খাঁচা, বাক্স, ঝুড়ি—সেগুলোর ভেতর খড় দিয়ে জড়ান ছোট ছোট অসংখ্য জিনিস গিজ গিজ করছে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে হল্ খড় টেনে টেনে জিনিসগুলোর স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। কাচের শিশি-বোতল হবে সম্ভবত, ভাবলো সে।

খবর পেয়ে হ্যাট-কোট-দস্তানা-র‍্যাপারে আপাদমস্তক আবৃত আগন্তুক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির নিচে ফ্যারেনসাইডের ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্রগুলো ভেতরে নেবার ব্যাপারে ফ্যারেনসাইডের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে হল্। ফ্যারেনসাইডের কুকুরটা নির্বিকারভাবে তার পা শুঁকছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো আগন্তুক। 'জিনিসপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে চলো, তাড়াতাড়ি দরকার আমার,' বলতে বলতে সে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফ্যারেনসাইডের কুকুরটা হঠাৎ মাথা তুলে তাকালো। আগন্তুককে দেখামাত্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো তার চেহারা। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল, ঘড়ঘড় বুনো গর্জন বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। আক্র-

মণাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে পিছিয়ে এলো জানোয়ারটা দু'পা আগন্তুক ছিটকে সরে যাবার আগেই লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, হাত কামড়ে ধরে ঝুলে পড়লো।

আর্তনাদ করে এক লাফে পিছিয়ে গেল হল্। ফ্যারেনসাইড চেঁচিয়ে উঠলো, 'শুয়ে পড়ুন!' ডান হাতে চাবুক তুলে নিলো সে ছোঁ মেরে।

লোকটার হাতে ঠিকমতো দাঁত বসাবার আগেই প্রবল এক ঝট্‌কা খেয়ে কুকুরটা হুড়কে নেমে এলো। একটা জোর লাথি খেয়ে ছিটকে সরে গেল কিছুদূর। পরক্ষণে ক্ষ্যাপা জানোয়ারটা লাফ দিয়ে দ্বিগুণ তেজে তেড়ে এসে লোকটার পা কামড়ে ধরলো। ফড়ফড় শব্দ করে ট্রাউজার ছিঁড়ে গেল খানিকটা। পা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আগন্তুক। পারছে না। শপাৎ করে ফ্যারেন-সাইডের চাবুক পড়লো কুকুরটার পিঠে। যন্ত্রণায় কুঁইকুঁই করতে করতে জানোয়ারটা আগন্তুককে ছেড়ে দিয়ে গাড়ির চাকার আড়া-লে গিয়ে আশ্রয় নিলো। মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল সব-কিছু। কথা বলছে না কেউ, চিৎকার করছে সবাই। আগন্তুক দ্রুত একবার তাকালো হাতের ছেঁড়া দস্তানা আর পায়ের দিকে। তার-পর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে সরাইখানার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ প্যাসেজ পার হয়ে বেডরুমের কার্পেট-হীন সিঁড়িতে উঠে মিলিয়ে গেল।

চিৎকার করে কুকুরটাকে গালাগাল দিতে দিতে ফ্যারেনসাইড চাবুক হাতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। কুকুরটা তাকিয়ে আছে চাকার ফাঁক দিয়ে।

'বেরিয়ে আয়, শয়তানের বাচ্চা!' গর্জে উঠলো ফ্যারেনসাইড

হল্ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল। 'কামড় খেয়েছে লোকটা,' ব'লে ছুটলো সে. 'আমি গিয়ে দেখে আসি।'

প্যাসেজের ভেতর বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 'ফ্যারেন-সাইডের কুকুর লোকটাকে কামড়ে দিয়েছে,' এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে ছুটলো আবার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

আগন্তুকের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। এই জরুরী অবস্থায় কোন আনুষ্ঠানিকতার ধার না ধেরে সোজা ঢুকে পড়লো হল্।

ব্লাইণ্ড নামিয়ে দেয়ায় ঘরের ভেতরে আলো নেই বললেই চলে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে মুহূর্তের জন্যে হল্ অদ্ভুত একটা জিনিস দেখ-তে পেলো। বাধা দেবার ভঙ্গিতে একটা হাত নড়ে উঠলো তার চোখের সামনে, হাতের কব্জি থেকে পরেরটুকু নেই। সেইসঙ্গে এগিয়ে এলো একটা মুখ—শাদা একটা পিণ্ডের ওপর বিশাল তিনটি কালো গর্ত শুধু আবছামতো চোখে পড়লো। পরমুহূর্তে বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলো হল্। তার মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা—ভেতর থেকে লক্ করে দেয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে।

এত তাড়াতাড়ি ঘটলো ঘটনাটা যে হল্ পরিষ্কারভাবে কিছুই দেখে উঠতে পারলো না। কী ওই অদ্ভুত জিনিসটা? অন্ধকার ল্যাণ্ডিংয়ে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো সে।

সরাইখানার বাইরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে। পুরো ঘটনাটা দ্বিতীয়বারের মতো বর্ণনা করছে ফ্যারেনসাইড। মিসেস হল্ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, তার অতিথিদের কামড়ানোর কোনো

অধিকার ফ্যারেনসাইডের কুকুরের নেই। রাস্তার ওপাশের দোকানী হাক্সটার এর-ওর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে সবকিছু। কামারশালার স্যাণ্ডি ওয়েজার্স ব্যাখ্যা করছে আইনে কী বলে। এছাড়া রয়েছে ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলার দল। সবাই মন্তব্য করছে যার যার মতো।

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে লোকজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হল্। একটু আগে ওপরতলায় যা দেখেছে সে, তা এখনো নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। তাছাড়া ঘটনাটা বর্ণনা করবার মতো উপযুক্ত ভাষাও সে তার ভাণ্ডার হাতড়ে পাচ্ছে না।

মিসেস হল্ জানতে চাইলো অতিথির কী অবস্থা।

'সাহায্য লাগবেনা বললো,' জানালো হল্। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে প্রস্তাব দিলো,'আমরা বরং মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে যাই।'

'ক্ষত জায়গাটা পুড়িয়ে নেয়া উচিত এক্ষুণি,' হাক্সটার বলে উঠলো।

'আমি হলে কুকুরটাকে গুলি করতাম,' ভিড়ের ভেতর থেকে মন্তব্য করলো এক মহিলা।

হঠাৎ কুকুরটা আবার গর্জাতে শুরু করলো।

'শোনো,' দরজার কাছ থেকে গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো। সবাই মুখ তুলে দেখলো মুখ-ঢাকা আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে। কোটের কলার তুলে দেয়া, হ্যাটের কিনারা নামানো। 'যতো তাড়াতাড়ি পারো জিনিসপত্র নিয়ে এসো ভেতরে,' স্পষ্ট আদেশের সুরে বললো সে।

'ট্রাউজার আর দস্তানা বদলে এসেছে,' ফিসফিস করে বললো কে যেন ফ্যারেনসাইডের কানের পাশে।

'স্যার, কামড় লেগেছে আপনার ?' ফ্যারেনসাইড বলে উঠলো, 'আমি সত্যি দুঃখিত—'

'কিচ্ছু হয়নি আমার,' আগন্তুক বললো। 'তাড়াতাড়ি করো।' বিড়বিড় করে নিচু স্বরে সে অভিসম্পাত দিলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

প্রথম খাঁচাটা সরাসরি পারলারে নিয়ে যাওয়া হলো লোকটার নির্দেশমতো। সেটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ খুলতে শুরু করলো সে। মিসেস হলের কার্পেটের কী দশা হচ্ছে সেদিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ঘরময় খড় ছড়িয়ে একটার পর একটা বের করতে লাগলো নানা আকারের, নানা প্রকারের, নানা রঙের অসংখ্য শিশি-বোতল: পাউডার ভর্তি বেঁটে-মোটা বোতল, স্বচ্ছ রঙিন তরল পদার্থভর্তি ছোট ছোট শিশি —গায়ে লেবেল আঁটা 'বিষ', সরু গলা-অলা গোল বোতল, বড় বড় সবুজ বোতল, শাদা বোতল, কাচের ছিপি লাগানো বোতল, শোলার ছিপিঅলা বোতল, কাঠের ছিপি-আঁটা বোতল, মদের বোতল, সালাড অয়েলের বোতল। একটা একটা করে বের করে সাজিয়ে রাখছে লোকটা শিফোনিয়ারের ওপর, ম্যান্টেলের ওপর, জানালার ধারে, টেবিলের ওপর, ফ্লোরের চারধারে, বুক-শেলফের ওপর—ঘরের সর্বত্র। এক এক করে খালি হচ্ছে খাঁচা। সব মিলিয়ে ছ'টা খাঁচা থেকে বেরুলো রাশি রাশি শিশি-বোতল। ব্র্যামবল্‌হার্স্টের কোনো ওষুধের দোকানেও এর অর্ধেক পরিমাণ শিশি-বোতল নেই। দেখবার মতো দৃশ্যই একটা। ঘরের ভেতর খড়ের পাহাড় জমে উঠেছে। শিশি-বোতল ছাড়া খাঁচা থেকে আর বেরুলো শুধু কিছু টেস্ট-টিউব এবং সাবধানে প্যাক করা একটা তুলাদণ্ড।

খাঁচাগুলো খালি হতেই লোকটা আর কোনদিকে না তাকিয়ে জানালার সামনে বসে কাজ শুরু করে দিলো। ঘর জুড়ে খড়কুটো ছড়িয়ে আছে, ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে, বইয়ের বাক্স্ পড়ে রয়েছে ঘরের বাইরে, ট্রাঙ্ক এবং অন্যান্য মালপত্র ওপরতলায় চলে গেছে—কোনদিকে খেয়াল নেই তার।

মিসেস হল্ যখন ডিনার নিয়ে ঘরে ঢুকলো তখন কাজে এমন মগ্ন হয়ে আছে লোকটা যে তার উপস্থিতি টেরই পেলো না। একের পর এক নানা বোতল থেকে নানা রঙের ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ টেস্ট টিউবের ভেতর ঢালছে সে। ঘরের অবস্থা দেখে মিসেস হলের পিত্তি জ্বলে গেল। খড় সরিয়ে টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখলো সশব্দে। অমনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গেল লোকটা, কিন্তু পরক্ষণে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মিসেস হল্ দেখে নিয়েছে, লোকটার চোখে চশমা নেই—মনে হলো অস্বাভাবিক গভীর তার চোখের কোটর দুটো। টেবিলের ওপর থেকে চশমাজোড়া তুলে চোখে লাগিয়ে লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো।

মিসেস হল্ ঘরের আবর্জনার কথা তুলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠলো আগন্তুক।

'নক্ না করে ঘরে ঢোকা উচিত হয়নি আপনার,' অস্বাভাবিক রুক্ষ শোনালো তার স্বর।

'নক্ করেছিলাম, আপনি বোধহয়—'

'তা-ই হবে। কিন্তু সাংঘাতিক জরুরি আমার গবেষণার কাজটা —খুবই দরকারি, এসময় কোনোরকম উৎপাত—এমন কি দরজায় সামান্য—'

'বেশ তো, সে-ক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে আপনি দরজা লক্ করে রাখ-

তে পারেন।'

'ঠিক বলেছেন, তা-ই করতে হবে,' বললো আগন্তুক।

'দেখুন,' এবার কথাটা পাড়লো মিসেস হল্, 'এই খড়গুলো—'

'থামুন, বুঝেছি। অসুবিধে হলে আমার বিলের সঙ্গে কিছু জুড়ে দেবেন।' বিড় বিড় করে অভিসম্পাত দিলো লোকটা মনে হলো। ভয়ঙ্কর উত্তেজিত লাগছে তাকে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। এক হাতে বোতল আরেক হাতে টেস্টটিউব নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মৃদু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস হল্ সতর্ক হয়ে গেল। কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রীও সে নয়। 'সে-ক্ষেত্রে ঠিক কতো ধরবো, আপনি যদি—'

'এক শিলিং। এক শিলিং লিখে দেবেন। এক শিলিংয়ে চলবে না?'

'ঠিক আছে,' টেবিলক্লথ বিছাতে বিছাতে বললো মিসেস হল্, 'যা ভালো মনে করেন আপনি—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বসে পড়লো লোকটা।

সারা বিকেল দরজায় চাবি লাগিয়ে লোকটা কাজের ভেতর ডুবে রইলো। বেশির ভাগ সময় তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শুধু একবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। আচমকা একটা জোরালো শব্দ শুনে চমকে উঠলো মিসেস হল্। পারলারের ভেতর থেকেই এলো আওয়াজটা। মনে হলো প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠলো টেবিল, শিশিবোতলগুলো ঠক্কর খেলো একটার সঙ্গে আরেকটা, মেঝেতে ছিটকে পড়ে কয়েকটা বোতল ভেঙে খান খান হয়ে গেল সশব্দে। দৌড়ে গিয়ে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো মিসেস হল্। নক্ করবার সাহস পেলো না।

ঘরের ভেতর অস্থির পায়চারির শব্দ হচ্ছে।

'আর পারছি না,' প্রলাপের মতো বকে যাচ্ছে লোকটা, 'আর পারছি না আমি! তিন লক্ষ, চার লক্ষ! কোনোদিন শেষ হবে না, আমার সারা জীবন লেগে যাবে!···ধৈর্য! ধৈর্য চাই! ধৈর্য ধরতে হবে—'

অদ্ভুত স্বগতোক্তির বাকিটুকু আর মিসেস হলের শোনা হলো না। বারের ভেতর জুতোর আওয়াজ শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে সেদিকে ছুটতে হলো। আবার যখন ফিরে এলো সে তখন ঘরের ভেতরটা নীরব হয়ে এসেছে। শুধু মাঝেমধ্যে চেয়ারের মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, বোতলের টুংটাং আওয়াজ। আবার কাজে মন দিয়েছে আগন্তুক।

চা দিতে গিয়ে মিসেস হল্ দেখতে পেলো ঘরের কোণে অবতল আয়নার নিচে একগাদা ভাঙা কাচ পড়ে আছে। কার্পেটের ওপর কিসের যেন সোনালি ছোপ। সেদিকে আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে।

'টাকা দিয়ে দেবো,' হাত নেড়ে অধৈর্যের সুরে বললো লোকটা, 'বিলে লিখে দেবেন। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বিরক্ত করবেন না। কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তার জন্যে ক্ষতিপূরণ লিখে রাখবেন আমার বিলে,' বলতে বলতে আবার কাজে মগ্ন হয়ে গেল সে। একটা খোলা খাতায় কিসের যেন লম্বা একটা চেকলিস্ট একমনে টিকচিহ্ন দিয়ে চললো।

'একটা কথা শুনবে?' রহস্যময় চাপা গলায় বললো ফ্যারেনসাইড। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। একটা ছোট্ট বীয়ারের দোকানে বসে

রয়েছে সে আর টেডি।

'কী কথা?' টেডি হেনফ্রে কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

'ওই যে লোকটার কথা বললে না—যাকে আমার কুকুর কামড়ে দিয়েছিল, আমার কী মনে হয় জানো?' আরো কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বললো ফ্যারেনসাইড, 'লোকটা কালো।···অন্তত ওর পাদু'টো কালো।' টেডিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাতে দেখে আবার যোগ করলো, 'লোকটার ট্রাউজার আর দস্তানা খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ফোকর দিয়ে দেখেছি আমি। লালচে চামড়া দেখা যাবার কথা, তাই না? কিন্তু আমি দেখলাম একদম কালো। এই আমার হ্যাটের মতো ওর গায়ের রঙ না হয় তো কী বলেছি!'

'বলো কী!' হেনফ্রের চোখ গোল গোল হয়ে উঠলো। 'অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটার নাক তো দেখলাম দিব্যি লালচে!'

'ঠিক বলেছো, আমিও দেখেছি। আসল কথাটা বলি তোমাকে। আমার কী মনে হয় জানো?' টেডির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো ফ্যারেনসাইড। 'ছোপ ছোপ গায়ের রঙ লোকটার—কোথাও শাদা, কোথাও কালো। সেজন্যেই চেহারা দেখাতে লজ্জা পায় ও। বর্ণসংকর আর কি, বাবামায়ের রঙ ঠিকমতো মেশেনি, ছোপ ছোপ হয়ে আছে। এরকম আগেও আমি শুনেছি। ঘোড়াদের তো প্রায়ই হয় এরকম, তাই না?'

চার

এপ্রিল মাস শেষ হবার আগেই আগন্তুকের সঙ্গে মিসেস হলের আরো বেশ কয়েক দফা খিটিমিটি হয়ে গেল। কিন্তু যতবার মিসেস হল্ ঘরদোর-আসবাবপত্রের কোনো ক্ষয়ক্ষতির কথা তুলেছে, ততবারই সেই মোক্ষম দাওয়াই ব্যবহার করেছে লোকটা—অতিরিক্ত কিছু টাকা ধ'রে দেবার কথা বলে নিরস্ত করেছে তাকে।

হল্ও দেখতে পারে না লোকটাকে। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তাকে তাড়াবার পরামর্শ দিয়েছে সে। তবে বেশির ভাগ সময় লোকটার ব্যাপারে ঘোর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে সে বেশ ঘটা ক'রে তার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে। এমনিতেও সে আগন্তুককে সবসময় এড়িয়ে চলে।

মিসেস হল্ নিজের মতো নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে, 'গরমকাল আসুক। লোকজন আসতে শুরু করলে তখন দেখে নেবো বাছাধনকে। যতোই তুমি মেজাজ দেখাও না বাপু, বিল যা ধরেছি সেটা না দিয়ে যাবে কোথায়?' কিন্তু এরই মধ্যে লোকটার আর্থিক অনটনের কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে।

গির্জায় যায় না আগন্তুক। আসলে রোববার আর সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে কোনো তফাৎ করে না সে। পোশাক-আশাকও সাতদিন একই রকম। কাজকর্মের ধরন তার খুব অদ্ভুত। কোনো

কোনো দিন যেন কাজের ভূত চাপে তার মাথায়। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমে এসে কাজ শুরু করে, সারাটা দিন ডুবে থাকে কাজের ভেতর। আবার কখনো কখনো দেরি করে বিছানা ছাড়ে সে, ঘরের ভেতর অবিরাম পায়চারি করে, আপনমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিড়বিড় ক'রে কী সব ব'কে যায়, পাইপ টানে, কিংবা আগুনের পাশে আর্ম-চেয়ারে বসে ঝিমোয়। বাইরের জগতের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। তার মন-মেজাজ কখন কেমন থাকে সেটা আগে থেকে আঁচ করা অসম্ভব। বেশির ভাগ সময় মনে হয়, অসহ্য রাগে জ্বলছে সে। এমন কি অজ্ঞাত কারণে দু'একবার প্রচণ্ড আক্রোশে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দলে-পিষে ভেঙে-চুরে তছনছও করেছে। আপনমনে বিড়বিড় করার অভ্যাস বেড়েই চলেছে তার, কিন্তু মিসেস হল্ অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে কান পেতে থেকেও তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি।

দিনের বেলা খুব কমই বাইরে বেরোয় আগন্তুক। তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে তাকে সরাইখানা ছেড়ে বেরোতে দেখা যায়। আবহাওয়া যেমনই হোক, সবসময় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো-দস্তুর পোশাকে ঢাকা থাকে। ঘন গাছপালায় ঢাকা নির্জন রাস্তা দিয়েই শুধু সে চলাফেরা করে। চালাঘরের মতো প্রকাণ্ড হ্যাটে ঢাকা তার ব্যাণ্ডেজমোড়া চশমাপরা বীভৎস মুখ আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ভয়ানক চমকে দেয় ঘরমুখো দু'টি একটি দিন-মজুরকে। একদিন রাত সাড়ে ন'টার সময় 'স্কারলেট কোট' সরাই-খানা থেকে বেরিয়ে হঠাৎ লোকটার সামনে পড়ে গিয়ে টেডি হেন-ফ্রের পিলে চমকে গিয়েছিল। হ্যাট খুলে হাঁটছিল লোকটা, সরাই-খানার খোলা দরজার একঝলক আলোয় ঠিক মড়ার খুলির মতো

মনে হয়েছিল তার ব্যাণ্ডেজমোড়া মাথা। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সে এক অজানা ভয়ের বস্তু। কোনো বাচ্চা একবার তার চেহারা দেখে থাকলে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে জেগে ওঠে রাতে।

আইপিংয়ের মতো গ্রামে এমন এক অদ্ভুত রহস্যময় আগন্তুক প্রবল গুঞ্জন তুলবে এটাই স্বাভাবিক। লোকটার পেশা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এ-ব্যাপারে মিসেস হল্‌কে জিজ্ঞেস করা হ'লে যেন খানা-খন্দে পিছলে পড়ার ভয় রয়েছে এমন সতর্ক ভঙ্গিতে সে মৃদু স্বরে থেমে থেমে বলে, 'উনি বৈজ্ঞানিক, গবেষণার কাজ করেন।' গবেষণা জিনিসটা কী, জানতে চাওয়া হ'লে সে বেশ একটু গর্বের সঙ্গে ব'লে থাকে, শিক্ষিত সমাজের প্রায় সবাই জানে কথাটা — গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে 'নানা জিনিস আবিষ্কার করা।' কৈফিয়ত দেবার সুরে বলে সে, এক দুর্ঘটনায় পড়ে তার অতিথির হাত আর মুখের রঙ সাময়িকভাবে কিছুটা পাল্টে গেছে, লাজুক মানুষ বলে তিনি ওই চেহারা নিয়ে লোকজনের সামনে আসতে চান না।

কিন্তু বাইরে লোকজনের ধারণা অন্যরকম। অনেকের ধারণা, লোকটা পলাতক আসামী —পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে চেহারা আড়াল করে রেখেছে। গুজবটা বেরিয়েছে টেডি হেনফ্রের মাথা থেকে, যদিও আশেপাশে কোথাও সম্প্রতি তেমন কোনো অপরাধের কথা শোনা যায়নি। টেডি হেনফ্রের থিয়োরির আরেকটি সংস্করণ চালু করেছেন ন্যাশনাল স্কুলের প্রবেশনারী অ্যাসিস্ট্যান্ট মিঃ গোল্ড। তাঁর বিশ্বাস, আগন্তুক আসলে একজন ছদ্মবেশী বিপ্লবী, গোপনে বসে বিস্ফোরক তৈরি করছে। মিঃ গোল্ড অবসরমতো কিছু গোয়েন্দাগিরির চেষ্টাও করেছেন। মুখোমুখি হলেই খুব তীক্ষ্ণ

চোখে পর্যবেক্ষণ করেছেন আগন্তুককে। তার সম্পর্কে বিভিন্ন লোক-জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন—যাদের প্রায় সবাই লোকটাকে কখনো চোখে দেখেনি। শেষ পর্যন্ত কিছুই উদ্ধার করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

ফ্যারেনসাইডের ছোপ ছোপ রঙের তত্ত্ব মেনে নিয়েছে কেউ কেউ। এদের একজন, সাইলাস ডারগ্যান, আক্ষেপ করে বলেছে, 'এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে না থেকে লোকটা যদি মেলায় গিয়ে নিজের আজব চেহারার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতো, তাহলে সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারতো।'

এসব ছাড়াও কারো কারো আবার বক্তব্য হচ্ছে, লোকটা নিরীহ এক উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই মতের অনুসারীদের বেশ সুবিধা হয়েছে। লোকটাকে পাগল বলে ধরে নিলে পুরো ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেয়া জলের মতো সহজ হয়ে যায়।

আরো নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। এক বিশ্বাস ছেড়ে আরেক বিশ্বাস নিয়ে পড়ছে কেউ, কেউ আবার অন্য কারো মতের সঙ্গে আপোষ করে তৃতীয় কোনো মত খাড়া করছে। সাসেক্সের লোকজনের মধ্যে কুসংস্কার নেই তেমন একটা। কিন্তু এপ্রিল মাসের পর থেকে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস কিছু কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে আইপিং গ্রামে। তবে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ রয়েছে এখন পর্যন্ত।

কিন্তু যে যা-ই ভাবুক, একটা ব্যাপারে সবার মধ্যে মিল রয়েছে। আইপিংয়ের কেউই পছন্দ করে না আগন্তুককে। লোকটার রগচটা ভাব আর মারমূর্তির একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়তো শহরের শিক্ষিত লোকজন মাথা খাটিয়ে বের করলেও করতে পারতো, কিন্তু

সাসেক্সের এই পাড়াগাঁয়ের সরল লোকজনের পক্ষে তার অদ্ভুত আচরণের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তার সম্পর্কে কেউ বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাতে গেলে তাকে নিতান্ত অভদ্রভাবে দমিয়ে দেয় সে। মাঝে মাঝে তার উন্মাদের মতো ভাবভঙ্গি দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে নির্জন পথের মোড়ে হঠাৎ চোখের সামনে তার বীভৎস মূর্তি দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে পথচলতি লোকজন। সবাই জানে সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেরোয় সে। সন্ধ্যা নামলেই তাই ঝটপট বন্ধ হয়ে যায় ঘরবাড়ির দরজা, খড়খড়ি নেমে আসে জানালার, সমস্ত আলো নিভে যায়। কার এসব ভালো লাগে?

কৌতূহলে মরে যাচ্ছে ডাক্তার ক স্। আগন্তুকের একগাদা ব্যাণ্ডেজ তার ভেতর পেশাগত আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছে, এক হাজার এক বোতলের গল্প খুঁচিয়ে তুলেছে তার ঈর্ষা। সারা এপ্রিল আর মে মাস ধরে সে আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলবার একটা সুযোগ খুঁজেছে। শেষ পর্যন্ত হুইটসানটাইডের দিকে আর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারলো না সে। গ্রামের সেবাসমিতির জন্যে চাঁদা চাইবার অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফেললো মনে মনে।

হল্ আগন্তুকের নাম জানে না দেখে অবাক হলো ডাক্তার কাস্। মিসেস হলের কাছে জানতে চাইলো সে তথ্যটা।

'কী যেন একটা নাম লোকটা বলেছিল,' মহিলা উত্তর দিলো, 'আমি ঠিক শুনতে পাইনি।' লোকটার নাম সে-ও জানে না এ-কথা বলে হাসির পাত্র হবার চেয়ে মিথ্যে কথা বলাই নিরাপদ মনে হলো তার কাছে।

পারলারের দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো কাস্। বেশ স্পষ্ট একটা গালিগালাজের মতো শব্দ ভেসে এলো ভেতর থেকে।

'অনধিকার প্রবেশের জন্যে ক্ষমা করবেন,' বলে উঠলো সে। দু'হাত দিয়ে টেনে দিলো দরজা।

পেছনে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছে মিসেস হল্। পরবর্তী মিনিট দশেক ধরে শুধু অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে এলো। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ উঠলো বন্ধ দরজার ওপাশে। পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, একটা চেয়ার উল্টে পড়লো সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অট্টহাসি ভেসে এলো। পায়ের শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। পরমুহূর্তে দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এলো কাস্। বিবর্ণ শাদা হয়ে গেছে তার মুখ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ঘরের ভেতর। দরজা খোলাই পড়ে রইলো পেছনে, কোনোদিকে না তাকিয়ে হ্যাট আঁকড়ে ধরে দৌড়ে হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল সে। তার দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

বারের পেছনে দাঁড়িয়ে পারলারের খোলা দরজার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মিসেস হল্। এই সময় আগন্তুকের চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। ঘরের ভেতর থেকে তার পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে এলো। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটার মুখ দেখতে পেলো না মিসেস হল্। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল পারলারের দরজা।

সবকিছু আবার আগের মতো চুপচাপ এখন।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে কাস্ সোজা এসে উঠলো গ্রামের অন্য প্রান্তে

ভিকার বানটিংয়ের বাড়িতে।

'আমি কি পাগল হয়ে গেছি?' ভিকারের ছোট্ট জীর্ণ স্টাডিতে ঢুকেই বলে উঠলো কাস্, 'আমাকে কি উন্মাদের মতো লাগছে দেখতে?'

'কী হয়েছে?' গির্জার বক্তৃতার আলগা পাতাগুলোর ওপর একটা শামুক চাপা দিয়ে প্রশ্ন করলেন ভিকার।

'সরাইখানার ওই লোকটা—'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে তার?'

'আগে কিছু একটা পান করতে দিন আমাকে, বলে বসে পড়লো কাস্।

সস্তা শেরি ছাড়া ভিকারের বাড়িতে আর কিছু নেই। তারই এক গ্লাস ঢক ঢক করে খেয়ে নিলো কাস্। একটু ধাতস্থ হয়ে তার অদ্ভুত সাক্ষাৎকার বর্ণনা করতে বসলো।

'সেবাসমিতির চাঁদা চাইতে গিয়েছিলাম লোকটার কাছে,' এখনও একটু একটু হাঁপাচ্ছে সে, 'আমি ঢুকতেই সে পকেটে হাত ভরে ধুপ করে চেয়ারে বসে পড়লো। আমার কথা শুনে কিছু না বলে শব্দ করে নাক টানলো। আমি বললাম, "শুনেছি বিজ্ঞানে আপনার খুব উৎসাহ?" সে বললো, "হ্যাঁ।" আবার নাক টানলো জোরে। অনবরত নাক টানতে লাগলো সে, ভয়ানক সর্দিতে ধরেছে বোঝা যায় —অমন কাপড়মোড়া থাকলে সর্দি লাগবারই কথা। সেবাসমিতির কথা বুঝিয়ে বলতে বলতে আমি ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলাম। শিশিবোতল—কেমিক্যাল্স্—ঘর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। দেখলাম তুলাদণ্ড, স্ট্যাণ্ডভর্তি টেস্ট টিউব। আর একটা অদ্ভুত গন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে, অনেকটা সন্ধ্যায় ফোটা প্রিমরোজের মতো।

চাঁদা দেবে কিনা জানতে চাইলাম। বললো, পরে ভেবে দেখবে। আমি হুম্ করে জিজ্ঞেস করে বসলাম, কোনকিছু নিয়ে সে গবেষণা করছে কিনা। বললো,"হ্যাঁ।" খুব সময়সাপেক্ষ গবেষণা কিনা জানতে চাইলাম আমি। তেতে উঠে বললো,"সাংঘাতিক সময়সাপেক্ষ।" তারপরই লোকটা টগবগ করে বলতে শুরু করলো তার কাহিনী। একবার একটা জিনিসের ফরমুলা পেয়েছিল সে---অত্যন্ত মূল্যবান ফরমুলা—কী জিনিসের, তা বলবে না। কোনো ওষুধের কিনা জানতে চাইলাম আমি। প্রায় ধমকে উঠে বললো, "তাতে কী দরকার আপনার?" তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইলাম আমি। গম্ভীরভাবে নাক টেনে একটু কাশলো সে। আবার কথা শুরু করলো। পাঁচটা উপাদান দিয়ে তৈরি হয় জিনিসটা। একদিন ফরমুলাটা পড়ে কাগজটা নামিয়ে রেখে মাথা ঘুরিয়েছে সে, এমন সময় জানালা দিয়ে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেটা। সোজা উড়ে গিয়ে কাগজখানা পড়ে খোলা ফায়ারপ্লেসের ভেতরে। আগুন ধরে যায় সঙ্গে সঙ্গে, জ্বলন্ত অবস্থায় উঠতে শুরু করে চিমনির দিকে। দেখতে পেয়ে সে দৌড়ে ধরতে যায় কাগজখানা।---বলতে বলতে লোকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত বের করে আনলো পকেট থেকে।' এ-পর্যন্ত বলে বড়ো বড়ো চোখ করে থেমে গেল কাস্।

'কী হলো তারপর?' ভিকার জিজ্ঞেস করলেন।

'কোথায় হাত! শূন্য একটা হাতা শুধু। খোদা! প্রথমে আমার মনে হলো লোকটা বুঝি বিকলাঙ্গ, শোলার হাত ব্যবহার করে—এখন খুলে রেখেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, কিছু একটা গোলমাল আছে! ভেতরে কিছু না থাকলে শূন্য হাতা ফুলে রয়েছে কী করে, নড়ছে কী করে? কিচ্ছু নেই ভেতরে, বিশ্বাস করুন, একদম ফাঁকা।

হাতার ভেতর দিয়ে কনুই পর্যন্ত নজর গেছে আমার, কিচ্ছু নেই। ছেঁড়া একটা জায়গার ভেতর দিয়ে আলোও ঢুকতে দেখেছি। বিস্ময়ে আমার গলা দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। থমকে গিয়ে লোকটা চশমা-ঢাকা চোখ তুলে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর তার দৃষ্টি পড়লো নিজের হাতার ওপর।'

'তারপর?' ভিকার বানটিংয়ের মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'একটা কথাও বললো না সে। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার তাড়াতাড়ি হাতাটা ভরে ফেললো পকেটে। একটু কেশে নিয়ে আবার শুরু করতে যাচ্ছিল গল্প। আমি বলে উঠলাম, "আশ্চর্য! শূন্য হাতা আপনি নাড়ছেন কী করে?" "শূন্য হাতা?" যেন খুব অবাক হয়েছে এমনভাবে বললো লোকটা। "হ্যাঁ," আমি বললাম, "শূন্য হাতা ছাড়া আবার কী?"

"শূন্য হাতা তাই না? আপনি দেখেছেন, শূন্য হাতা?" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। খুব ধীরে তিন পা এগিয়ে এসে লোকটা ঠিক আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। ভয়ানক জোরে জোরে নাক টানলো। আমি তখনো ঘাবড়ে যাইনি, যদিও অমন ব্যাণ্ডেজ মোড়া ঠুলিবাঁধা মুণ্ডু একেবারে মুখের ওপর এসে পড়লে যে কেউ নির্ঘাত ভয় পাবে। সেই একই কথা বলছে লোকটা, "আপনি বলছেন, শূন্য হাতা?" "নিশ্চয়ই," আমি বললাম। লোকটা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। কী করবো বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাতে লাগলাম আমি। খুব ধীরে ধীরে লোকটা আবার পকেট থেকে বের করে আনলো তার হাতা। যেন আবার আমাকে ভালো করে দেখতে দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে ধীরে—খুব ধীরে তার হাতখানা তুলে ধরলো আমার মুখের সামনে।

আমি তাকিয়ে রইলাম সেটার দিকে। যেন এক যুগ পেরিয়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। কোনরকমে বললাম, "কিছুই নেই তো, ফাঁকা।" ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছে তখন। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কিছুই নেই ভেতরে। খুব ধীরেধীরে সে হাতখানা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। অদ্ভুত এক দৃশ্য। শূন্য হাতটা এগিয়ে আসছে আপনাআপনি। আমার মুখের ছ'ইঞ্চি দূরে এসে স্থির হলো সেটা। আর তারপর—'

'কী হলো তারপর?'

'...ঠিক যেন একটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল চেপে ধরলো আমার নাক!'

হেসে উঠলেন মিঃ বানটিং।

'বিশ্বাস করুন, একদম শূন্য, ফাঁকা হাতা, তবু মনে হলো—' থমকে থেমে গেল কাস্। তীক্ষ্ণস্বরে আবার বলে উঠলো, 'আপনি হাসতে পারেন, কিন্তু মিথ্যে কথা বলছি না আমি। ভয়ানক চমকে উঠে আমি সেই শূন্য হাতার ওপর জোরে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।'

থেমে গেল কাস্। প্রচণ্ড ভয়ে আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আরেক গ্লাস শেরি ঢাললো গলায়। ফ্যাঁসফেসে গলায় বললো, 'ঘা মারলাম যখন, বিশ্বাস করুন, মনে হলো একটা হাতের ওপরই ঘা মেরেছি।' চোখ বড়ো বড়ো করে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে, 'অথচ হাত-টাত কিছুই দেখিনি! ছায়া পর্যন্ত ছিল না হাতের!'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন মিঃ বানটিং সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন ভয়ে কুঁকড়ে থাকা লোকটার দিকে। তারপর বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'বড়ো অদ্ভুত ঘটনা। সত্যি বড়ো অদ্ভুত।'

পাঁচ

মৃদু অথচ স্পষ্ট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মিসেস বানটিংয়ের পরিষ্কার মনে হলো, তাঁদের বেডরুমের দরজা খুট্ করে খুলে গেল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল আবার। ভোর হতে তখনও দেরি আছে। ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার আগে নিস্তব্ধ ভারী হয়ে নেমেছে রাত। রাত পোহালেই হুইট-মানডে—আইপিংয়ের অন্যতম উৎসবের দিন

তখুনি স্বামীকে না জাগিয়ে মিসেস বানটিং বালিশ থেকে মাথাটা সামান্য তুলে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তারপর নিঃশব্দে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। ঠিক তখুনি আবার পরিষ্কার কানে এলো শব্দটা। খালি পায়ের মৃদু থপ থপ শব্দ তুলে কেউ একজন পাশের ড্রেসিং-রুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে সিঁড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কোনো ভুল নেই। এবার মিসেস বানটিং যতোটা সম্ভব সন্তর্পণে স্বামীকে জাগিয়ে ফিসফিস করে ঘটনাটা বললেন তাঁকে। আলো জ্বাললেন না রেভারেণ্ড বানটিং। চশমাজোড়া চোখে এঁটে স্ত্রীর ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে চটি পায়ে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে কান পাততেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন, নিচের তলায় তাঁর স্টাডির ডেস্কের ওপর জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটির খুটখাট শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ সশব্দে হাঁচি

দিলো কে যেন। তারপর সব চুপচাপ।

দ্রুত শোবার ঘরে ফিরে এসে মিঃ বানটিং ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার শিকটা হাতে তুলে নিলেন। আবার বেরিয়ে এসে যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। ততক্ষণে মিসেস বানটিংও এসে দাঁড়িয়েছেন ল্যাণ্ডিংয়ে।

ভোর প্রায় চারটে বাজে। জমাট অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। হলঘরের ভেতর আলোর সামান্য আভাস দেখা দিলেও স্টাডির খোলা দরজার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হাঁ-এর ভেতর কিছুইচোখে পড়ছে না। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধুমাত্র মিঃ বানটিংয়ের পায়ের চাপে সিঁড়িতে ক্ষীণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠছে। আবার নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল স্টাডির ভেতরে। হঠাৎ শব্দ করে খুলে গেল ডেস্কের দেরাজ, কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা গেল। বিড়বিড় করে অভিসম্পাত দিলো কে যেন। পরমুহূর্তে দেশলাই ঠোকার শব্দ হলো। হলুদ আলোয় ভরে উঠলো স্টাডি।

ততক্ষণে হলঘরের মেঝেয় নেমে এসেছেন মিঃ বানটিং। দরজার ফাঁক দিয়ে ডেস্ক, ডেস্কের খোলা দেরাজ, এমন কি ডেস্কের ওপর জ্বলন্ত মোমবাতিটাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু চোরের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ছে না কোথাও। কী করবেন স্থির করতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন হলঘরের ভেতরে। সন্তর্পণে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস বানটিং। ভয়ে মুখ শাদা হয়ে গেছে তাঁর। মিঃ বানটিং নিজের সাহস ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন এই ভেবে যে, চোর যে-ই হোক, নিশ্চয় এই গ্রামেরই বাসিন্দা সে।

ঝনাৎ করে একটা শব্দ হতেই মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল মিঃ

বানটিংয়ের। বাড়ির জমানো টাকায় হাত দিয়েছে চোর, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সচল হয়ে উঠলেন তিনি। লোহার শিকটা শক্ত হাতে চেপে ধরে এক লাফে ঘরের ভেতর ঢুকে গর্জন করে উঠলেন, 'খবরদার!'

কেউ নেই ঘরের ভেতরে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ বানটিং। প্রায় একই সময়ে ঘরে ঢুকেছেন মিসেস বানটিং, তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন।

এক মুহূর্ত আগেও কেউ ছিল ঘরে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় আধ মিনিট দু'জনের কেউই নড়াচড়া করতে পারলেন না। তারপর মিসেস বানটিং ঘরের অন্য পাশে গিয়ে ভয়ে ভয়ে পর্দা সরিয়ে দেখলেন। দেখাদেখি ডেস্কের নিচে উঁকি দিয়ে দেখলেন মিঃ বানটিং। মিসেস বানটিং জানালার পর্দা তুলে পরীক্ষা করলেন, বাজে কাগজের ঝুড়িটাও দেখলেন খুঁটিয়ে। এরপর মিঃ বানটিং চিমনির ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন। ফায়ারপ্লেসের পাশে কয়লার পাত্রের ঢাকনা সরিয়েও দেখলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দু'জন নিরস্ত হয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'হুলপ করে বলতে পারি আমি— বলতে বলতে জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে তাকিয়ে থমকে থেমে গেলেন মিঃ বানটিং। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কেউ না এলে আলো জ্বাললো কে?'

'আর ড্রয়ার?' বলে উঠলেন মিসেস বানটিং, 'ড্রয়ারটাও তো খোলা। টাকা উধাও।'

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

'এমন আশ্চর্য ব্যাপার—'

মিঃ বানটিংয়ের কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড হাঁচির শব্দে কেঁপে উঠলো প্যাসেজ। দৌড়ে বেরিয়ে এলেন দু'জন। অমনি কিচেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

'মোমবাতিটা আনো!' বলে মিঃ বানটিং আগে আগে ছুটলেন। দ্রুত ছিটকিনি খোলার শব্দ শোনা গেল

কিচেনের দরজা খুলে মিঃ বানটিং বাসন-কোসন ধোয়ার ছোট্ট ঘরের ভেতর দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন, পেছনের দরজাটা মাত্র ফাঁক হতে শুরু করেছে। ভোরের আবছা আলোয় দূরের বাগানের অন্ধকার গাছপালা মুহূর্তের জন্যে তাঁর নজরে পড়লো। বেরিয়ে যেতে দেখলেন না কাউকে। দরজার পাল্লাটা খুলে গেল, ফাঁক হয়ে রইলো এক মুহূর্ত, তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে। পাশে দাঁড়ানো মিসেস বানটিংয়ের হাতের মোমবাতি দমকা বাতাসের ধাক্কায় দপ্‌দপিয়ে উঠলো। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে তাঁরা ঢুকলেন কিচেনের ভেতর।

কেউ নেই সেখানে। পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দু'জন কিচেন, প্যান্ট্রি, স্কালারি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত নিচের সেলারে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজেও কোথাও কারো হদিস পাওয়া গেল না।

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। তবু বিমূঢ় অসহায় মুখে ভিকার বানটিং ও তাঁর স্ত্রী বিবর্ণ মোমবাতি হাতে নিয়ে এঘর-ওঘর করছেন।

ছয়

রাত পোহালেই হুইট-মানডে। ভালো করে আলো ফোটার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো হল্ ও মিসেস হল্। নিঃশব্দে দু'জন গিয়ে ঢুকলো নিচের সেলারে। তাদের কাজটা একটু গোপন ধরনের। সেলারে মজুত বীয়ারের আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে জড়িত ব্যাপারটা।

সেলারে পা দিতেই মিসেস হলের মনে পড়লো, ঘর থেকে সারসাপ্যারিলার বোতল আনা হয়নি। যেহেতু কাজটায় সে নিজে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে থাকে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই হল্ চললো ওপরতলা থেকে বোতলটা আনতে

ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছে আগন্তুকের ঘরের দিকে তাকিয়ে হল্ একটু অবাক হলো। ঘরের দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো তবু সে না দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

বোতল নিয়ে নিচে নেমে এসে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলো সে। সামনের দরজার ছিটকিনি খোলা, কোনরকমে হুড়কো লাগানো রয়েছে শুধু। অথচ পরিষ্কার মনে আছে, রাতে শোবার আগে তার চোখের সামনে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়েছে তার বউ, সে সঙ্গে এসেছিল মোমবাতি হাতে। দরজার দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হল্ খানিকক্ষণ। তারপর বোতল হাতেই আবার ফিরে চললো ওপরতলায়।

আগন্তুকের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলো। কোনো উত্তর নেই। আবার টোকা দিয়ে অপেক্ষা করলো খানিকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ঠেলা দিয়ে দরজাটা হাট করে খুলে ফেলে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

যা ভেবেছিল তাই। বিছানা শূন্য, ঘরে কেউ নেই। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হ'লো, বেডরুমের চেয়ারের ওপর এবং বিছানার শিয়র বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে আগন্তুকের পরনের সমস্ত কাপড়-চোপড়, এমনকি তার ব্যাণ্ডেজগুলোও। তার বড়ো স্লাউচ হ্যাটটা বেডপোস্টের মাথায় ঝুলছে বাঁকা হয়ে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হল্। এমন সময় নিচে সেলারের ভেতর থেকে ভেসে এলো তার স্ত্রীর অসহিষ্ণু ঝাঁঝালো কণ্ঠ, 'কী হলো, জর্জ? পাওনি, যা আনতে বলেছি?'

শোনামাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে গেল হল্।

'জ্যানি,' সেলারের সিঁড়ির ওপর থেকেই ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত-ভাবে বললো সে, 'হেনফ্রের কথাই ঠিক। লোকটা সুবিধের নয়। ঘরে নেই এখন দেখে এলাম। আর সামনের দরজার ছিটকিনি খোলা।'

প্রথমে মিসেস হল্ বুঝতে পারলো না কথাটা। তারপর ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সিদ্ধান্ত নিলো, নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে খালি ঘরটা। হল্ চললো আগে আগে, বোতলটা এখনও তার হাতেই রয়েছে।

'লোকটা নিজে ঘরে নেই,' বললো হল্, 'অথচ তার কাপড়গুলো আছে। কাপড় ছাড়া সে করছে কী? তাজ্জব ব্যাপার!'

সেলারের সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতেই একটা শব্দ এলো কানে। মনে হলো, সামনের দরজা কেউ খুলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে

দিলো। দাঁড়িয়ে পড়েছিল দু'জন, কিন্তু দরজাটা বন্ধই রয়েছে এবং সেখানে কেউ নেই দেখে কিছু না বলে আবার পা বাড়ালো। প্যাসেজে পৌঁছে মিসেস হল্ হাঁটার গতি বাড়িয়ে হল্‌কে ছাড়িয়ে আগেভাগে দৌড়ে উঠে গেল ওপরতলায়। এমন সময় হাঁচির শব্দ হলো সিঁড়িতে। ছ'ধাপ নিচে হল্ ভাবলো, তার স্ত্রী হাঁচি দিয়েছে। ওপর থেকে মিসেস হলের মনে হলো হাঁচিটা তার স্বামীর।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে মিসেস হল্ আগন্তুকের ঘরের ভেতর তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। 'আশ্চর্য ব্যাপার!' বললো সে বিড়বিড় করে। ঠিক ঘাড়ের পেছনে হাঁচির শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে দেখলো, তার কাছ থেকে অন্তত ছ'ফুট দূরে সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে মাত্র পা ফেলেছে হল্। পরক্ষণেই অবশ্য সে কাছে এসে পড়লো।

ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়লো মিসেস হল্। হাত বাড়িয়ে প্রথমে বালিশ তারপর কাপড়-চোপড় ছুঁয়ে দেখলো। 'ঠাণ্ডা,' বললো সে, 'তার মানে ঘণ্টাখানেক কিংবা তারও আগে বেরিয়ে গেছে লোকটা।'

বলতে না বলতেই অত্যন্ত অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো। বিছানার ওপর রাখা কাপড়গুলো লাফিয়ে এসে আপনাআপনি জড়ো হলো এক জায়গায়। স্তূপের মাঝখানটা ঝট্ করে উঁচু হয়ে উঠলো চূড়ার মতো, তারপর গোটা স্তূপ শূন্যে লাফিয়ে উঠে হিটকে গিয়ে পড়লো বিছানার পায়ের দিকে। পরমুহূর্তে আগন্তুকের স্লাউচ হ্যাট বেড পোস্টের মাথা থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যের ভেতর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা পথ রচনা করে উড়ে এসে সোজা আছড়ে পড়লো মিসেস হলের মুখে। একই গতিতে ওয়াশস্ট্যাণ্ড থেকে ছুটে এলো স্পঞ্জের

টুকরোটা এরপর যা ঘটলো তা আরো অবিশ্বাস্য। যেন প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠলো বিছানার পাশে রাখা চেয়ারখানা—আগন্তুকের কোট এবং ট্রাউজার পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে হেসে উঠলো খোনা গলায়। চার পা শূন্যে তুলে তাক করলো মিসেস হলের দিকে। এক মুহূর্ত স্থির ভেসে থেকে সোজা ছুটে এলো তার দেহ লক্ষ্য করে। চিৎকার করে ঘুরে দাঁড়ালো মিসেস হল্। জোরে ঘা মারলো না চেয়ারখানা, আস্তে এসে ঠেকলো মিসেস হলের পিঠে। চাপ বাড়লো ক্রমশ, তাকে এবং হল্‌কে ঠেলে বের করে দিলো ঘর থেকে। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, লক্ করার শব্দ হলো। বিজয়ের উল্লাসে যেন চেয়ার এবং বিছানা ন্যাচানাচি করলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই আবার চুপচাপ হয়ে গেল সবকিছু।

মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে মিসেস হলের। ল্যাণ্ডিংয়ের ওপর প্রায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে হল্। তার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে মিলি ছুটে এসেছে বিছানা ছেড়ে। মিলি এবং হল্ দু'জনে মিলে বহু কষ্টে তাকে নিচে নামিয়ে এনে তাড়াতাড়ি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলো।

'ভূত!' মিসেস হল্ চোখ মেলেই বলে উঠলো, 'ভূত আছে ও-ঘরে! এসব আগেও শুনেছি আমি। আপনা থেকেই টেবিল-চেয়ার নাচানাচি করে, লাফিয়ে বেড়ায়—!'

'দেখি, জ্যানি, এই যে, আরেক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে নাও,' স্ত্রীর মুখের কাছে চামচ বাড়িয়ে ধরলো হল্, 'ভালো লাগবে।'

'দরজা আটকে রাখো,' মিসেস হল্ বলে উঠলো, 'বাড়িতে ঢুকতে দিও না শয়তানটাকে। আগেই ভেবেছিলাম আমি—আগেই জানতাম। ওই ঠুলিপরা চোখ, ব্যাণ্ডেজমোড়া মাথা, রোববারেও গির্জায়

যাবার নাম নেই—এসব দেখে আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর ওই সব বোতল—অতো বোতল দিয়ে মানুষের কী কাজ ? চেয়ার-টেবিলের ওপর ভূতের আসর হয়েছে, সব ওই লোকটার কীর্তি। হায় হায় আমার জিনিসপত্রগুলোর কী দশা হবে ! আমি যখন এই-টুকু ছিলাম, তখন ওই চেয়ারেই বসতো আমার মা। সেই চেয়ার কিনা এখন আমায় এসে লাথি মারে !'

'আর মাত্র এক ফোঁটা, জ্যানি, খেয়ে নাও এটুকু,' অক্লান্তভাবে সাধাসাধি করছে হল্, 'তুমি বড্ড অস্থির হয়ে আছো।'

ততক্ষণে রোদ উঠে পড়েছে। পাঁচটা বাজে। সবাই মিলে পরা-মর্শ করে মিলিকে পাঠালো রাস্তার ওপারের কামারশালা থেকে কর্মকার স্যাণ্ডি ওয়েজার্সকে ডেকে আনবার জন্যে। সাহসী লোক সে, বুদ্ধিসুদ্ধিও রাখে।

মিলির মুখে সব কথা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠলো স্যাণ্ডি ওয়ে-জার্সের মুখ। ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে খতিয়ে দেখে মন্তব্য করলো সে, 'যাদু টোনা না হয়েই যায় না।'

চিন্তিতমুখে সরাইখানায় এসে পৌছুল স্যাণ্ডি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওপরতলায় নিয়ে যাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্যস্ত-তার চিহ্নমাত্র নেই স্যাণ্ডির মধ্যে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বল-তেই তার আগ্রহ বেশি দেখা গেল।

হাক্সটারের দোকানের শিক্ষানবীশ এক কর্মচারী রাস্তার দিকের জানালার শাটার নামাচ্ছিল, তাকেও ডাকা হলো আলোচনায় যোগ দেবার জন্যে। তার পিছু পিছু কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলো হাক্সটার নিজেও।

অনেক কথাবার্তা চললো অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু স্থির হলো না

কিছুই। স্যাণ্ডি ওয়েজার্সের এক কথা, 'ব্যাপারটা আসলে কী, সেটা আগে বুঝে দেখা দরকার। দরজা ভেঙে ঢোকাটা ঠিক হবে কিনা আগে ভেবে দেখি আমরা। যতক্ষণ বন্ধ রয়েছে দরজা ততক্ষণ তো আর ভেঙে ঢুকতে বাধা নেই, কিন্তু একবার ভেঙে ঢুকে পড়লে সেটা আর শোধরানো যাচ্ছে না।'

এমন সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ আপনাআপনি হাঁ হয়ে খুলে গেল ওপরতলার ঘরের দরজা। সবার বিস্মিত চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো রহস্যময় আগন্তুক। তেমনি আপাদ-মস্তক পোশাকে ঢাকা, চোখে বিশালাকার গাঢ় নীল চশমা। স্থির তাকিয়ে থেকে ধীর গম্ভীর ভঙ্গিতে নেমে এলো সে। প্যাসেজ পার হয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'কী ওটা?' বলে উঠলো সে। সবার চোখ ঘুরে গেল তার দস্তানা ঢাকা আঙুল যেদিকটা নির্দেশ করছে সেদিকে। সবাই দেখতে পেলো, সেলারের দরজার ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে একটা সারসাপ্যারিলার বোতল পারলারের ভেতর ঢুকে পড়লো লোকটা, তারপর হঠাৎ করে অত্যন্ত দ্রুত সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সবার মুখের ওপর।

দরজার প্রচণ্ড আওয়াজের রেশ একেবারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ একটি কথাও বললো না। একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো নিঃশব্দে। তারপর ওয়েজার্স বলে উঠলো, 'এমন তাজ্জব ব্যাপার দেখিনি কখনো!' হলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চলো দেখি, আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করছি ব্যাটাকে এসবের মানে কী।'

সাহস সঞ্চয় করতে বেশ কিছুটা সময় নিলো হল্। শেষ পর্যন্ত দু'জন এগিয়ে গেল পারলারের দিকে। দরজায় টোকা দিলো হল্,

পাল্লাদু'টো মৃদু ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে কোনোরকমে উচ্চারণ করলো, 'কিছু মনে করবেন না—'

'ভাগো এখান থেকে !' ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জে উঠলো আগন্তুক, 'বন্ধ করে দাও দরজা।'

স্যাণ্ডির তদন্তের পরিসমাপ্তি ঘটলো তৎক্ষণাৎ।

সাত

সকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে পারলারে ঢুকেছে আগন্তুক। এখন বেশ বেলা হয়েছে। পারলারের জানালার ব্লাইণ্ড নামানো, দরজা বন্ধ। এখন পর্যন্ত আর কেউ এগোতে সাহস করেনি।

এ-পর্যন্ত নিশ্চয় অনাহারে থাকতে হয়েছে লোকটাকে। তিন তিনবার ঘণ্টা বাজিয়েছে সে। তৃতীয়বার বাজিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে, ভয়ানক তেজের সঙ্গে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি।

এ-কান সে-কান হয়ে সরাইখানায় একটা গুজব এসে পৌঁছলো, গত রাতে ভিকারের বাড়িতে চুরি হয়েছে। অমনি দু'য়ে দু'য়ে চার করে ফেললো সবাই। ওয়েজার্সকে সঙ্গে নিয়ে হল্ বেরিয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শাক্‌ল্‌ফোর্থের পরামর্শ নিতে।

কেউ জানে না লোকটা কী করছে। মাঝে মধ্যে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দ্রুত পায়চারির আওয়াজ আসছে। প্রবল গালি-গালাজ, কাগজপত্র ছেঁড়া আর আছড়ে শিশি-বোতল ভাঙার শব্দ শোনা গেছে দু'বার।

ভয়ার্ত অথচ কৌতূহলী লোকজনের ছোট্ট দলটি এখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। মিসেস হাক্সটারকে দেখা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। হুইট-মানডে উপলক্ষে কালো রেডিমেড জ্যাকেট আর পিকে পেপার টাই পরা একদল ছেলে এসে ভিড়েছে সবার সঙ্গে। অনর্গল এটাসেটা

এলোমেলো প্রশ্ন করছে তারা। আঙিনা পেরিয়ে জানালার ব্লাইণ্ডের নিচ দিয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করে এসে বিখ্যাত হয়ে গেল কিশোর আর্চি হার্কার। কিছুই দেখেনি সে, কিন্তু এমন ভান করলো যেন সাংঘাতিক কিছু একটা তার চোখে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ আইপিংয়ের আরো কিছু ছেলে জুটে গেল তার সঙ্গে।

হুইট-মানডে উপলক্ষে জমজমাট মেলার আয়োজন হচ্ছে। গ্রামের রাস্তার পাশে ডজনখানেক বুদ এবং একটা শুটিং গ্যালারি খোলা হয়েছে। হলুদ আর চকোলেটরঙা তিনখানা চার চাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কামারশালার পাশে ঘাসে ঢাকা মাঠে। বিচিত্র পোশাক পরা কয়েকজন নারী-পুরুষ কোকোনাট শাই-এর আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। দু'জন লোক রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পতাকাশোভিত রশি টাঙাচ্ছে।

ওদিকে সরাইখানার অন্ধকার পারলারে অস্বস্তিকর গরম পোশাকে শরীর মুড়ে তেমনি বসে রয়েছে আগন্তুক। সরু একফালি মাত্র রোদ ঘরে ঢুকে মৃদু আলো দিচ্ছে। সন্ত্রস্ত হয়ে আছে লোকটা, বেশ খিদেও পেয়েছে তার। তা সত্ত্বেও চশমার গাঢ় কাচের ভেতর দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখছে, মাঝে মাঝে হোট ছোট নোংরা শিশিবোতল নাড়াচাড়া করছে ঠুংঠাং শব্দ তুলে জানালার বাইরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে যেসব ছেলে, দেখতে না পেলেও আওয়াজ শুনে তাদের উপস্থিতি ঠিকই টের পাচ্ছে সে। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে প্রচণ্ড গালাগাল বর্ষণ করছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে ঘড়ের কোণে অন্তত আধ ডজন ভাঙা বোতলের টুকরো পড়ে আছে। ক্লোরিনের ঝাঁঝালো কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

দুপুরবেলা হঠাৎ খুলে গেল পারলারের দরজা। বারে বসে থাকা

তিনচারজন লোকের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আগন্তুক কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'মিসেস হল্‌কে চাই।' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে একজন উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস হল্‌কে খবর দিতে চলে গেল।

একটু দেরি হলো মিসেস হলের আসতে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে সে, তাতে করে বরং আরো কঠিন হয়ে উঠেছে তার রুদ্রমূর্তি। হল্‌ বাইরে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলেছে সে। তার হাতে ধরা একটা ছোট্ট ট্রে। ট্রের ওপর একখানা কাগজ।

'আপনার বিল চাইছেন নিশ্চয় ?' বললো মিসেস হল্‌।

'আমার ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়নি কেন ? আমার খাবার কোথায় ? বেল বাজিয়েছি, তবু কারো সাড়াশব্দ নেই কেন ? আমি কি না খেয়ে থাকি ?'

'আমার বিল শোধ করা হয়নি কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো মিসেস হল্‌। 'সেকথা জানতে চাই আগে।'

'তিনদিন আগে বলেছি আমি, কিছু টাকা আসার কথা আছে, সেজন্যে অপেক্ষা করছি—'

'আমি দু'দিন আগে বলেছি, ওসব অপেক্ষার ধার ধারি না। আমার বিল যদি পাঁচদিন পড়ে থাকে, তাহলে কি ব্রেকফাস্ট দিতে একটু দেরি হলে গজর গজর করা সাজে আপনার ?'

স্পষ্ট গালিগালাজ দিয়ে উঠলো লোকটা। বারের ভেতর মৃদু গুঞ্জন উঠলো।

'আপনার গালমন্দ আপনার কাছে থাক,' মিসেস হল্‌ বললো একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে।

মনে হচ্ছে আরো রেগে গেছে লোকটা। বারের সবাই বুঝতে

পারছে, বেশ জব্দ করেছে তাকে মিসেস হল্।

'শুনুন—' শুরু করলো আগন্তুক।

'কিছু শুনতে চাই না আমি,' মিসেস হল্ বললো।

'আমি তো বলেছি আমার টাকাটা আসেনি—'

'তা আসবে বৈকি!' মিসেস হল্ মন্তব্য করলো।

'তবে আমার পকেটে বোধ হয় কিছু—'

'দু'দিন আগে আপনি বলেছেন আপনার কাছে খুচরো যা আছে সব মিলিয়ে এক পাউণ্ডও হবে না—'

একটু ইতস্তত করলো লোকটা। 'আরো কিছু টাকা পাওয়া গেছে—'

আবার গুঞ্জন উঠলো বারের ভেতর।

'কোত্থেকে পেলেন সেটাই কথা!' মিসেস হল্ তিক্ত স্বরে মন্তব্য করলো।

কথাটা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আগন্তুক। পা ঠুকে গর্জে উঠলো, 'কী বলতে চান আপনি?'

'বলছি, কোত্থেকে জোগাড় করলেন টাকাটা,' ফেটে পড়লো মিসেস হল্। 'বিলের কথা কিংবা ব্রেকফাস্টের কথা পরে হবে। তার আগে দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে। কয়েকটা ব্যাপার আমাদের কারো মাথায় ঢুকছে না, সে-সবের ব্যাখ্যা চাই। আমি জানতে চাই, ওপর তলায় আমার চেয়ারের কী করেছেন আপনি। জানতে চাই, ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন, আবার ঘরে ঢুকলেনই বা কী করে। এ-বাড়িতে যারা থাকে, দরজা দিয়েই ভেতরে ঢোকে তারা—সেটাই এখানকার নিয়ম। আপনি দরজা দিয়ে ঢোকেননি, কী করে ঢুকলেন তাহলে, আমি জানতে চাই। আরো

জানতে চাই—'

হঠাৎ দস্তানা পরা দু'হাত এক করে উঁচুতে তুলে আনলো আগন্তুক। পা ঠুকে প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠলো, 'চুপ!'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মিসেস হল্।

'বুঝতে পারছো না তোমরা,' হঠাৎই ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠেছে লোকটার গলা, 'আমি কে, আমি কী, বুঝতে পারছো না। বুঝিয়ে দিচ্ছি! ঈশ্বরের দিব্যি, এক্ষুণি দেখতে পাবে।' বলতে বলতে একটা হাত মুখের ওপর নিয়েই পরক্ষণে সরিয়ে ফেললো সে। মুখের ঠিক মাঝখানটায় একটা কালো গর্ত দেখা গেল। 'এই নাও,' বলে একপা এগিয়ে এসে কিছু একটা বাড়িয়ে ধরলো সে মিসেস হলের দিকে। লোকটার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করছিল মিসেস হল্, প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিলো সে। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে চেয়েই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠে জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিছিয়ে এলো সভয়ে। মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল চকচকে একটা লালচে জিনিস। নাক—আগন্তুকের নাক!

চোখ থেকে সুবিশাল নীল চশমা একটানে খুলে ফেললো লোকটা। ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল বারের ভেতরের প্রতিটি মানুষ। দু'টো গভীর অন্ধকার কোটর দেখা যাচ্ছে চোখের জায়গায়। এবার মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেললো আগন্তুক। মুঠি করে ধরে হ্যাঁচকা টান লাগালো মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলে, গোঁফের থোকায়, ব্যাণ্ডেজে। আতঙ্কের হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল ঘরের ভেতর। 'খোদা!' ককিয়ে উঠলো কে যেন। খুলে এসেছে লোকটার চুল, গোঁফ, ব্যাণ্ডেজ —সবকিছু!

ঘোর দুঃস্বপ্নকেও হার মানিয়ে দেয় ব্যাপারটা। আতঙ্কে বোবা হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল মিসেস হল্। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো বাইরের দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর হুলস্থুল পড়ে গেল। দগ-দগে ঘা,কাটা-ছেঁড়া, বিকৃতি—এককথায় দৃশ্যমান যে-কোনো ভয়াবহ জিনিস দেখবার জন্য তৈরি ছিল সবাই। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না তারা—আস্ত মাথাটাই নেই ঘাড়ের ওপর, কিছুই নেই!

একগাদা ব্যাণ্ডেজ এবং নকল চুল প্যাসেজের ভেতর দিয়ে উড়ে এসে পড়লো বারের ভেতর। হিটকে সরে গেল সবাই। দরজা দিয়ে হুড়দাড় বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো একজন আরেকজনের ওপর। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে মুণ্ডহীন লোকটা প্রবল বেগে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে অসংলগ্ন কী একটা ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। পা থেকে শুরু করে কোটের কলার পর্যন্ত সব ঠিক আছে, তারপর—হঠাৎ শূন্যতা, কিছুই নেই তার কাঁধের ওপর!

চেঁচামেচি শোরগোল শুনে রাস্তার দু'পাশের নারী-পুরুষ চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেলো, কোচ অ্যাণ্ড হর্সেস সরাইখানার ভেতর থেকে উন্মত্তের মতো হিটকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। মিসেস হল্ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিঁড়ি থেকে রাস্তার ওপর, লম্বা এক লাফ দিয়ে তাকে অতিক্রম করে এলো টেডি হেনফ্রে।

কোলাহল শুনে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসেছিল মিলি। হঠাৎ চোখের সামনে কিচেনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুণ্ডহীন আগন্তুককে দেখতে পেয়ে জমে গেল সে। রাস্তা থেকে পরিষ্কার শোনা গেল তার ভয়ার্ত চিৎকার।

দেখতে দেখতে রাস্তার সমস্ত লোকজন—মিষ্টিবিক্রেতা, কোকো-নাট শাই-এর প্রোপ্রাইটর এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, দোলনাওয়ালা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, গ্রামের ফুলবাবুর দল, সুসজ্জিত মেয়েরা, বয়স্ক নারীপুরুষ, এপ্রন-পরা জিপ্‌সির দল—সবাই দৌড়ুতে শুরু করলো সরাইখানার দিকে। অসম্ভবরকম কম সময়ের মধ্যে জনা-চল্লিশেক লোকের একটা জটলা তৈরি হয়ে গেল দরজার সামনে। চারদিক থেকে আরো লোকজন ছুটে আসছে দ্রুত। ভিড়ের আয়তন বেড়েই চলেছে। ঠেলাঠেলি করছে লোকজন, গুঁতো খেয়ে ধমকাচ্ছে এ ওকে, কেউ কেউ প্রশ্ন করে যাচ্ছে একনাগাড়ে, কেউ আবার বিস্ময় প্রকাশ করছে কিংবা চেঁড়ে গলায় পরামর্শ দিচ্ছে এটা-সেটা। কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই, কেউ কারো কথা শুনছে না। মহা হৈ-হট্টগোল চলছে সব মিলিয়ে।

কয়েকজন ছুটে গিয়ে টেনে তুলেছে প্রায় সংজ্ঞাহীন মিসেস হল্‌কে। ছোটখাটো একটা সভা শুরু হয়ে গেছে তাকে ঘিরে। ঘট-নার প্রত্যক্ষদর্শী একজন উত্তেজিতভাবে গলা ফাটিয়ে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে। সেইসঙ্গে নানা মন্তব্য আসছে চারদিক থেকে:

'জীন-ভূত হবে কিছু একটা!'

'তারপর কী করলো সে?'

'কাজের মেয়েটাকে জখম করেছে নাকি?'

'ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে পেছন পেছন, আমার মনে হয়।'

'মাথা নেই, বিশ্বাস করো। আরে নানা, বুদ্ধি নেই তা বলছি না, আসলেই মুণ্ডু নেই লোকটার, মুণ্ডু ছাড়া শুধু ধড় একটা!'

'যত্তোসব আজগুবি কথা! যদি ভেলকি না হয় তো কী বলেছি!'

'ফড়ফড় করে ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেললো মুখ থেকে, বিশ্বাস করো—'

কৌতূহলী জনতার ভিড় দরজার মুখে অস্থির একটা ত্রিভুজের আকৃতি নিয়েছে। একটু বেশি সাহসী যারা, তারা রয়েছে ত্রিভুজের শীর্ষে, খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে।

'—মেয়েটার চিৎকার শুনে ফিরে তাকালো লোকটা। মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতেই সে-ও দৌড় দিলো পেছন পেছন।' দশ সেকেণ্ডের ভেতরই ফিরে এলো সে। হাতে একখানা ছুরি আর এক টুকরো রুটি। এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ, যেন এক-দৃষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র আবার ঘরে ঢুকেছে। মাথা বলতে কিছু নেই, বিশ্বাস করো। একবার দেখলে বুঝতে—'

থেমে গেল বক্তা। পেছনে কিসের যেন হৈ চৈ, লোকজন সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছে। বুক ফুলিয়ে হেঁটে আসছে কয়েকজন লোক। প্রথমে দেখা গেল হল্‌কে, চোখমুখ লাল টকটকে, চেহারায় সাংঘাতিক কঠিন একটা ভাব। তার পেছনে গ্রামের কনস্টেবল বডি জেফার্স। সবশেষে সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে স্যাণ্ডি ওয়েজার্স। ওয়ারেণ্ট নিয়ে হাজির হয়েছে তারা।

চেঁচিয়ে নানান তথ্য জানান দিচ্ছে লোকজন।

'মুণ্ডু থাকুক আর না-ই থাকুক,' বুক ফুলিয়ে বললো জেফার্স, 'গ্রেফতার করতে হবে ব্যাটাকে। গ্রেফতার আমি করবোই।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে হল্ সোজা পারলারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এক ধাক্কায় খুলে ফেললো দরজা। 'কনস্টেবল,' বলে উঠলো সে, 'তোমার যা ডিউটি, করো।'

বুক ঠুকে ঢুকে পড়লো জেফার্স। তার পেছনে হল্, সবশেষে ওয়েজার্স। ঘরের আবছা আলোয় তারা দেখতে পেলো, মুণ্ডুহীন দেহটা

দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে ফিরে। দস্তানায় ঢাকা এক হাতে ধরা রয়েছে খুবলে খাওয়া এক টুকরো রুটি, আরেক হাতে এক চাকা পনির।

'ওই যে!' বলে উঠলো হল্।

'মানে কী এসবের?' ক্রুদ্ধ স্বর ভেসে এলো ধড়টার কলারের ওপর থেকে।

'বড্ড ঘুঘু লোক তুমি,' বলে উঠলো জেফার্স। 'কিন্তু মুণ্ডু থাক আর না-ই থাক, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। ওয়ারেন্টে লেখা আছে "বডি", আমার ডিউটি আমি করবোই।'

'খবরদার, এগিয়ো না!' এক পা পিছিয়ে গিয়ে গর্জে উঠলো ধড়টা।

ঝট করে হাত থেকে রুটি আর পনির নামিয়ে রাখলো সে। ঠিক সময় বুঝে হল্ হোঁ মেরে ছুরিটা তুলে নিলো টেবিলের ওপর থেকে।

বাঁ হাতের দস্তানা একটানে খুলে ফেললো আগন্তুক। ছুঁড়ে মারলো জেফার্সের মুখ লক্ষ্য করে। ওয়ারেন্ট নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জেফার্স, মাঝপথে আটকে গেল তার কথা। বিদ্যুদ্-বেগে ছুটে গিয়ে মূর্তিটার চেটোবিহীন হাতের কব্জি চেপে ধরলো সে এক হাতে, অন্য হাতে আঁকড়ে ধরলো তার অদৃশ্য গলা। সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম এক লাথি এসে পড়লো তার হাঁটুর নিচে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে, কিন্তু হাত ঢিলে করলো না একটুও। দলের গোল-রক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে ওয়েজার্স। টেবিলের ওপর দিয়ে এক ধাক্কায় ছুরিটা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সামনে পা বাড়ালো হল্। জেফার্স এবং আগন্তুক ধস্তাধস্তি করতে করতে এগিয়ে আসছে। দু'জনের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে একটা চেয়ার ছিটকে পড়লো একদিকে।

'পা ধরো,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে কোনমতে বললো জেফার্স।

কথামতো কাজ করতে গিয়ে বুকে এক প্রচণ্ড লাথি খেলো হল্। খানিকক্ষণের জন্যে বাতিল হয়ে রইলো সে। ততক্ষণে মুণ্ডহীন আগন্তুক আধপাক গড়িয়ে জেফার্সের বুকের ওপর চেপে বসেছে। ব্যাপার দেখে ওয়েজার্স ছুরি হাতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট দিলো দরজার দিকে। হুড়মুড় করে গিয়ে ধাক্কা খেলো সে হাক্সট'রের সঙ্গে—লোকজন নিয়ে হাক্সট'র ঢুকছিল শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে। ঠিক একই সময়ে শিফোনিয়ারের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো তিন চারটে কাচের বোতল, ঝনঝন শব্দ তুলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেল ঘর।

'সারেণ্ডার করছি আমি!' হঠাৎ চিৎকার করে কথাটা বলে জেফার্সকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আগন্তুক। হাঁপাচ্ছে সে। আরো অদ্ভুত লাগছে এখন তাকে দেখতে, দু'হাতের দস্তানা খুলে ফেলায় মাথার সঙ্গে সঙ্গে হাতদু'টোও অদৃশ্য হয়ে গেছে। 'মারামারি করে লাভ নেই,' বললো হাঁপাতে হাঁপাতে। শূন্যের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠ।

লাফ দিয়ে দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল জেফার্স। তার পকেট থেকে বেরিয়ে এলো একজোড়া হাতকড়া। কিন্তু দু'পা এগিয়েই থমকে গেল সে। হাতকড়া পরাবে কিসে!

আগন্তুক তার ওয়েস্টকোটের বুক বরাবর ওপর থেকে নিচে শূন্য হাতদুটো বুলিয়ে নিলো একবার দ্রুত। যেন যাদুমন্ত্রের বলে খুলে গেল সবগুলো বোতাম। হাঁটুর কথা কী যেন বলতে বলতে ঝুঁকে পড়লো সে। মনে হচ্ছে জুতো মোজা নিয়ে কিছু একটা করছে।

'সে কী!' হঠাৎ বলে উঠলো হাক্সটার, 'মানুষই নয় আসলে

ওটা ! শুধু কাপড়চোপড় ! কলারের ভেতর দিয়ে ফাঁকা গর্ত দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো ? হাত ঢুকিয়ে দেয়া যাবে—' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। শূন্যের ভেতর কিসের সঙ্গে যেন ঠেকে গেল হাতখানা। আর্তনাদ করে তৎক্ষণাৎ সে টেনে নিলো হাত।

'চোখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিও না, গর্দভ !' ফুঁসে উঠলো বায়বীয় কণ্ঠ। 'সবই আছে আমার—মাথা, হাত, পা—সব। কিন্তু অদৃশ্য আমি। গাঁজাখুরি মনে হলেও কথাটা আসলে সত্যি। সেজন্যে আইপিংয়ের গেঁয়ো ভূতের দল আমাকে পিটিয়ে ছাতু করবে নাকি ?'

বোতামখোলা জামাকাপড় সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবার। ঝুলছে শিথিলভাবে। কোটের দু'হাত কোমরে রাখা।

আরো কিছু লোকজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে, প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে ঘর।

'কী বললে ? অদৃশ্য ?' গালাগাল গায়ে না মেখে বলে উঠলো হাক্সটার। 'কে কবে শুনেছে এমন কথা ?'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত। কিন্তু আমি কোনো অন্যায় করিনি। পুলিশের লোক কেন আমাকে অপমান করবে এভাবে ?'

'রাখো ওসব,' জেফার্স বললো, 'এই আলোতে তোমাকে দেখতে একটু কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমার ওয়ারেন্টের ভেতর কোনো গোলমাল নেই। চুরির অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে। অন্যের বাড়িতে ঢুকে টাকা চুরির অভিযোগ।'

'তাই নাকি ?'

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—'

'কচু বোঝা যাচ্ছে !' বললো অদৃশ্য আগন্তুক।

'তাই যেন হয়। কিন্তু হুকুম তামিল করতে হবে আমাকে।'

'বেশ,' আগন্তুক বলে উঠলো, 'যাবো আমি, তোমাদের সঙ্গে যাবো। কিন্তু হাতকড়া পরানো চলবে না।'

'কিন্তু সেটাই নিয়ম,' জেফার্স বললো।

'হাতকড়া পরবো না আমি,' আগন্তুকের এক গোঁ।

'মাফ করতে হবে আমাকে, সেটি হচ্ছে না,' জেফার্স বললো।

আচমকা বসে পড়লো মূর্তিটা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে জুতো, মোজা, ট্রাউজার ছেড়ে ফেলে সেগুলো লাথি মেরে পাঠিয়ে দিলো টেবিলের তলায়। পরক্ষণে আবার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে কোট খুলতে শুরু করলো।

'খামোশ!' গর্জে উঠলো জেফার্স। বুঝে ফেলেছে সে কী ঘটতে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে ওয়েস্টকোটটা ধরে ফেললো খপ করে। টানা হ্যাঁচড়া চললো খানিকক্ষণ। ভেতর থেকে সুড়ুত করে বেরিয়ে গেল শার্টটা, খালি কোট ঝুলে রইলো জেফার্সের হাতে। 'ধরো, ধরো ওকে!' চিৎকার করে বলে উঠলো সে। 'একবার যদি সব গা থেকে খুলে ফেলতে পারে—'

'ধরো, ধরো!' চেঁচাচ্ছে সবাই। শুধুমাত্র একটা শাদা শার্ট এখন ছোটাছুটি করছে শূন্যে। সবাই ছুটলো সেটার পেছনে। দু'হাত বাড়িয়ে সামনে এগোচ্ছিল হল্। তেড়ে এলো শার্টটা তার দিকে। একটা হাতা এগিয়ে এসে মোক্ষম এক ঘুসি ঝাড়লো তার মুখে। উড়ে গিয়ে পেছনের লোকজনের ভেতর আছড়েপড়লো সে। সঙ্গে সঙ্গে একটু উঁচুতে উঠে গিয়ে শার্টটা খানিকটা চুপসে গেল। এমনভাবে দ্রুত নড়াচড়া শুরু করলো যেন সেটা গা থেকে খুলে ফেলছে কেউ মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে। হাত বাড়িয়ে শার্টটা খামচে ধরলো জেফার্স, তাতে করে আরো দ্রুত খুলে এলো সেটা।

মুখের ওপর দড়াম করে একটা অদৃশ্য ঘুসি এসে পড়তেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো সে। হাতের লাঠিটা বোঁ করে ঘুরে গিয়ে টেডি হেনফ্রের মাথার চাঁদিতে পড়লো ঠকাস করে।

'হুঁশিয়ার! সাবধান!' চেঁচাচ্ছে সবাই। অনবরত এক এক জায়গায় বেড় দিয়ে লোকজন শূন্যের ভেতর ঘুসি ছুঁড়ছে।

'ধরো ব্যাটাকে!'

'দরজা বন্ধ করে দাও! সর্বনাশ হবে বেরিয়ে গেলে!'

'ধরেছি আমি! এই যে, এই যে!'

নানা কণ্ঠের চিৎকারে প্রচণ্ড শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না কেউ-ই, বরং অদৃশ্য শত্রুর হাতে এলোপাতাড়ি মার খেয়ে যাচ্ছে সবাই।

নাকের ওপর একটা ভয়ানক ঘুসি খেয়ে স্যাণ্ডি ওয়েজার্স রণে ভঙ্গ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। বন্ধ দরজা এক ঝটকায় খুলে ফেলে ছুট দিলো সবার আগে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে পড়ি কি মরি অনুসরণ করলো তাকে। একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছেঁকে ধরলো দরজা।

অদৃশ্য হাতের মার চলছে সমানে। ফিপ্‌স্-এর সামনের দাঁত খসে পড়েছে একটা, হেনফ্রের কান থেঁতলে গেছে। চোয়ালের নিচে ঘুসি খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো জেফার্স, অদৃশ্য একটা শরীর ঠেকলো তার হাতে। ওপাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত লাগিয়ে ঠেলছে হাক্সটার, পার হয়ে এদিকে আসতে পারছে না। পেশীবহুল একটা চওড়া বুকের সঙ্গে ঘষা খেলো জেফার্স, পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে এলো বাইরে। দেখতে দেখতে সমস্ত লোকজন হুড়মুড় করে এসে পড়লো জনাকীর্ণ হলঘরের ভেতর।

'ধরেছি!' শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে জেফার্সের, কেউ যেন গলা

টিপে ধরেছে তার। অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে সবার গায়ের ওপর বারবার সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে মুখে, শরীরের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে।

ডাইনে-বাঁয়ে লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে লোকজন। অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সরাইখানার দরজার দিকে। পাক খেতে খেতে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বাইরে নেমে গেল জেফার্স। শ্বাস নিতে পারছে না ভালো করে। দম-আটকানো ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে অনবরত, দু'-হাতে অদৃশ্য শত্রুকে আঁকড়ে ধরে হাঁটু দিয়ে গুঁতিয়ে চলেছে। হঠাৎ পাক খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়লো সে, পাথুরে রাস্তায় ঠুকে গেল মাথা। দু'হাত ছড়িয়ে পড়লো দু'পাশে।

'ধরো, ধরো! পালিয়ে গেল!' উত্তেজিত চিৎকার উঠলো।

কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কোত্থেকে এক যুবক দৌড়ে এসে মুহূর্তের জন্যে জাপটে ধরলো অদৃশ্য কিছু একটা, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা কনস্টেবলের ওপর। কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে এক মহিলা চিৎকার করে উঠলো। জোর এক লাথি খেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে একটা কুকুর দৌড় দিলো হাক্সটারের বাড়ির অঙিনার দিকে।

লোকজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক ভীতি নেমে এলো সবার মধ্যে। ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার রাশি যেমন ছড়িয়ে যায় চারদিকে, তেমনি গ্রামময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো মানুষের দঙ্গল। দ্রুত পা বাড়ালো যে যার বাড়ির দিকে।

শুধু জেফার্স অনড় পড়ে রইলো চিৎ হয়ে। হাঁটু দু'টো অসহায়-ভাবে বেঁকে আছে তার।

আট

বিশাল খোলা পাহাড়ি ঢালে একা শুয়ে আছে সখের প্রকৃতিবিদ্ গিবিন্‌স্। তার চারপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই।

প্রায় তন্দ্রা এসে গিয়েছিল গিবিন্‌স্-এর। হঠাৎ কাশির আওয়াজে তার ঝিমুনি টুটে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার হাঁচির শব্দ শুনতে পেলো সে। তারপর ভেসে এলো উত্তপ্ত গালাগাল।

ভালো করে চোখ মেলে তাকালো গিবিন্‌স্। দেখতে পেলো না কাউকে। কিন্তু নির্ভুল শুনতে পাচ্ছে সে মানুষের গলার স্বর। বিচিত্র গালাগালের নমুনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা শিক্ষিত। আওয়াজটা চড়তে চড়তে বেশ জোরালো হয়ে উঠলো, তারপর আবার ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল দূরে। গিবিন্‌স্-এর মনে হলো, অ্যাডারডিনের দিকে চলে যাচ্ছে অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটা। থেকে থেকে হাঁচির শব্দ ভেসে আসছে। একসময় তা-ও আর শুনতে পেলো না সে। চারদিকটা আবার আগের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সকালের ঘটনা কিছুই শোনেনি গিবিন্‌স্। অদ্ভুত, অবাস্তব মনে হলো তার কাছে ব্যাপারটা। দার্শনিক প্রশান্তি সম্পূর্ণ উবে গেল মন থেকে।

উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাড়ি। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে যত দ্রুত সম্ভব পা চালালো গ্রামের দিকে।

নয়

গোলগাল থলথলে মুখ লোকটার। সিলিণ্ডারের মতো লম্বা নাক, বড়-সড়ো বিস্তৃত ভেজা ভেজা ঠোঁট। মুখভর্তি খাড়া খাড়া অদ্ভুত দাড়ি। খাটো হাত-পায়ের জন্য শরীরের নাদুসনুদুস ভাবটা বেশি করে চোখে পড়ে। লোমশ একটা সিল্কের হ্যাট পরেছে সে। পোশাক-আশাকের দিকে ভালো করে নজর দিলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ বোতামের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে পাকানো সুতো, নয়তো জুতোর ফিতে। সংসারী লোক নয়, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আইপিং থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে অ্যাডারডিনের রাস্তার ধারে একটা নালার ভেতর পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে ভবঘুরে টমাস মারভেল। পায়ে শুধু মোজা—তারও জায়গায় জায়গায় কিছু নেই, খোবলানো, ছেঁড়া। পায়ের বড়ো বড়ো চওড়া আঙুলগুলো সন্ত্রস্ত কুকুরের কানের মতো খাড়া খাড়া।

পরিষ্কার ঝরঝরে দিন। আপাতত কিছুই করবার নেই মারভেলের। তার পাশে ঘাসের ওপর সযত্নে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা চারখানা বুট। অলস ভঙ্গিতে সেগুলোর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বহুদিন পরে একজোড়া মোটামুটি ভালো জুতো পাওয়া গেছে, কিন্তু খুব বেশি ঢিলে হচ্ছে পায়ে। আগের জুতোজোড়া পায়ে চমৎকার ফিট করলেও তলার দিকটা খুব হালকা বলে স্যাঁত-

সেতে আবহাওয়ায় পরা মুশকিল। ঢিলে-ঢালা জুতো দেখতে পারে না মারভেল, তেমনি আবার স্যাঁতসেতে ভেজা জুতোও তার অসহ্য। কোন্‌টা বেশি অসহ্য তা অবশ্য কখনো ভালো করে ভেবে দেখবার ফুরসৎ হয়নি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মারভেলের মনে হলো, দু'জোড়া জুতোই ভয়ানক কুৎসিত দেখতে। ধীরে ধীরে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে নিরাশ ভঙ্গিতে।

একটুও চমকালো না সে আচমকা একটা কণ্ঠস্বর শুনেঃ 'বুঝলাম, জুতো ছাড়া তো আর কিছু নয় ওগুলো।' পেছন থেকে এসেছে কণ্ঠটা।

'খররাতি জুতো,' সায় দিলো মারভেল। ঘাড় কাত করে জুতো-গুলোর দিকে বিরস মুখে তাকিয়ে থেকেই বললো, 'এর চেয়ে কুৎ-সিত জুতো দুনিয়ায় আছে কি-না ভাবছি।'

'হুম্,' উত্তর এলো।

'এর চেয়ে খারাপ জুতো পরেছি আমি—সত্যি বলতে কি, জুতো না পরেও দিন গেছে। কিন্তু এমন কুৎসিত কদাকার জুতো কখনো পরিনি। একজোড়া ভালো জুতো খুঁজছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে—ওই যে দেখছো আগের জোড়া, ওটার ওপর একেবারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। বিশ্বাস করো, সারা গ্রাম চষে ফেলে শেষ পর্যন্ত পেয়েছি এই রদ্দি মাল। হিরিটা একবার দেখো তাকিয়ে। আমারই না হয় পোড়া কপাল। তাই বলে চক্ষুলজ্জার ধারও ধারবে না লোকে!'

'বর্বর জানোয়ারের দেশ এটা,' স্বর এলো। 'লোকগুলো ইতর।'

'ঠিক বলেছো।' ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে উঠলো মারভেলের, 'হায় খোদা! একজোড়া ভালো জুতো পর্যন্ত মিলবে না?'

কথা বলছে যার সঙ্গে তার জুতোজোড়া একবার পরীক্ষা করবার

ইচ্ছে নিয়ে ডান দিক দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো মারভেল। একটু অবাক হলো সে। একজোড়া বুট যেখানে দেখবে বলে আশা করেছিল, সেখানে বুট তো নেই-ই, পা পর্যন্ত নেই। এবার বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো মারভেল। নেই। জুতোও নেই, পা-ও নেই। বিস্ময়ে দু'চোখ গোল গোল হয়ে গেল তার।

'কোথায় তুমি?' বলতে বলতে সে চার হাত-পায়ে ভর করে পুরো একপাক ঘুরে দেখলো। শূন্য পাহাড়ি ঢাল বিছিয়ে আছে চারদিকে। বহুদূরের সবুজ কাঁটাঝোপ মৃদু মৃদু দুলছে বাতাসে।

'মাতাল হয়ে গেছি নাকি?' আপন মনে বললো মারভেল, 'ভুল শুনেছি? নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলাম এতোক্ষণ? আমার—'

'ভয় পেয়ো না,' অদূরে শোনা গেল কণ্ঠ।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টমাস মারভেল। 'ভেন-ট্রিলোকুইজম খাটাতে এসো না আমার সঙ্গে! কোথায় তুমি? ভয় লাগছে কিন্তু আমার!'

'ভয় পেয়ো না,' পুনরাবৃত্তি হলো একই কথার।

'তোমাকে পাওয়াচ্ছি ভয়, গাধা কোথাকার, দাঁড়াও!' রেগে গেছে টমাস মারভেল। 'কোথায় তুমি? চেহারাটা একবার—' বলতে বলতে থেমে গেল সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শীতল গলায় প্রশ্ন করলো, 'মাটির নিচে নাকি তুমি?'

কোনো উত্তর নেই। খালি পায়ে তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো টমাস মারভেল। জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে পড়বার উপক্রম হয়েছে

'টু-উ-উ,' বহুদূর থেকে ডেকে উঠলো একটা পীউইট পাখি।

পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত দিক জনমানবহীন। অগভীর নালা আর শাদা খুঁটির সারির সঙ্গে শূন্য রাস্তাটা সোজা চলে গেছে উত্তর

থেকে দক্ষিণে। খোলা নীল আকাশে পীউইটটাকে দেখা যাচ্ছে শুধু।

'বুঝেছি,' জ্যাকেটটা টেনে-টুনে ঠিক করতে করতে বললো মারভেল, 'মদে ধরেছিল সামান্য। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

'মদে ধরেনি,' পরিষ্কার শোনা গেল কণ্ঠটা, 'মাথা ঠিক রাখো।'

অ্যাঁ। চমকে উঠলো মারভেল। রক্তশূন্য হয়ে গেল গোটা মুখ। 'মদে ধরেছে,' বিড় বিড় করে আবার বললো সে। সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কুঁকড়ে সরে এলো একদিকে। ফিসফিস করে বললো, 'কসম খেয়ে বলতে পারি, কথা বললো কে যেন!'

'ঠিক বলেছো।' এবার একেবারে কানের পাশে কথাটা শোনা গেল।

'ঐ যে, আবার,' বলে চট্ করে চোখ বুজে ফেললো মারভেল। হাত দিয়ে কপাল খামচে ধরলো। হঠাৎ কে যেন তার কলার চেপে ধরলো খপ্ করে। ঝাঁকুনি দিলো প্রচণ্ড জোরে। একেবারে বিমূঢ় হয়ে আরো কুঁকড়ে গেল মারভেল।

'গাধার মতো ক'রো না।' ধমকে উঠলো কণ্ঠস্বর।

'আমার—আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বললো মারভেল 'কী সাংঘাতিক! ঐ হতচ্ছাড়া জুতোগুলো আমার মাথার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। পাগল হয়ে গেছি আমি।' একটু থেমে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'আর তা না হলে ভূতের কাণ্ড এসব!'

'কোনোটাই ঠিক নয়,' স্বর এলো, 'শোনো!'

'নিশ্চয় আমার মাথা—'

'দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি,' কাঁপছে কণ্ঠস্বরটা ধৈর্য বজায় রাখতে গিয়ে।

আচমকা বুকে একটা আঙুলের খোঁচা অনুভব করে বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠলো মারভেল।

'মনে হচ্ছে আমি সত্যি নই? শুধুই তোমার কল্পনা

'তাছাড়া আর কী ?' ঘাড়ে হাত ঘষতে ঘষতে জবাব দিলো মারভেল।

'বেশ,' স্বস্তির সুর অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে। 'তোমার ধারণাটা না বদলানো পর্যন্ত তোমাকে তাক করে আমি একটা একটা করে পাথর ছুঁড়তে থাকবো।'

'কিন্তু তুমি আছো কোথায় ?'

কোনো উত্তর নেই। যেন বাতাস ফুঁড়ে শাঁ করে উড়ে এলো একখণ্ড চকমকি পাথর। একচুলের জন্যে লাগলো না মারভেলের কাঁধে। ঘুরে দাঁড়িয়ে মারভেল দেখতে পেলো, একটু দূরে মাটি থেকে ঝট করে শূন্যে উঠে পড়লো আরেকখণ্ড পাথর। প্রায় এক মানুষ সমান উঁচুতে উঠে স্থির হয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর বাতাসে শিস্ কেটে সোজা ছুটে এলো তার পায়ের দিকে। সরে যাবার সময় পেলো না বিমূঢ় মারভেল। পাথরের টুকরোটা তার পায়ের একটি খোলা আঙুলে লেগে সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো ডোবার ভেতরে।

এক পা চেপে ধরে আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো মারভেল। পরমুহূর্তে ঝেড়ে দৌড় দিলো। কিন্তু কয়েক পা যেতেই অদৃশ্য কোনকিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে বসে পড়লো মাটিতে।

'এখন বলো,' আবার সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, 'আমাকে সত্যি বলে মনে হচ্ছে ?' তৃতীয় আরেকখণ্ড পাথর শূন্যে উঠে স্থির হয়ে আছে মারভেলের মাথার ওপর।

উত্তর দেবার বদলে হাঁসফাঁস করে উঠে দাঁড়ালো মারভেল, এবং তৎক্ষণাৎ আবার ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। চুপচাপ পড়ে রইলো সে।

'আবার যদি বেশি তেজ দেখাও, এই পাথর ছুঁড়ে মারবো মাথায়,' বললো অদৃশ্য কণ্ঠ।

'তা তো মারবেই,' উঠে বসতে বসতে বললো মারভেল। মুখ তুলে ঝুলন্ত পাথরের ওপর চোখ রেখে পায়ের আহত আঙুলে হাত ঘষছে সে। 'বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। আপনাআপনি ছুটে আসছে পাথরের টুকরো। পাথর কথা বলছে।···ধুত্তোরি! আয় নেমে! যা গোল্লায়! আমার কম্মো শেষ।'

ঠক করে মাথায় পড়লো তিন নম্বর পাথর। ককিয়ে উঠলো মারভেল।

'ব্যাপার খুব সোজা,' বললো রহস্যময় কণ্ঠ, 'আমি অদৃশ্য।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।' ব্যথায় কাতরাচ্ছে মারভেল। 'কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছো তুমি—কিভাবে, সেটাই ঢুকছে না মাথায়। হায় খোদা!'

'কথা ওটাই। আমি অদৃশ্য। এ-কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাইছি।'

'সে কি আমি বুঝিনি? তার জন্যে অতো মেজাজ দেখাবার দরকার কী? শোনো, একটা কথা বলো তো এবার। তুমি লুকিয়ে আছো কী কায়দায়?'

'আমি অদৃশ্য, ব্যস, এ-টুকুই আসল কথা। তোমাকে যে-কথাটা বোঝাতে চাইছি আমি, তা হচ্ছে—

'কিন্তু কোন্ জায়গায় আছো তুমি?' বাধা দিয়ে বলে উঠলো মারভেল।

'এখানেই! তোমার ছ'ফুট সামনে।'

'খুব হয়েছে, রাখো! কানা নই আমি। এরপর হয়তো বলবে,

তুমি বাতাসে গড়া। মূর্খ চাষা পাওনি আমাকে—'

'হ্যাঁ, তা-ই বলবো আমি—আমি বাতাসের ভেতর মিশে আছি। তোমার দৃষ্টি আমার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে।'

'কী বললে! তার মানে তুমি রক্তমাংসের মানুষ নও? বিশ্বাস করার মতো কথা হলো এটা? ওসব আবোলতাবোল ছাড়ো—'

'সত্যিকার মানুষ আমি—রক্তমাংসে গড়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, কাপড়চোপড় দরকার হয়—কিন্তু আমি অদৃশ্য। বুঝতে পারছো? অদৃশ্য, আমাকে চোখে দেখা যায় না। খুব সহজ ব্যাপার। অদৃশ্য।'

'তার মানে বলতে চাও, জ্যান্ত আসল মানুষই তুমি?'

'হ্যাঁ, সত্যিকার মানুষ।'

'তোমার একখানা হাত দাও দেখি!' বলে নিজের বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে দিলো মারভেল। 'এমন বিদঘুটে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—' বলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো সে, 'খোদা! সাংঘাতিক চমকে দিয়েছো আমাকে অমন করে খামচে ধরে!'

নিজের বাঁ হাতের কবজিতে চেপে বসা অদৃশ্য একটা হাত ডান হাতের আঙুল দিয়ে সাবধানে নেড়ে দেখছে মারভেল। তার কাঁপা কাঁপা হাতখানা অদৃশ্য বাহু বেয়ে পৌঁছুলো একটা পেশীবহুল লোমশ বুকে। সেখান থেকে আরো ওপরে গিয়ে স্থির হলো দাড়িভর্তি একটা মুখে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে মারভেল।

'কী আশ্চর্য! এ যে ভেজবাজিকেও হার মানায়!—ঐ যে আধ মাইল দূরে খরগোশ একটা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার শরীরের ভেতর দিয়ে! তোমাকে একফোঁটা দেখা যাচ্ছে না,···শুধু—' বলতে বলতে থেমে গেল মারভেল। সামনে শূন্যের ভেতর চেয়ে তীক্ষ্ণ চোখে কী যেন পরীক্ষা করছে। 'তুমি কি রুটি আর মাখন খেয়েছো

একটু আগে ?' অদৃশ্য বাহুতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ঠিক ধরেছো। খাবারটা এখনো পুরোপুরি হজম হয়নি।'

'ইহ্,' মুখ বিকৃত করলো মারভেল। 'কেমন জানি ভূতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'তোমার কাছে যতটা আশ্চর্যের মনে হচ্ছে, তত আশ্চর্য হবার কিছু নেই আসলে।'

'এই গরীবের পক্ষে যথেষ্ট আশ্চর্যের,' বললো মারভেল। 'অদৃশ্য হলে কী করে বলো তো ? কী করে সম্ভব করলে জিনিসটা ?'

'সে অনেক লম্বা ইতিহাস। আর তাছাড়া—'

'সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার মাথার মধ্যে,' মারভেল বলে উঠলো অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাতে মাথা খামচে ধরে।

'শোনো,' হঠাৎ টান টান হয়ে গেল অদৃশ্য কণ্ঠ, 'এ-মুহূর্তে আমার একটাই কথা : আমার সাহায্যের দরকার—খুবই দরকার। এবং গতিও অবশেষে একটা হয়েছে—তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। অসহায়, উলঙ্গ অবস্থায় রাগে উন্মাদ হয়ে একা একা ঘুরছিলাম আমি। অনায়াসে খুন করে ফেলতে পারতাম যে কাউকে। এমন সময় হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেলাম—'

'খোদা !' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো মারভেল।

'—নিঃশব্দে তোমার পেছনে এসে দাঁড়ালাম। চিন্তা-ভাবনা করলাম খানিকক্ষণ। তারপর আবার পা বাড়ালাম রাস্তার দিকে—'

মারভেল কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

'—একটু এগিয়েই থেমে পড়লাম আবার। মনে মনে ভাবলাম, এ আমার মতোই সমাজবিচ্ছিন্ন এক হতভাগা। এমন লোকই আমার চাই। কথাটা ভেবে আবার ফিরে এলাম তোমার কাছে। তারপর—'

'খোদা !' মারভেল কাতরে উঠলো। 'আমার সাংঘাতিক মাথা ঘুরছে। ··একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তোমাকে ? কী ধরনের সাহায্য চাও তুমি আমার কাছ থেকে ?'

'তুমি আমাকে কাপড়চোপড় আর আশ্রয় যোগাড় করতে সাহায্য করবে। এরপর আরো কাজ আছে। আর চলছে না এভাবে। যদি তুমি সাহায্য করতে অস্বীকার করো, তবে—না, থাক্। সাহায্য তোমাকে করতেই হবে, অবশ্যই করতে হবে।'

'শোনো,' মারভেল নিস্তেজ স্বরে বলে উঠলো, 'যথেষ্ট ধকল গেছে আমার ওপর দিয়ে, আমি হয়রান হয়ে গেছি। আর আমাকে জ্বালিয়ো না। এবার ছেড়ে দাও। একটু সুস্থির হতে দাও আমাকে। ইস্, পায়ের আঙুলটা ভেঙেই দিয়েছো বোধ হয়। কী মানে হয় এসবের ? আশ্চর্য ! কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা মাঠ-প্রান্তর, শূনা আকাশ—মাইলের পর মাইল শুধু মাটি, পাথর, ঝোপঝাড়—জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। হঠাৎ গলার আওয়াজ। বাতাসের ভেতর কথা শোনা যায় ! পাথর ছিটকে আসে ! থাবা পড়ে গায়ে—খোদা !'

'শান্ত হও,' অদৃশ্য কণ্ঠ ভেসে আসে আবার, 'আমি যা বলবো, সব তোমাকে করতে হবে।'

মুখ দিয়ে ফোঁস করে শ্বাস পড়লো মারভেলের। দু'চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

'নিজে থেকে আমি বেছে নিয়েছি তোমাকে—' বললো অদৃশ্য কণ্ঠ। 'নিচের ঐ গেঁয়ো গাধাগুলোর কয়েকজন ছাড়া এখন তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে জানে, অদৃশ্য মানব বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। তুমি আমার সাহায্যকারী হবে। ঠকবে না, কথা দিচ্ছি। আমাকে সাহায্য করো—দেখবে তোমাকে আমি কী বানিয়ে দিই !

অদৃশ্য মানবের ক্ষমতা অসীম।' আচমকা থেমে গেল কণ্ঠটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাঁচির শব্দ হলো।

'কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো,' কঠিন শোনালো এবার গলাটা, 'আমি যা বলি তা যদি করতে ব্যর্থ হও—'

কাঁধের ওপর ঝট্ করে একটা অদৃশ্য হাত এসে পড়তেই সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মারভেল। 'বিশ্বাসঘাতকতা করবো না আমি,' অদৃশ্য হাতের কাছ থেকে পিছিয়ে সরে গেল সে, 'অমন কথা কক্ষনো ভেবো না। বিশ্বাস করো, তোমাকে সাহায্য করতেই চাই আমি —শুধু বলে দাও কী করতে হবে। যা করতে বলবে, তা-ই করবো

দশ

ত্রাসের প্রথম তোড় স্তিমিত হয়ে আসতেই তুমুল তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো আইপিং গ্রাম। মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ভয়-মিশ্রিত সন্দেহ আর অবিশ্বাস। অদৃশ্য একজন মানুষের অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিশ্বাস না করাটাই লোকের পক্ষে সহজ। আর যারা সত্যি সত্যি তাকে দেখেছে বাতাসে মিলিয়ে যেতে, কিংবা হাতাহাতি করেছে তার সঙ্গে, তাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোণা যায়। এসব প্রত্যক্ষ-দর্শীর মধ্যে আবার ওয়েজার্সের দর্শন মিলছে না, বাড়িতে নিজের ঘরের দরজা-জানালা আটকে দুর্ভেদ্য বন্দীশালা বানিয়ে তার ভেতর আশ্রয় নিয়েছে সে। ওদিকে জেফার্স মরার মতো পড়ে রয়েছে সরাই-খানার পারলারে। কথা বলার শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে দু'জনেরই।

গোটা আইপিং গ্রাম উৎসবের সাজে সেজে আছে। সবার পরনে রঙ-বেরঙের পোশাক। গেল এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সবাই অপেক্ষা করছে হুইট-মানডের এই উৎসবের জন্যে। অথচ আজই ঘটে গেল গা ছমছম করা দুর্বোধ্য এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। কেউই ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না মনে মনে। উৎসবের আনন্দে নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে দিতে পারছে না।

বিকেল নাগাদ অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। এমনকি

অদৃশ্য মানবের অস্তিত্বের ব্যাপারে মোটামুটি নিঃসন্দেহ যারা তারাও যেন দ্বিধার ভাবটা আপাতত সরিয়ে রেখে ছোটখাটো আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেষ্টা করছে। ভাবখানা এরকম, এতক্ষণে সে নিশ্চয় আর গ্রামে নেই। সন্দেহবাদীদের কাছে তো ব্যাপারটা উপহাসের খোরাকে পরিণত হয়েছে। তবে কিনা, বিশ্বাস অবিশ্বাস যে যা-ই করুক, সারা দিন ধরে অভূতপূর্ব একটা মাখামাখির ভাব দেখা যাচ্ছে সবার মধ্যে।

হেইস ম্যানের মাঠে খাটানো হয়েছে রঙিন তাঁবু, সেখানে মিসেস বানটিং এবং আরো কয়েকজন মহিলা চা তৈরিতে ব্যস্ত। সানডে-স্কুল থেকে অব্যাহতি পেয়ে ছেলেমেয়েরা মেতে উঠেছে হৈ চৈ আর নানারকম খেলাধুলোয়। সমগ্র পরিবেশে চাপা একটা মৃদু অস্বস্তির ভাব বিরাজ করছে ঠিকই, কিন্তু সংশয়-সন্দেহ যে যা-ই বোধ করুক, সেটা চেপে রাখবার মতো সুবিবেচনার পরিচয় দিচ্ছে প্রায় সবাই।

একটা খেলা তুমুল সাড়া জাগিয়েছে কিশোরদের মধ্যে। গ্রামের সবুজ মাঠের ভেতর আড়াআড়িভাবে লম্বা একটা মোটা দড়ি টাঙানো হয়েছে। দড়ির একমাথা অন্য মাথার চেয়ে বেশ একটু উঁচুতে বেঁধে সেখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে একখানা লম্বা মই। দড়ির ভেতর দিয়ে পরানো রয়েছে হাতলওয়ালা একটা কপিকল। মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে ডানপিটে ছেলের দল, ঝুলে পড়ছে হাতল ধরে। অমনি সড়-সড় করে সবেগে নেমে যাচ্ছে দড়ির নিচু প্রান্তের দিকে, আছড়ে পড়ছে নরম একটা বস্তার গায়ে। এছাড়াও রয়েছে ছোটবড় দোলনা, কোকোনাট শাই, ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা। দোলনার সঙ্গে জুড়ে দেয়া স্টীম অরগ্যান ঝাঁঝালো তেলের গন্ধে এবং সমান ঝাঁঝালো বাজনায় বাতাস ভারি করে তুলেছে। ক্লাবের সদস্যরা সকালে গির্জায় গিয়ে-

ছিল। গোলাপি এবং সবুজ রঙের চমৎকার ব্যাজ ধারণ করে আছে তারা। একটু বেশি আমুদে ধরনের যারা, তারা আবার উজ্জ্বল রিবন দিয়ে সাজিয়েছে তাদের বোলার হ্যাট।

এসব আমোদ-উল্লাসের ব্যাপারে বুড়ো ফ্লেচারের দৃষ্টিভঙ্গি বড্ড কঠোর। বাইরের হৈ-হুল্লোড়ে যোগ না দিয়ে সে বরাবরের মতোই ঘরের ভেতর নিজের কাজে ব্যস্ত। খোলা দরজা দিয়ে কিংবা একটু ঘুরলে জেসমিন-ঝোপে আচ্ছন্ন জানালার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় বুড়োকে। দু'টো চেয়ারের ওপর একখানা তক্তা বসিয়ে তার ওপর সাবধানে দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনের দিকের ঘরের সিলিংয়ে চুন-কাম করছে সে।

প্রায় চারটে বাজে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দু'একপলকের জন্যে বাইরে দৃষ্টি ফেলছে ফ্লেচার। হাতের ব্রাশটা বালতিতে চুবিয়ে মাত্র তুলে নিয়েছে, এমন সময় তার দৃষ্টি আটকে গেল একজন অচেনা লোকের ওপর। পাহাড়ের দিকের রাস্তা ধরে গ্রামে ঢুকেছে লোকটা। বেঁটেখাটো, নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় অসম্ভব চেঁড়া-খোড়া একটা টপ হ্যাট। মনে হচ্ছে লোকটা সাংঘাতিকরকম হাঁপিয়ে উঠেছে। গালদু'টো একবার ফুলে পড়ছে শিথিলভাবে, পরমুহূর্তে আবার ফুলে উঠছে বাতাসে ভর্তি হয়ে। দাগভর্তি মুখে অস্বস্তি আর উদ্বেগ। যেন খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। গির্জার কোণে এসে বাঁক নিয়ে সে কোচ অ্যাণ্ড হর্সেস সরাইখানার দিকে এগোলো। বুড়ো ফ্লেচার লোকটার অদ্ভুত হাব-ভাব দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তার হাতে ধরা ব্রাশ স্থির হয়ে আছে শূন্যে। হঠাৎ সড়াৎ করে একগাদা চুন ব্রাশের হাতল বেয়ে নেমে এসে সোজা ঢুকে পড়লো তার কোটের হাতার মধ্যে।

দূর থেকে আরেকজনের নজর পড়েছে অচেনা লোকটার ওপর। টোব্যাকো উইন্‌ডোর ক্যানিস্টারগুলোর ওপর দিয়ে হাক্সটার তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। লোকটার অদ্ভুত ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছে সে হাঁ করে। হাক্সটারের মনে হলো, আপনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে লোকটা। সরাইখানার সিঁড়ির গোড়ায় এসে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে হচ্ছে, ভেতরে ঢোকা উচিত হবে কি হবে না সে-বিষয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব চলছে তার মনে। শেষ পর্যন্ত পা বাড়ালো সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা দিয়ে পার-লারের দরজা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে এবং বারের ভেতর থেকে একযোগে অনেকগুলো কণ্ঠ আপত্তি জানালো। 'ওটা প্রাইভেট রুম হল্‌-এর কণ্ঠ শোনা গেল। কী যেন বললো লোকটা। পিছিয়ে এসে দরজাটা টেনে দিয়ে বারে গিয়ে ঢুকলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার উদয় হলো সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পরিতৃপ্ত মুখে বেরুলো বার থেকে। হাক্সটারের কেন যেন মনে হলো, জোর করে মুখে নিরুদ্বেগ প্রশান্তির ভাব ফোটাতে চাইছে লোকটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিলো। তারপর চোরের মত চুপি চুপি আঙিনার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের ঠিক ওপরেই পার-লারের জানালা। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে লোকটা গেটের একপাশের খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। পকেট থেকে খাটো একটা মাটির পাইপ বের করে তার ভেতর তামাক পুরতে শুরু করলো। দূর থেকেও হাক্সটার স্পষ্ট বুঝতে পারলো, লোকটার হাতদু'টো কাঁপছে। কোনোরকমে পাইপ ধরিয়ে দু'হাত ভাঁজ করে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো সে। কিন্তু তাতে তার উত্তেজনা ঢাকা পড়ছে

না। বার বার দ্রুত দৃষ্টি ফেলছে আঙিনার ভেতর।

আচমকা সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা। তামাক ঝেড়ে পাইপটা দ্রুত পুরে ফেললো পকেটে। পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল আঙিনার ভেতর। ছিঁচকে চোর ব্যাটা—বুঝে ফেলেছে হাক্সটার। এক লাফে কাউন্টার ঘুরে দৌড়ে রাস্তায় নেমে পড়লো সে চোর ধরবার জন্যে।

ততক্ষণে আবার বেরিয়ে এসেছে মারভেল। কাত হয়ে পড়েছে তার মাথার হ্যাট। একহাতে নীল টেবিলক্লথে বাঁধা বড়ো একটা পুঁটুলি, আরেক হাতে তিনখানা খাতা—একসঙ্গে বাঁধা। একেবারে হাক্সটারের মুখোমুখি পড়ে গেল সে। আঁতকে উঠে ঝট্ করে বাঁয়ে মোড় নিয়ে দৌড় দিলো প্রাণপণে।

'চোর, চোর! ধরো!!' চেঁচিয়ে উঠলো হাক্সটার। দৌড়ুলো মারভেলের পিছু পিছু। বেশি কিছু দেখবার অবসর পেলো না সে। সামনে তীরবেগে ছুটছে পলায়মান লোকটা। গির্জার কোণ ঘুরে পাহাড়ের পথ ধরে ফেলেছে। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্য দূরের উৎসবমুখর মাঠ দেখতে পেলো হাক্সটার। দু'একজন লোক ফিরে তাকিয়েছে এদিকে। 'ধরো, ধরো!' আবার চিৎকার করে উঠলো সে।

দশ পা-ও এগোয়নি হাক্সটার, হঠাৎ প্রবল একটা ঘা এসে পড়লো তার হাঁটুর ঠিক নিচে। অকস্মাৎ বাধা পেয়ে অসম্ভব দ্রুতবেগে শূন্যের ভেতর দিয়ে ছিটকে উড়ে গেল তার গোটা শরীরটা। পরমুহূর্তে চোখের সামনে লাফ দিয়ে উঠে এলো পায়ের নিচের মাটি, প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো নাকে-মুখে। সমস্ত পৃথিবী যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে শত-সহস্র ঘূর্ণমান আলোর কণার মতো ছড়িয়ে পড়লো। কী ঘটেছে তারপর, হাক্সটার জানতে পারেনি।

এগারো

মারভেলের গতিবিধি যখন প্রথম হাক্সটারের চোখে পড়ে, সে-মুহূর্তে ব্যাপক তদন্ত চলছিল পারলারের ভেতর। ভিকার বানটিংকে নিয়ে ডাক্তার কাস্ সকালের অদ্ভুত ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাবার আশায় ভালোভাবে তল্লাশী করছিল পুরো ঘর। হল্-এর অনুমতি নিয়ে সে অদৃশ্য আগন্তুকের ফেলে যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। জেফার্স কিছুটা সুস্থ হয়ে কয়েকজন বন্ধুর জিম্মায় বাড়ি চলে গেছে। আগন্তুকের ছড়ানো-ছিটানো সব কাপড়চোপড় সরিয়ে নিয়ে গেছে মিসেস হল্। ঘর আবার মোটামুটি গোছগাছ করা হয়েছে।

জানালার ধারে যে-টেবিলে আগন্তুক কাজ করতো সেখানে কাস্ প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেল তিনখানা হাতে-লেখা বড় আকারের বাঁধানো খাতা। সেগুলোর ওপর লেবেল সাঁটা রয়েছে: 'ডায়েরি।'

'ডায়েরি!' টেবিলের ওপর খাতা তিনখানা নামিয়ে রেখে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো কাস্, 'এবার কিছু না কিছু জানা যাবেই।'

ভিকার বানটিং এগিয়ে এসে টেবিলের কিনারায় হাত রেখে দাঁড়ালেন।

একখানা খাতা বাকি দু'খানার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালো কাস্। 'ডায়েরি···' পাতা উল্টে মন্তব্য করলো, 'হুম্, কোনো নাম

নেই।—সেরেছে! সাঙ্কেতিক লেখা দেখছি! আর নানারকম সংখ্যা।'

ভিকার ঘুরে এসে তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন।

নিভে গেছে ডাক্তারের উৎসাহ। নিরাশ মুখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে উঠলো, 'হায় খোদা! এ তো দেখছি সবই সাঙ্কেতিক লেখা।'

'নক্‌শা-টকশা কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করলেন বানটিং। 'কোনো ছবি-টবি নেই, যা থেকে—'

'দেখুন আপনি,' বললো কাস্‌। 'কিছু কিছু জিনিস অঙ্কের মতো লাগছে। আর, রুশ কিংবা ঐ-জাতীয় কোনো ভাষা মনে হচ্ছে এই লেখাগুলো দেখে। ফাঁকে ফাঁকে এই যে লেখাগুলো দেখছেন, এ-গুলো নিঃসন্দেহে গ্রীক।' ভিকারের দিকে চোখ তুলে তাকালো কাস্‌, 'গ্রীক লেখা আপনি নিশ্চয়—'

'নিশ্চয়,' বলে চশমা বের করে কাচ মুছতে শুরু করলেন ভিকার। হঠাৎ করেই খুব অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। গ্রীক কিছুটা একসময় শিখেছিলেন বটে, কিন্তু মাথায় তার অল্পই এখন অবশিষ্ট আছে। 'হ্যাঁ—গ্রীক লেখাগুলো থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে, অবশ্যই।'

'একটা জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'আগে বরং সবগুলো খাতা একটু উল্টে দেখি,' বানটিং বলে উঠলেন। এখনও চশমার কাচ মুছে চলেছেন তিনি। 'একটা মোটা-মুটি ধারণা নিয়ে নিই আগে, কাস্‌, তারপর দেখা যাবে কোনো সূত্র উদ্ধার করা যায় কি-না।'

একটু কেশে চশমা পরলেন ভিকার, টেনে-টুনে ঠিকমতো বসা-লেন চোখে, আবার কাশলেন। বিদ্যার দৌড় ফাঁস হয়ে যাওয়াটা

বোধ হয় আর ঠেকানো গেল না। মনে মনে ভাবছেন, এই মুহূর্তে যদি এমন একটা কিছু ঘটে যেতো যাতে আর তাঁকে পড়তে না হতো লেখাটা! প্রবল অনিচ্ছা চেপে রেখে ধীরেসুস্থে হাত বাড়িয়ে কাস্-এর কাছ থেকে ডায়েরিটা নিলেন তিনি।

হঠাৎ শব্দ করে খুলে গেল পারলারের দরজা।

দু'জনকেই ভয়ানক চমকে দিয়েছে শব্দটা। একসঙ্গে দু'জনের দৃষ্টি ঘুরে গেল দরজার দিকে। জায়গায় জায়গায় গোলাপি ছোপঅলা একটা মুখ চেয়ে আছে লোমশ একটা সিল্কের হ্যাটের নিচ থেকে।

'ট্যাপ-রুম এটা?' বলে জিজ্ঞাসু চোখে লোকটা দাঁড়িয়ে রইলো। এক পা সামনে বাড়ানো তার।

'না,' একযোগে উত্তর বেরোলো কাস্ ও বানটিংয়ের মুখ থেকে।

'ওপাশে, বাপু,' হাত নেড়ে বানটিং বললেন।

'দরজাটা বন্ধ করে যাও,' কাস্ বললো বিরক্ত কণ্ঠে।

'ঠিক আছে,' নিচু গলায় বললো দরজায় দাঁড়ানো লোকটা। একটু আগের ফ্যাসফেসে শুকনো গলার চেয়ে আশ্চর্যরকম ভিন্ন মনে হলো তার এবারের গলার স্বর। 'বেশ,' আবার আগের গলায় বললো লোকটা, 'সরে দাঁড়াও!' দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'খুব সম্ভব নাবিক হবে লোকটা,' বানটিং বললেন। 'অদ্ভুত মজার লোক হয় এরা। "সরে দাঁড়াও!"—শুনেছো কথাটা? নাবিকদের কথার একটা বিশেষ ধরন ওটা, আমার মনে হয়। ঐ যে বেরিয়ে গেল না নিজে, সে-কথাটাই ওভাবে বোঝালো আর কি।'

'তা-ই হবে হয়তো,' বললো কাস্। 'বড্ড নার্ভাস হয়ে আছি আজ। প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম দরজাটা অমন করে খুলে যেতে।'

মিটিমিটি হাসলেন বানটিং। ভাবখানা এরকম: তিনি মোটেও

ভয় পাননি। 'এবার তাহলে—' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তিনি, 'খাতাগুলো দেখা যাক।'

'এক মিনিট,' বললো কাস্। উঠে গিয়ে দরজা লক্ করে দিলো সে। ফিরে এসে বসতে বসতে বললো, 'এখন আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।'

খুক করে কেশে উঠলো কে যেন।

'সন্দেহ নেই,' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কাস্-এর পাশে বসতে বসতে বললেন বানটিং, 'গেল কয়েকদিন ধরে আইপিংয়ে বড়ো অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে—বড়ো অদ্ভুত! অবশ্য আমি ওই আজগুবি অদৃশ্য মানুষের গপ্পো বিশ্বাস করি না মোটেই—'

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য,' বললো কাস্, 'ঠিক—অবিশ্বাস্য। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি দেখেছি—পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি আমি, লোকটার হাতার ভেতরটায় কিছু ছিল না—'

'কিন্তু তা হলেও তো আর হলপ করে কিছু বলা যায় না। কত কী হতে পারে। যেমন আয়নার কোনো কারসাজি হতে পারে জিনিসটা। চোখে ধাঁধা লাগানোও খুব কঠিন কিছু নয়। ভালো যাদুকর হলে—'

'আবার আমি তর্কে নামতে চাই না,' বললো কাস্। 'আপদটাকে দূর করে দেয়া হয়েছে, বইগুলো হাতে পেয়েছি এখন আমরা—ব্যাস্, আর কথা নেই।—এই যে! এগুলো বোধ হয় গ্রীক লেখা। অক্ষরগুলো গ্রীক, সন্দেহ নেই।' একটা পৃষ্ঠার মাঝামাঝি জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো সে।

বানটিংয়ের চেহারা লাল হয়ে উঠলো একটুখানি। মুখখানা নামিয়ে আনলেন তিনি বইয়ের আরো কাছে, যেন চশমাটা ঠিকমতো

কাজ করছে না। ভুরুদু'টো কুঁচকে উঠলো।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ভিকারের। মাথা তুলতে গিয়ে দেখলেন, তুলতে পারছেন না কিছুতেই। মনে হচ্ছে, বিশাল একটা শক্তিশালী থাবা চেপে বসেছে তাঁর ঘাড়ে। চিবুক প্রায় লেগে গেছে টেবিলের সঙ্গে।

'নড়াচড়ার চেষ্টা ক'রো না,' ফিসফিস করে বলে উঠলো কে যেন, 'নয়তো মাথা গুঁড়িয়ে দেবো দু'জনেরই।'

চোখ বুজে ফেলেছিলেন বানটিং। চোখ খুলতেই তাঁর একেবারে নাকের ডগায় কাস্-এর মুখ দেখতে পেলেন। তারও থুতনি টেবিল ছুঁই ছুঁই করছে। ভয়ার্ত, হতভম্ব দৃষ্টি মেলে সে-ও চেয়ে আছে বানটিংয়ের দিকেই।

'তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, কিন্তু এ-ছাড়া উপায় নেই।—অন্য লোকের ব্যক্তিগত ডায়েরি ঘাঁটতে শিখেছো কবে থেকে?' অদৃশ্য কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের থুতনি একযোগে ঠুকে গেল টেবিলের সঙ্গে, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক শব্দ হলো।

'সুযোগ পেয়ে এক দুর্ভাগার ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্রে হাত দিতে লজ্জা করেনি?' আবার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকির শব্দ হলো।

'আমার কাপড়চোপড় কোথায় রেখেছে ওরা?' হিস্‌হিসিয়ে উঠলো অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। 'শোনো। জানালা বন্ধ, দেখতেই পাচ্ছো। দরজার গা থেকে চাবিটাও আমি খুলে নিয়েছি। যথেষ্ট শক্তি আছে আমার শরীরে, লোহার শিকটাও তৈরি আছে হাতের কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি অদৃশ্য। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, আমি চাইলে তোমাদের দু'জনকে খুন করে দিব্যি পালিয়ে যেতে পারি।—বুঝতে

পারছো ব্যাপারটা ? বেশ। এখন তাহলে বলো, যদি তোমাদের ছেড়ে দিই তাহলে কোনোরকম গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করবে না, আর আমি যা বলি তা-ই করবে ?'

দৃষ্টি বিনিময় হলো ভিকার এবং ডাক্তারের মধ্যে। ব্যথায় মুখ বিকৃত করলো ডাক্তার।

'ঠিক আছে,' বললেন মিঃ বানটিং। ডাক্তারও সায় দিলো একই সঙ্গে। দু'জনের ঘাড়ের ওপর থেকে সরে গেল চাপ। চট করে সোজা হয়ে বসলো ডাক্তার। ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভিকারও উঠে বসলেন। ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে দু'জনের মুখ।

'যেমন আছো ওভাবেই বসে থাকো,' অদৃশ্য কণ্ঠের শাসানি শোনা গেল, 'এই যে লোহার শিকখানা, দেখতে পাচ্ছো তো ?' বন্দী দু'জনের নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে এলো ফায়ারপ্লেসের পোকার। 'এ ঘরে যখন ঢুকি আমি তখন ভাবিনি এখানে কেউ থাকবে। ভেবেছিলাম আমার কাপড়চোপড়, ডায়েরি সবই পাওয়া যাবে। কিন্তু কাপড়চোপড় দেখছি না। গেল কোথায় ? উঁহু,—ওঠার চেষ্টা করো না। নেই ওগুলো তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে, দিনের বেলায় এখন তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না, কাপড় ছাড়াই অদৃশ্য শরীর নিয়ে চলাফেরা করা যায়। কিন্তু রাতে সাংঘাতিক শীত পড়ে। কাপড় চাই আমার— অন্যান্য সব জিনিসও চাই। সেইসঙ্গে অবশ্যই চাই ঐ ডায়েরি তিনখানা।'

বারো

মারভেল তখন পাইপ টানছে গেটের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। দুর থেকে তার ওপর নজর রেখেছে হাক্সটার। মারভেলের কাছ থেকে মাত্র দশ-বারো গজ দুরে বার-এ দাঁড়িয়ে হল্ এবং টেডি হেনফ্রে গভীর আলাপে মগ্ন। বলাবাহুল্য, আলোচ্য বিষয় আইপিংয়ের সাম্প্রতিক আশ্চর্য ঘটনাবলী।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো পারলারের দরজায়, —মনে হলো ভেতর থেকে দরজার ওপর আছড়ে পড়লো কিছু একটা। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার উঠেই মিলিয়ে গেল।

'কিসের শব্দ!' চমকে ফিরে তাকালো টেডি হেনফ্রে।

ট্যাপ-রুম থেকেও শোরগোল উঠলো।

সবসময় হল্-এর প্রতিক্রিয়া হয় একটু দেরিতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। 'ব্যাপার ভালো ঠেকছে না,' ব'লে বারের পেছন থেকে বেরিয়ে পারলারের দরজার দিকে পা বাড়ালো। টেডি পিছু নিলো তৎক্ষণাৎ। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো একজন আরেকজনের দিকে। উৎকণ্ঠায় ছেয়ে গেছে দু'জনের মুখ।

'গণ্ডগোল আছে কিছু একটা,' বললো হল্ নিচু স্বরে। হেনফ্রে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

রাসায়নিক কোনো পদার্থের অপ্রীতিকর একটা দমকা গন্ধ এসে

লাগলো দু'জনের নাকে। ঘরের ভেতর মৃদু অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল।

দরজায় টোকা দিলো হল্। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভেতরে কী হচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ভেতরের কথাবার্তা। এক মুহূর্তের বিরতি। আবার শোনা গেল কথার শব্দ—এবার আরো অস্পষ্ট ফিসফিসানি শুধু। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠলো, 'না, না!' ধাক্কা খেয়ে একটা চেয়ার উল্টে পড়লো মনে হলো। মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ। আবার চুপচাপ সব।

'ব্যাপার কী?' চাপা গলায় বললো হেনফ্রে।

'কী হচ্ছে—ভেতরে?' আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো হল্।

অদ্ভুত স্বরে—যেন ঝাঁকুনি খেতে খেতে উত্তর দিলেন ভিকার, 'কিক্-কিছু না। দয়া করে বি-বিরক্ত—ক'রো না।'

'আশ্চর্য!' বললো হেনফ্রে।

'আশ্চর্য!' প্রতিধ্বনি করলো হল্।

'বলছেন, "বিরক্ত ক'রো না।"'

'শুনেছি,' বললো হল্।

'নাক টানার আওয়াজ পেলাম,' হেনফ্রে বললো।

কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন। পারলারের ভেতর নিচু স্বরে দ্রুত কথাবার্তা চলছে। 'পারবো না আমি,' ভিকার বানটিং হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, 'উঁহু, আমি পারবো না!'

'কী বলছেন?' হেনফ্রে জিজ্ঞেস করলো।

'বলছেন, উনি পারবেন না,' উত্তর দিলো হল্। 'কী পারবেন না! আমাদেরকে বলছেন না নিশ্চয়?'

'অপমান করা হচ্ছে আমাদের!' ভেতরে আবার বানটিংয়ের গলা শোনা গেল।

'"অপমান করা হচ্ছে আমাদের,"—পরিষ্কার শুনেছি আমি,' হেনফ্রে বললো।

'ঐ যে আবার—ওটা কার গলা?'

'ডাক্তার কাস্, মনে হচ্ছে,' বললো হল্। 'শুনতে পাচ্ছো কিছু?'

নীরবতা। অস্পষ্ট, অপরিচিত ক্ষীণ আওয়াজ।

'টেবিলক্লথ লোফালুফির আওয়াজ মনে হচ্ছে,' হল্ বললো।

ঠিক এমন সময় মিসেস হল্ এসে দাঁড়ালো বারের পেছনে। হল্ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় চুপ থাকতে বললো তাকে। তারপর হাত নেড়ে কাছে ডাকলো।

আসা দূরের কথা, রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে উঠলো মিসেস হল্। 'ওখানে দাঁড়িয়ে কী শোনা হচ্ছে?' তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে চেঁচিয়ে বললো সে, 'কাজকর্ম আর কিছু কি পাওনি খুঁজে?'

নানারকম মুখভঙ্গি সহকারে মূকাভিনয় করে সব কথা বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে হল্, কিন্তু বউকে টলানো তার কর্ম নয়। আরো গলা চড়লো মহিলার। বাধ্য হয়ে হল্ এবং হেনফ্রে সব কথা মুখোমুখি ব্যাখ্যা করবার জন্যে পা টিপে টিপে ফেরত এলো বারে।

হল্‌কে নিরস্ত করে হেনফ্রের মুখে ঘটনাটা শুনলো মিসেস হল্। 'ও কিছু নয়,' ব'লে পুরো ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ অর্থহীন বলে ঘোষণা করলো সে। তার মতে, হয়তো আসবাবপত্র এদিক-ওদিক সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে পুরো ঘর।

'কিন্তু আমি শুনলাম, ভিকার বলছেন তাঁদের নাকি অপমান করা হচ্ছে,' বললো হল্, 'স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি আমি কথাটা।'

'আমিও শুনেছি,' বললো হেনফ্রে।

আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল মিসেস হল্। হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে হেনফ্রে বলে উঠলো চাপা গলায়, 'চুপ! জানালা খোলার শব্দ হলো না?'

'কোন্ জানালা?' জানতে চাইলো মিসেস হল্।

'পারলারের জানালা,' বললো হেনফ্রে।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। মিসেস হল্ দাঁড়িয়ে আছে সরাই-খানার দরজার দিকে মুখ করে। খোলা দরজা দিয়ে তার দৃষ্টি আপনা-আপনি গিয়ে পড়েছে জুন মাসের রোদে ধাঁধানো রাস্তায়। হঠাৎ দেখলো সে, রাস্তার পাশে হাক্সটারের দোকানের সামনের দরজা খুলে গেল এক ঝটকায়। এক লাফে রাস্তায় বেরিয়ে এলো হাক্সটার। চোখদু'টো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে তার। প্রবল বেগে হাত-পা নাড়ছে।

'চোর, চোর! ধরো!!' চিৎকার করতে করতে হাক্সটার রাস্তা ধরে কোণাকুণি দৌড়ে এলো আঙিনার গেট লক্ষ্য করে। আড়াল হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

ঠিক তখুনি একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল পারলারের ভেতর। জানালা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে হল্, হেনফ্রে এবং ট্যাপ-রুমের সমস্ত লোক পড়ি কি মরি ছুট দিলো রাস্তার দিকে। সবাই দেখতে পেলো একজন লোক বিদ্যুতের বেগে গির্জার কোণ ঘুরে ছুটে পালাচ্ছে পাহাড়ের রাস্তা লক্ষ্য করে। তার পিছু নিয়েছে হাক্সটার।

হঠাৎ আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটলো। ছুটন্ত অবস্থায় অদ্ভুত এক জটিল লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়লো হাক্সটার। সোজা উড়ে গিয়ে

অনেক দূরে ধড়াস করে মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। কারণ কিছুই বোঝা গেল না। রাস্তার লোকজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

হাক্সটার মরার মতো পড়ে আছে। হেনফ্রে থেমে দাঁড়ালো তার পাশে।

ওদিকে হল্ এবং দু'জন শ্রমিক চিৎকার করতে করতে দৌড়ুচ্ছে গির্জার দিকে। তাদের চোখের সামনে গির্জার কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মারভেল। এরই মধ্যে ধরে নিয়েছে তারা, অদৃশ্য মানব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। পালাচ্ছে। না থেমে ঝড়ের বেগে ছুটে চললো তারা রাস্তা বরাবর।

দশ-বারো গজ না পেরোতেই তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার দিয়ে হল্ ছিটকে পড়লো একপাশে। একজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে হুড়মুড় করে রাস্তার পাশে ধরাশায়ী হলো সে—যেন অদৃশ্য ফুটবলের অধিকার নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিয়ে বসেছে।

দু'নম্বর শ্রমিক বাঁক ঘুরে দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। হয়তো পা হড়কে নিজে থেকেই হোঁচট খেয়েছে হল্, এই ভেবে আবার পা বাড়ালো সে। সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হলো সে-ও। ইতিমধ্যে কাত-রাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রথম শ্রমিক। কিন্তু সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই কোমর বরাবর অদৃশ্য পায়ের ভয়ঙ্কর এক লাথি খেয়ে আবার কুপোকাত হলো সে।

মেলার লোকজন ততক্ষণে বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে। সবার আগে আসছে নীল জার্সি পরা গাট্টাগোট্টা একজন—কোকোনাট শাই-এর প্রোপ্রাইটর। ফাঁকা রাস্তায় তিনজন লোককে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। গতি কমে এসেছিল, পাশ কাটিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে ছুটলো। মাত্র দু'এক গজ গিয়েছে,

তারপরই তার সামনে বাড়ানো পায়ে কী যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ে একদিকে গড়িয়ে গেল বিশাল ধড়খানা। মুহূর্ত পরে তার ব্যবসার অংশীদার ভাইটিও তার পাশে ভূপাতিত হলো একই কায়দায়। পেছনে যারা দল বেঁধে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিল, থামবার কোনো অবকাশই পেলো না তারা। হুড়মুড় করে গোটা দলটাই ধ'সে পড়লো ধরাশায়ী দু'ভাইয়ের ওপর।

হল্‌ হেনফ্রে এবং ট্যাপ-রুমের সমস্ত লোকজন সরাইখানা ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে মিসেস হল্‌। বার ছেড়ে সে নড়েনি।

পারলারের দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে এলো ডাক্তার কাস্‌। পরনে পোশাক বলতে প্রায় কিছুই নেই তার। প্যাঁচ দিয়ে পরা একখণ্ড শাদা কাপড় শুধু কোনরকমে ঝুলছে কোমরে। কোনো-দিকে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে ছুটে গেল সে রাস্তার দিকে।

'ধরো ওকে, ধরো!' চেঁচাচ্ছে কাস্‌, 'বোঁচকাটা হাত থেকে ফেলতে দিও না। ফেললেই আর খুঁজে পাবে না ওকে।' মারভেলের কথা কিছুই জানে না কাস্‌। জানালা গ'লে আঙিনায় নেমে অদৃশ্য আগন্তুক যে মারভেলের হাতে গছিয়ে দিয়েছে ডায়েরি আর বোচকা, সে-কথা তার জানা নেই।

'ধরো ওকে!' আবার গর্জে উঠলো কাস্‌, 'আমার ট্রাউজার খুলে নিয়েছে ব্যাটা! ভিকারের কিছুই রাখেনি!' রাগে দুঃখে তেতে উঠেছে তার মুখ।

চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা হাক্সটারকে দেখে ডাক্তারের চোখ

ছানাবড়া হয়ে উঠলো। 'শিগগির তোলো ওকে!' ছুটতে ছুটতেই হেনফ্রের উদ্দেশে বললো সে।

বাঁক ঘুরে জটলার কাছে আসতেই প্রবল এক ধাক্কা খেয়ে কাস্‌ লাফিয়ে উঠলো শূন্যে। কে দিল ধাক্কাটা, দেখতে পেল না। বেকায়দা ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। পরমুহূর্তে ছুটন্ত এক লোক মারাত্মকভাবে মাড়িয়ে দিয়ে গেল তার হাতের আঙুল। আর্তনাদ করে উঠলো কাস্‌। কষ্টেসৃষ্টে খাড়া হলো দু'পায়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার এক ঘা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো।

হঠাৎ বুঝতে পারলো কাস্‌, লোকজন এখন আর শিকারের পিছনে ছুটছে না। রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাই ছুটছে গ্রামের দিকে। আবার উঠে দাঁড়ালো সে। এবার দমাদম বেশ কয়েকটা ঘুসি পড়লো তার কানের পেছনে। টলতে টলতে ফের সরাইখানার দিকে ছুটলো সে।

হাস্সটার উঠে বসেছে। চোখের ঝাপসা ভাব দূর করবার চেষ্টা করছে মাথা ঝাঁকিয়ে। লম্বা এক লাফ দিয়ে তাকে ডিঙিয়ে গেল কাস্‌।

সরাইখানার সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠেছে, এমন সময় লোকজনের চেঁচামেচি ছাপিয়ে পেছনে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলো সে। এলোপাতাড়ি ঘুসির শব্দ আর আর্তচিৎকারও কানে এলো। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল সে পারলারের দরজায়।

'আসছে, আবার আসছে!' ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে বলে উঠলো কাস্‌। 'জলদি পালান, ভিকার! পাগল হয়ে গেছে ও।'

'কে?' চমকে উঠে বললেন ভিকার। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একখানা 'ওয়েস্ট সারি গেজেট' আর হার্থ-রাগ দিয়ে লজ্জা নিবারণের

চেষ্টা করছিলেন তিনি। আরেকটু হলেই হাত ফসকে খসে পড়ছিল তাঁর আজব পরিচ্ছদ।

'অদৃশ্য মানব!' বলতে বলতে কাস্ ছুটে গেল জানালার কাছে। 'চলুন বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে, জলদি। এক্ষুণি এসে পড়বে! পাগলের মতো মেরে চলেছে ও সবাইকে! উন্মাদ হয়ে গেছে!'

জানালা দিয়ে লাফ দিলো কাস্। এক ছুটে আঙিনায় পৌঁছে গেল।

'হা, ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠলেন ভিকার। প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করছেন তিনি। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। সামনে দু'টিমাত্র বিকল্প আছে এখন। দুটোই কঠিন।

সরাইখানার প্যাসেজের ভেতর দিয়ে ধস্তাধস্তির শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বানটিং। জানালা গ'লে চোখের পলকে হুড়কে নেমে পড়লেন নিচে। মাটিতে পড়ে দ্রুতহাতে টেনে-টুনে ঠিক করে নিলেন তাঁর অভিনব পোশাক। তারপর নাদুসনুদুস খাটো খাটো পায়ে যতো দ্রুত সম্ভব ছুটতে শুরু করলেন গ্রামের ভেতর দিয়ে।

এরপর একের পর এক যা ঘটলো আইপিংয়ে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। সম্ভবত অদৃশ্য মানবের আসল ইচ্ছে ছিল মারভেলকে কাপড়চোপড় এবং ডায়েরিসহ ধরাছোঁয়ার বাইরে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু কোনো কারণে তার মেজাজ ভয়ানক বিগড়ে যায়। এমনিতেই যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল সে, তার ওপর খুব সম্ভব কারো হাতে মারাত্মক কোনো ঘা খেয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় ধ্বংসের তাণ্ডব। সামনে যা কিছু পায় প্রচণ্ড আক্রোশে

দলে-পিষে, ভেঙে-চুরে একাকার করে দিতে থাকে সে।

দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে লোকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করতে থাকে রাস্তায়। কে কোথায় পালাবে তা-ই নিয়ে মারামারি, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ঝুপ্‌ঝাপ বন্ধ হয়ে যায় ঘরবাড়ি-দোকান-পাটের দরজা-জানালা। দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গোলযোগ।

অগণিত আতঙ্কিত মানুষের পায়ের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায় একসময়। আইপিংয়ের পতাকাশোভিত সাজানো রাস্তাঘাট জনমানবহীন হয়ে পড়ে। নারকেল, ছেঁড়া ক্যানভাসের পর্দা, খেলনা, খাবারদাবার সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে রাস্তা আর মাঠ জুড়ে। জানালার কাচের আড়ালে দু'একটি ভয়ার্ত মুখের চকিত আভাস ছাড়া কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ে না।

অদৃশ্য মানবের আক্রোশ তখনও দূর হয়নি। কোচ অ্যাণ্ড হর্সেস-এর সবগুলো জানালা এক এক করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সে। তারপর খুঁটিসুদ্ধ একটা স্ট্রীট-ল্যাম্প উপড়ে নিয়ে এসে মিসেস গ্রিব্‌ল্-এর পারলারের জানালা ভেঙে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। অ্যাডারডিনের রাস্তায় হিগিন্‌স্‌দের বাড়ির পাশে টেলিগ্রাফের তারও নিশ্চয় সে-ই কেটেছিল। এরপর মানুষের ইন্দ্রিয়ের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে হারিয়ে যায় সে। আইপিং গ্রামে আর কখনো কেউ তাকে দেখেনি, তার কণ্ঠ শোনেনি, তার উপস্থিতি অনুভব করেনি। পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে যায় অদৃশ্য মানব।

কিন্তু তবু সেদিন অন্তত দু'ঘণ্টার আগে কেউ ঘর ছেড়ে আইপিংয়ের নির্জন রাস্তায় পা ফেলতে সাহস করেনি।

তেরো

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। উৎসব-আয়োজনের বিধ্বস্ত লণ্ডভণ্ড রূপ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে যখন সন্ত্রস্ত আইপিংবাসী মাত্রবাইরে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে ঠিক সে-সময় ছেঁড়াখোড়া সিল্কের হ্যাট মাথায় গাট্টাগোট্টা বেঁটে এক লোক সন্ধ্যার আবছা আলোয় বীচবনের পাশ দিয়ে ব্র্যাম্‌ব্‌ল্‌হার্স্টের রাস্তা ধ'রে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে হেঁটে চলেছে। তার এক হাতে একসঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা তিনখানা খাতা, অন্য হাতে নীল টেবিল-ক্লথে মোড়া বড়ো একটা পুঁটুলি। লাল মুখ জুড়ে উদ্বেগ আর ক্লান্তির চিহ্ন। হঠাৎ হঠাৎ হাঁটার গতি বেড়ে যাচ্ছে লোকটার, যেন কেউ বারবার ধাক্কা দিচ্ছে পেছন থেকে। অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় বারবার কুঁকড়ে উঠছে সে।

'আবার যদি পালাতে চাও,' পাশ থেকে বলে উঠলো একটা অদৃশ্য কণ্ঠ, 'যদি আমাকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়বার চেষ্টা করো—'

'খোদা!' ককিয়ে উঠলো মারভেল। 'কাঁধ জ্বলছে আমার।'

'—কসম খেয়ে বলছি,' বললো আগের কণ্ঠ, 'তাহলে, তাহলে তোমাকে খুন করবো আমি!'

'আমি তোমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করিনি,' কেঁদে ফেলতে খুব একটা বাকি নেই মারভেলের, 'খোদার কসম, কোন্‌দিকে মোড় নিতে হবে জানা ছিল না আমার! কী করে চিনবো আমি রাস্তা? শুধু শুধু

তুমি আমাকে—'

'আমার কথা না শুনলে কপালে আরো অনেক কষ্ট আছে,' বললো অদৃশ্য কণ্ঠ।

মারভেল নীরব হয়ে গেল। নিঃশ্বাস ছাড়লো ফোঁস করে। নৈরাশ্যে ছেয়ে গেছে তার চেহারা।

'আমার খাতাগুলো নিয়ে তুমি কেটে পড়ো যদি, আমার দুর্দশার সীমা থাকবে না,' বলে উঠলো অদৃশ্য কণ্ঠ। 'কেউ জানতো না আমি অদৃশ্য, অথচ আজ···। কী করবো আমি এখন?'

'আমি এখন কী করবো?' ফিসফিসিয়ে বললো মারভেল।

চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। আবার শোনা গেল অদৃশ্য কণ্ঠ, 'চারদিকে সবাই জেনে গেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয় সবকথা ছাপা হবে। সবাই খুঁজবে আমাকে, ওৎ পেতে থাকবে—' কঠোর কিছু অভিসম্পাত বর্ষিত হলো এরপর।

মারভেল ভেঙে পড়েছে হতাশায়। চলার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে তার।

'জলদি হাঁটো!' নির্দেশ এলো। 'বইগুলো ফেলে দিও না, গর্দভ,' পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে ধমকে উঠলো কণ্ঠ।

'আসল কথা হলো,' একটু নরম শোনালো এবার অদৃশ্য কণ্ঠ, 'তোমাকে দিয়ে আমি কিছু কাজ করাতে চাই। কাজের হাতিয়ার হিসেবে তোমাকে খুব ভালো বলা চলে না, কিন্তু আর কোনো উপায়ও দেখছি না।'

'একেবারেই যা-তা হাতিয়ার আমি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মারভেল।

'ঠিকই বলেছো।'

'আমার চেয়ে বাজে হাতিয়ার তুমি খুঁজলেও পাবে না।' আবার বললো মারভেল।

কোনো উত্তর নেই। একটু চুপ করে থেকে মারভেল আবার বললো, 'শরীরে বল নেই আমার।'

এবারও কোনো উত্তর নেই। কথার পুনরাবৃত্তি করলো মারভেল, 'আমার গায়ে তেমন জোর নেই।'

'নেই নাকি?'

'আমার হার্ট খুব দুর্বল। একটা কাজ তোমার কথামতো করেছি ঠিক, কিন্তু আসলে আমাকে দিয়ে কাজটা না হবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।'

'তাই বুঝি?'

'যে-ধরনের কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করাতে চাও, তার জন্যে যথেষ্ট স্নায়ুর জোর নেই আমার—শক্তিও নেই।'

'ভেবো না। শক্তি যাতে পাও, সে-ব্যবস্থা আমি করবো।'

'আমার ওপর জোর খাটানো ঠিক হবে না। তোমার কাজ আমি ইচ্ছে করে গুলিয়ে ফেলতে চাই না, তুমি জানো। কিন্তু ভয় পেয়ে গেলে কিংবা ক্ষমতায় না কুলোলে গুলিয়ে ফেলতেও তো পারি।'

'গুলিয়ে না ফেললেই ভালো করবে,' রুক্ষ, নির্বিকার জবাব এলো।

'মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার,' বিকৃত ভাঙা গলায় বলে উঠলো মারভেল। 'মোটেও সুবিচার হচ্ছে না, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। এটুকু অধিকার আমার নিশ্চয়—'

'পা চালাও।'

ধমক খেয়ে গতি বাড়িয়ে দিলো মারভেল নীরবে হাঁটলো কিছুক্ষণ।

'কঠিন ব্যাপার,' আবার বললো বিড় বিড় করে।

কোনো ফল হচ্ছে না দেখে অন্য রাস্তা ধরলো সে এবার।

'আমার লাভ কী এতে?' যেন ভয়ানক কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে, এমন সুরে বললো কথাটা।

'আ-হ্! চুপ করো!' প্রচণ্ড ধমক দিলো অদৃশ্য কণ্ঠ। 'তোমার ওপর নজর থাকবে আমার। যা বলবো, করবে। ঠিকমতো করবে। বোকা পাঁঠা তুমি একটা, তবু তোমাকে—'

'একটু বুঝতে চেষ্টা করো, আকুতি ঝরে পড়লো মারভেলো কণ্ঠে, 'এসব কাজের যোগ্য নই আমি। আমি অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছি না, কিন্তু—'

'কথা যদি না থামাও, তোমার কজি আমি আবার মুচড়ে দেবো,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো অদৃশ্য মানব। 'চুপচাপ হাঁটো। আমাকে ভাবতে দাও।'

একটু পরেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল হলুদ আলোর দুটি আয়তক্ষেত্র। সন্ধ্যার নিবে আসা আলোয় ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো একটি গির্জার চতুষ্কোণ টাওয়ার।

'গ্রামের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সারাক্ষণ তোমার কাঁধের ওপর আমার হাত থাকবে,' স্পষ্ট গম্ভীর গলায় বললো অদৃশ্য মানব। 'সোজা হেঁটে যাবে। কোনোরকম চালাকির চেষ্টা নয়। ফল খুব খারাপ হবে তা না হলে।'

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মারভেল, 'খুব ভালো করেই জানি সে-কথা।'

জীর্ণ সিল্কের টুপি পরা বিষণ্ণ ছায়ামূর্তিটি বোঝা হাতে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো গ্রামের পথ ধরে। গির্জার আলোকিত জানালা পার হয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতর।

চৌদ্দ

সকাল দশটা। পোর্ট স্টো-র উপকণ্ঠে ছোট একটি সরাইখানার বাইরে বেঞ্চের ওপর ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বসে আছে মারভেল। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সারা গায়ে ধুলো-ময়লা। পথ-চলার সমস্ত মলিনতা যেন তাকে আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভয়ানক নার্ভাস ভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারছে না সে কিছুতেই। হাতদু'টো পকেটে ঢোকানো, ঘন ঘন স্ফীত হচ্ছে মুখ। সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা ডায়েরিগুলো পাশেই বেঞ্চের ওপর রাখা। অদৃশ্য মানবের পরিকল্পনায় একটু রদবদল হয়েছে, কাপড়ের পুঁটুলিটা পরিত্যক্ত হয়েছে এক পাইনবনের ভেতর—ব্র্যাম্‌ব্‌ল্‌হার্স্ট ছাড়িয়ে। মারভেলের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ, তবু উদ্বেগের চরমে রয়েছে সে। কাঁপা কাঁপা হাতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজের এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াচ্ছে বার বার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এমন সময় বুড়োমতো একজন নাবিক বেরিয়ে এলো সরাইখানার ভেতর থেকে। হাতে একখানা খবরের কাগজ। সোজা এসে বসে পড়লো সে মারভেলের পাশে। 'দিনটা চমৎকার আজ,' ব'লে উঠলো খুশি খুশি গলায়।

সভয়ে ফিরে তাকালো মারভেল। 'হ্যাঁ,···খুব চম—' কোনো-রকমে উচ্চারণ করলো সে।

'ঠিক যেমনটি হবার কথা বছরের এ-সময়টায়,' সায় পেয়ে আবার

বললো নাবিক।

'যা-যা বলেছেন,' মারভেল বললো।

পকেট থেকে একটা সরু কাঠি বের করলো নাবিক। দাঁতের ফাঁকে সেটা ঢোকাবার সময় তার মনোযোগ স্থির হলো মারভেলের ওপর। দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে অনেকক্ষণ ধরে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মারভেলের ধুলো-মাখা চেহারা আর পাশে রাখা খাতা-গুলো। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এদিকে আসতে আসতে ঝন্‌ঝন্ একটা শব্দ পেয়েছিল সে—পকেটের ভেতর পয়সার ঠোকাঠুকির মতো শব্দ। এখন মারভেলের এই চেহারার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছে না সে ব্যাপারটা। চকিতে আবার উদয় হলো তার মাথার ভেতর জুড়ে বসা একটা ভাবনা।

'বই ওগুলো?' শব্দ করে কাঠিটা মুখ থেকে বের করে আচমকা প্রশ্ন করলো সে।

'আঁ!' চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো মারভেল। 'হ্যাঁ,' বললো সে, 'বই।'

'অনেক আশ্চর্য কথা লেখা থাকে বইয়ে,' ধীরে ধীরে নাবিক বললো।

'ঠিকই বলেছেন,' বললো মারভেল।

'বইয়ের বাইরেও আছে অনেক আজব জিনিস।'

'তা-ও ঠিক।' মারভেল ভালো করে লক্ষ্য করলো এবার নাবিক লোকটিকে। তারপর এদিক ওদিক তাকালো।

'এই যেমন খবরের কাগজের অদ্ভুত সব খবরাখবরের কথা বলা যায়,' নাবিক বললো।

'হুঁ।'

'আমার হাতের এই কাগজখানাতেই আছে আজব খবর।'

চমকে ঘাড় ফেরালো মারভেল। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

'একটা মজার কাহিনী আছে,' মারভেলের ওপর স্থির চোখ রেখে বললো নাবিক, 'এক অদৃশ্য মানবের কাহিনী।'

ঠোঁট টেনে বাঁকা করে গাল চুলকোতে চুলকোতে মারভেল পরিষ্কার বুঝতে পারলো তার কান লাল হয়ে উঠছে। 'কতো কি যে লিখবে দিনে দিনে,' মিনমিনে গলায় বললো সে। 'কোথায়? অস্ট্রিয়ায়, নাকি আমেরিকায়?'

'অস্ট্রিয়ায়ও নয়, আমেরিকায়ও নয়,' বললো নাবিক। 'এখানে'

'খোদা!' চমকে উঠলো মারভেল।

'একেবারে এখানটায় তা বলছি না,' মারভেলকে আশ্বস্ত ক'রে বললো নাবিক, 'বলছি, কাছাকাছিই কোথাও।'

'অদৃশ্য মানব!' বললো মারভেল। 'কী করছে সে?'

'সব করছে,' চোখ দিয়ে মারভেলকে গেঁথে রেখে বললো নাবিক, 'সবকিছু।'

'আমি অবশ্য চারদিন হলো খবরের কাগজ চোখে দেখিনি,' মারভেল বললো।

'আইপিংয়ে ঘটনার শুরু, বললো নাবিক।

'তাই নাকি!' চোখ কপালে তুলে বললো মারভেল

'হ্যাঁ। কোত্থেকে এসেছিল সে, সেটা বোধহয় কারুরই জানা নেই।' হাতের কাগজখানা মেলে ধরলো নাবিক। 'এই যে লেখা রয়েছে: "আইপিংয়ের বিচিত্র ঘটনা।" কাগজে লিখেছে, ঘটনার অকাট্য প্রমাণ আছে—একেবারে পাকা-পোক্ত প্রমাণ।'

'খোদা !'

'খুবই অদ্ভুত ঘটনা। সাক্ষীদের মধ্যে আছেন একজন ধর্মযাজক এবং একজন ডাক্তার। পরিষ্কার দেখেছেন তাঁরা লোকটাকে—অবশ্য "দেখেছেন" বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। দাঁড়াও, পড়ছি আমি। এই যে : অপরিচিত আগন্তুক কোচ অ্যাণ্ড হর্সেস সরাইখানায় অবস্থান করিতেছিল। তাহার অত্যাশ্চর্য স্বরূপ সম্পর্কে কেহই অবগত ছিল না। একদিন কোনো কারণবশত সরাইখানার মালিকের সহিত তাহার বচসা হয় এবং সে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নিজের মস্তক হইতে ব্যাণ্ডেজের আবরণ টানিয়া খুলিয়া ফেলে। তখন উপস্থিত সকলে দেখিতে পায়, তাহার মস্তক সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা লওয়া হয়, কিন্তু সে দ্রুত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া পালাইয়া যাইতে সমর্থ হয়। অবশ্য তৎপূর্বে তাহার সহিত জনতার এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষে আমাদের সুযোগ্য কনস্টেবল মিঃ জে. এ. জেফার্স মারাত্মকভাবে আহত হন।' পড়া শেষ করে একটু দম নিয়ে নাবিক বললো, 'সোজা-সাপ্‌টা গল্প, কী বলো? নাম-ধাম সবই দেয়া আছে।'

'খোদা !' কাতর ধ্বনি তুলে এদিক ওদিক চাইলো মারভেল পকেটে হাত ঢুকিয়ে আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে টাকাগুলো গুণে দেখবার চেষ্টা করছে সে। 'খুব অদ্ভুত ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'অদ্ভুত না? অবিশ্বাস্য ঘটনা, আমি বলবো। অদৃশ্য মানবের গল্প আগে শুনিনি কখনো, কিন্তু আজকাল যে-সব আজব গল্প শোনা যায় তাতে—'

'আর কিছু করেনি সে?' প্রশ্ন করলো মারভেল যতদূর সম্ভব সহজ থাকবার চেষ্টা ক'রে।

'যা করেছে তা-ই কম কিসে,' নাবিক বললো।

'গ্রামে ফিরে যায়নি তো আবার, না?' মারভেল বললো। 'পালিয়ে গেল—ব্যাস, ওই পর্যন্তই?'

'ওই পর্যন্তই!' নাবিক বললো। 'কেন?—তাতে তোমার মন ভরছে না নাকি?'

'না, না, তা বলছি না,' তাড়াতাড়ি বললো মারভেল।

'আমার বিবেচনায়, যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে,' বিড়বিড় ক'রে নাবিক বললো।

'সঙ্গী-সাথী ছিল না তার কোনো?—মানে, তার কোনো সঙ্গী-সাথী ছিল এমন কিছু কাগজে লেখেনি, না?' মারভেলের গলায় উদ্বেগ।

'একজন শুনে বোধ হয় পছন্দ হচ্ছে না তোমার?' জিজ্ঞেস করলো নাবিক, 'আরো চাই? না, ঈশ্বরের অপার করুণা, সঙ্গে আর কেউ ছিল না তার।'

চিন্তামগ্নভাবে ধীরে ধীরে মাথা নোয়ালো নাবিক। 'যেখানে সেখানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা, ভাবতেই আমার অস্বস্তি লাগছে। লোকটা স্বাধীন এখন, আর যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, সে এসেছে এই পোর্ট স্টো-র পথেই! কী না করতে পারে সে? ধরো, যদি সে তোমার পিছু নেয়? কী করতে পারবে তুমি? যদি সে ডাকাতি করতে চায়—কে ঠেকাবে তাকে? যেখানে-সেখানে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে, যা ইচ্ছে চুরি করতে পারে। পুলিশের কর্ডনের ভেতর দিয়েও অনায়াসে চলে যেতে পারে সে—তুমি আমি যেমন অনায়াসে একজন অন্ধ লোককে ফাঁকি দিতে পারি। অন্ধদের তবু তো কানে শোনার ক্ষমতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বলে

শুনেছি—'

'সাংঘাতিক ক্ষমতা এখন লোকটার, সন্দেহ নেই,' বললো মারভেল।

'ঠিক বলেছো,' নাবিক বললো। 'সাংঘাতিক ক্ষমতা।'

কথাবার্তা বলতে বলতে মারভেল সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে চারদিক, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে পায়ের ক্ষীণ শব্দ, আবিষ্কার করতে চাইছে ইন্দ্রিয়ের আওতার বাইরে অদৃশ্য কোনো-কিছুর নড়াচড়ার লক্ষণ। মনে হচ্ছে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছে সে। মুখে হাত চাপা দিয়ে খুক্ করে কেশে নিলো একটুখানি।

চারপাশটা আবার দেখে নিলো সে। উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনতে চেষ্টা করলো। তারপর ঝুঁকে পড়লো নাবিকের দিকে। গলা নামিয়ে ফিসফিস্ করে বললো, 'এই অদৃশ্য মানব সম্পর্কে দু'একটা কথা জানি আমি। ব্যক্তিগত সূত্রে।'

'কী বললে!' আগ্রহে চকচক করে উঠলো নাবিকের চোখ। 'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ,' বললো মারভেল। 'আমি জানি।'

'সত্যি?' নাবিক বললো। 'তাহলে বলো দেখি—'

'শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি,' হাত দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে চাপা স্বরে বললো মারভেল। 'সাংঘাতিক কাণ্ড!'

আরো কাছে সরে এলো নাবিক।

'ঘটনা হচ্ছে,' খুব আগ্রহের সঙ্গে চাপা গলায় শুরু করলো মারভেল। তারপরই হঠাৎ আশ্চর্যরকমভাবে বদলে গেল তার মুখের চেহারা। 'উহ্!' কাতর আর্তনাদ করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো

সে। যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে মুখ। 'আহ্!'

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলো নাবিক।

'দাঁতে ব্যথা,' বলে মুখ নয়—নিজের কান চেপে ধরলো মারভেল। আরেক হাতে বইগুলো আঁকড়ে ধরে বললো, 'ওঠা উচিত আমার।' বেঞ্চের কিনারা ঘেঁষে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সরে যাচ্ছে সে নাবিকের কাছ থেকে।

'আরে! অদৃশ্য মানবের কথা কী একটা বলতে চাইলে না তুমি?' আপত্তি জানালো নাবিক।

মারভেল যেন নিজের সঙ্গেই নিচু গলায় পরামর্শ করে নিলো। 'তামাশা,' প্রথমে শোনা গেল নিচু একটা স্বর। তারপর গলা চড়িয়ে মারভেল বললো, 'ব্যাপারটা আসলে তামাশা।'

'কিন্তু কাগজে লিখেছে ঘটনাটা,' নাবিক বললো।

'ও তামাশা ছাড়া কিছু নয়,' বললো মারভেল। 'গুজবটা যে প্রথম ছড়িয়েছে তাকে চিনি আমি। অদৃশ্য মানব বলে আসলে কিছু নেই।'

'কিন্তু কাগজে কেন এসব লিখেছে তাহলে? তার মানে তুমি বলতে চাও—'

'আর কিছু বলার নেই আমার,' পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলো মারভেল।

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নাবিক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো মারভেল।

'দাঁড়াও,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ধীর গলায় বললো নাবিক। 'তার মানে তুমি বলতে চাও—'

'যা বলতে চাই বলে দিয়েছি।'

লাল হয়ে উঠলো নাবিকের চোখমুখ। 'তাহলে আমাকে দিয়ে কেন বলালে এতসব ছাইভস্ম ? একজন লোককে এভাবেবোকা বানাবার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কী, শুনতে পারি ?'

উত্তরে মুখ দিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লো মারভেল।

ধৈর্য হারিয়ে ফেললো নাবিক দু'হাতে মুঠি পাকিয়ে ফুঁসে উঠলো, 'দশ মিনিট ধরে বকর বকর করছি আমি, আর তুই—তুই ভুঁড়িঅলা চামড়ামুখো ছেঁড়া জুতোর বাচ্চা, সামান্য ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত—'

'আমার সঙ্গে লাগতে এসো না বলে দিচ্ছি,' শাসালো মারভেল

'লাগতে আসবো না ! আমি কোথায় সরল মনে—'

'চলো,' একটা কণ্ঠ শোনা গেল। অমনি মারভেল ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।

'সেই ভালো, কেটে পড়ো,' বললো নাবিক।

'কে কেটে পড়ছে ?' প্রতিবাদ করলো মারভেল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কোণাকুণি দ্রুত পা ফেলছে সে, থেকে থেকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিছুদূর গিয়ে বিড়বিড় করে একা একা কথা বলতে শুরু করলো সে বাদ-প্রতিবাদের সুরে।

'বিটকেল শয়তান !' দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে মারভেলকে লক্ষ্য করতে করতে গর্জে উঠলো নাবিক। 'মজা দেখাবো তোকে আমি, ইতর কোথাকার,—মশকরা আমার সঙ্গে ! কাগজে লিখেছে সবকথা—পরিষ্কার !'

উত্তরে মারভেল অসংলগ্ন কী একটা বললো। হাঁটতে হাঁটতে আড়াল হয়ে গেল রাস্তার বাঁক ঘুরে নাবিক তবু তেমনি বীরদর্পে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই রইলো শেষ পর্যন্ত একটা কসাইয়ের গাড়ি এসে পড়ায় বাধ্য হয়ে সরে যেতে হলো তাকে।

'আজব গাধা এক একটা,' পোর্ট স্টো-র দিকে যেতে যেতে আপনমনে বললো নাবিক, 'শুধু আমাকে বোকা বানাবার জন্যে এমন শয়তানি,—অথচ দিব্যি লিখেছে কাগজে!'

অচিরেই আরেকটি অদ্ভুত গল্প কানে এলো বুড়ো নাবিকের। কাছেই ঘটেছে ঘটনাটা। সেদিন সকালবেলা আরেকজন নাবিক আশ্চর্য একটা দৃশ্য দেখেছে। এক মুঠো টাকা আপনাআপনি ভেসে যেতে দেখেছে সে সেন্ট মাইকেল্‌স্‌ লেনের কোণের দেয়াল ঘেঁষে। ছোঁ মেরে সেই টাকা ধরতে গিয়ে সে মাথায় প্রচণ্ড ঘা খেয়ে ধরা-শায়ী হয়েছে। একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে প্রজাপতি টাকা। আশেপাশে কেউ নেই।

ঠিক এতোটা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না বুড়ো নাবিক।

কিন্তু উড়ন্ত টাকার কাহিনী আসলে মিথ্যে নয়। রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়ার কারণে সেদিন উন্মুক্ত ছিল সব ঘরবাড়ির দরজা। সেই সুযোগে কাছাকাছি সব জায়গা থেকে, দোকানপাট-সরাইখানার ক্যাশবাক্স থেকে, এমনকি বিখ্যাত লণ্ডন অ্যাণ্ড কাউন্টি ব্যাংকিং কোম্পানী থেকেও মুঠি মুঠি টাকা নিঃশব্দে নিপুণভাবে দরজা পার হয়ে সঙ্গোপনে ভেসে চলে গেছে এ-দেয়াল সে-দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ছায়া ছায়া নির্জন পথ ধরে। পথ-চলতি লোকের মুখোমুখি পড়বার সম্ভাবনা দেখলেই সে-টাকা দ্রুত সরে গেছে চোখের আড়ালে। রহস্য-ময় এই যাত্রার শেষে সব টাকা অনিবার্যভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে পোর্ট স্টো-র উপকণ্ঠে ছোট্ট সরাইখানার বাইরের বেঞ্চে ছেঁড়া সিল্কের হ্যাট পরে কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকা লোকটির পকেটে। কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি।

পনেরো

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বারডক শহরের প্রান্তে পাহাড়চূড়ার সামার-হাউসে নিজের স্টাডিতে বসে রয়েছেন ডক্টর কেম্প। ছোট্ট, ছিমছাম ঘর। কয়েকটি বুকশেলফ্ ভর্তি নানারকম বই এবং বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রপত্রিকা। একদিকে চওড়া একটি লেখার টেবিল। উত্তরের জানালার কাছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র, কিছু কাচের স্লাইড, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম উপায়ে জন্মানো কিছু জীবাণু এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ-ভর্তি ছড়ানো-ছিটানো বেশ কিছু শিশি-বোতল।

ডক্টর কেম্পের সৌরবাতি ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে, যদিও অস্ত-গামী সূর্যের আলোয় এখনও আলোকিত হয়ে আছে আকাশ। বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকির জ্বালাতন নেই বলে জানালার পর্দাগুলোও এখন পর্যন্ত তোলা রয়েছে।

লম্বা ছিপছিপে ডক্টর কেম্পের বয়স খুব বেশি নয়। ইদানীং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। আশা করছেন, কাজে সফল হলে রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ পেয়ে যাবেন।

কাজ করতে করতে একসময় চোখ তুলে বাইরে তাকালেন কেম্প। দৃষ্টি আটকে গেল দূরের পাহাড়ের শীর্ষে সূর্যাস্তের আভার ওপর। কলমের ডগা মুখে পুরে তিনি মিনিটখানেক মুগ্ধ চোখে পাহাড়চূড়ার ওপর উজ্জ্বল সোনালি আলোর কারুকাজ দেখলেন। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তাঁর দৃষ্টি। ক্ষুদে একটা সচল অবয়বের ওপর তাঁর চোখ আটকে

গেছে। আলোর পটভূমিতে কুচকুচে কালো লাগছে লোকটাকে, দৌড়ে নেমে আসছে সে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এদিকেই। বেঁটে-খাটো ছোট্ট একজন মানুষ, মাথায় উঁচু হ্যাট। এতো জোরে দৌড়ুচ্ছে সে যে, পাদু'টো প্রায় চোখেই পড়ছে না।

'আরেক গাধা,' নিজের মনে বললেন ডক্টর কেম্প। 'আজ সকালে যেমন একজন "অদৃশ্য মানব আসছে" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তার মোড়ে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। লোকজনের হয়েছেটা কী! এখনও কি সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পড়ে আছি!'

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন ডক্টর কেম্প। অন্ধকার পাহাড়ের কোল বেয়ে দৌড়ে নেমে আসছে লোকটা। 'দারুণ তাড়া মনে হচ্ছে,' বললেন কেম্প, 'কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। পকেটভর্তি সীসা নাকি?'

বারডক শহর থেকে ধাপে ধাপে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া ঘরবাড়ির ভেতর সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার আড়ালে ছুটন্ত লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে আবার দেখা গেল তাকে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার, এবং আরো একবার তাকে দেখতে পেলেন কেম্প। শেষে সারবাঁধা বাড়ি-ঘরের আড়ালে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল সে।

'গর্দভ যত্তসব!' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে লেখার টেবিলের কাছে ফিরে এলেন ডক্টর কেম্প।

কিন্তু খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছুটন্ত লোকটাকে কাছ থেকে দেখতে পেলো যারা, তারা ঠিক একমত হতে পারবে না ডক্টর কেম্পের সঙ্গে। ধুপধাপ পা ফেলে ছুটছে লোকটা, আর সেই সঙ্গে অনবরত ঝন্ ঝন্

শব্দ হচ্ছে—থলিভর্তি টাকা ঝাঁকাতে থাকলে যেমন হয়। ঘর্মাক্ত মুখে ফুটে উঠেছে দারুণ ত্রাসের ছাপ। ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকাচ্ছে না সে। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদু'টো সোজা চেয়ে আছে পাহাড়ের কোলে সামনের দিকে, যেখানে আলো জ্বলে উঠছে একটি -দু'টি ক'রে—লোকজনের ভিড় দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। বিকট ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে লোকটার মুখ, ঠোঁটের ওপর চক চক করছে ফেনা, ফোঁস ফোঁস করে দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। তাকে দেখামাত্র রাস্তার লোকজন দাঁড়িয়ে পড়ছে, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখছে পেছনে রাস্তা বরাবর। উদ্বিগ্নভাবে একজন আরেকজনের কাছে জানতে চাইছে ব্যাপার কী। নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলছে তাদের মধ্যে।

এমন সময় এগিয়ে এলো একটা স্পষ্ট আওয়াজ—ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্। রাস্তার ওপর খেলা করছিল একটি কুকুর। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ আর্তনাদ করে ছুটে পালালো পাশের গেটের নিচ দিয়ে। শব্দটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠলো, দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শোনা গেল সেইসঙ্গে বাতাসের মৃদু একটা ঝাপটা এসে লাগলো গায়ে। পরক্ষণেই শব্দটা সামনের দিকে ছুটে চলে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

হুলস্থুল পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে। চিৎকার করতে করতে ছিটকে সরে গেল সবাই পেভমেণ্ট ছেড়ে। যেন আপনাআপনি মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো খবর মারভেল এসে পৌঁছুবার আগেই শহরের রাস্তা ভরে উঠলো লোকজনের কোলাহল-আর্তনাদে। যার যার বাড়ির দিকে ছুটছে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে, ঝুপঝাপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা-জানালা।

শেষবারের মতো প্রাণপণ চেষ্টা নিলো মারভেল, ছোটার গতি

আরো বাড়িয়ে দিলো। আতঙ্ক ছুটে চললো তারও চেয়ে দ্রুত, মার-ভেলকে অতিক্রম ক'রে সে-আতঙ্ক মুহূর্তে গ্রাস ক'রে নিলো সমস্ত শহর।

'আসছে! আসছে অদৃশ্য মানব!—এসে পড়েছে!'

ষোলো

পাহাড়ের ঠিক নিচেই ট্রাম-লাইনের শুরুতে সরাইখানা 'জলি ক্রিকেটারস্'। কাউন্টারের ওপর মোটাসোটা লালচে হাত দু'টো বিছিয়ে বারম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে এক রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারার কোচোয়ানের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে আলাপ করছে। একটু দূরে ধূসর পোশাক পরা কালো দাড়িঅলা আরেকজন লোক গল্প করছে একজন অফ-ডিউটি পুলিসম্যানের সঙ্গে। লোকটার কথার সুরে আমেরিকান টান। বিস্কুট এবং পনির গপাগপ মুখে ফেলছে কালো দাড়ি, থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে বার্টনে।

'হট্টগোল কিসের?' আলোচনার প্রসঙ্গ ছেড়ে হঠাৎ বলে উঠলো রক্তশূন্য কোচোয়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে সরাইখানার নিচু জানালার নোংরা হলুদ পর্দার ওপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে সে পাহাড়ের পাদদেশ।

বাইরে ত্রস্ত পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'আগুন লেগেছে বোধ হয়,' বললো বারম্যান।

ধুপধাপ এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো মারভেল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত উসকো-খুসকো, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, মাথার হ্যাট অদৃশ্য, কোট ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে গেছে ঘাড়ের কাছটায়। ঢুকেই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো দরজা

বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। দরজাটা আধ-খোলা অবস্থায় রাখা রয়েছে ফিতে দিয়ে বেঁধে।

'আসছে!' আতঙ্কে চিরে গেছে মারভেলের গলা। 'এসে পড়েছে! অদৃশ্য মানব ধাওয়া করেছে আমাকে। দোহাই ঈশ্বরের, বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!'

'দরজা বন্ধ করে দাও,' বলতে বলতে পুলিসের লোকটা নিজেই এগিয়ে গিয়ে ফিতা খুলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। 'কে আসছে? চেঁচামেচি কিসের?'

দাড়িঅলা আমেরিকান উঠে গিয়ে অন্য দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

'ভেতরে যাবো আমি!' টলছে মারভেল, থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু বইগুলো শক্ত হাতে খামচে ধরে আছে এখনও। 'ভেতরে ঢুকিয়ে যেখানে হয় তালা দিয়ে রাখো আমাকে। ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। আমাকে খুন করবে বলেছে। ধরতে পারলে সত্যি ও খুন করে ফেলবে!'

'ভয় নেই,' বললো কালো দাড়িঅলা, 'দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্যাপার কী বলো তো?'

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঘায়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো বন্ধ দরজা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো মারভেল। বাইরে শোরগোল শোনা গেল।

'কে?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো পুলিসম্যান, 'কে ওখানে?'

পাগল হয়ে গেছে মারভেল। ভেতরে যাবার দরজা ভেবে দেয়ালের প্যানেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বার বার। 'মেরে ফেলবে আমাকে—ছুরি-টুরি কিছু নিয়ে এসেছে নিশ্চয়। খোদা!'

'এই যে, এদিক এসো,' বলে বারম্যান বারের ফ্ল্যাপ তুলে

ধরলো। ছুটে বারের পেছনে চলে গেল মারভেল।

আবার দমাদম ঘা পড়লো দরজায়।

'দরজা খুলো না,' চেঁচিয়ে উঠলো মারভেল, 'দোহাই তোমাদের, দরজা খুলো না।—কোথায় লুকোবো আমি?'

'এই—এই তাহলে অদৃশ্য মানব?' এক হাত পেছনে নিয়ে বললো কালো দাড়িঅলা। 'এবার তাহলে ওকে দেখে নিতে পারবো আমরা।'

হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ঘরের একটা জানালা। বাইরে রাস্তায় চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। পুলিসটা সেটী-র ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল দরজায় কাউকে দেখা যায় কিনা। নেমে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কপালে তুলে বললো সে, 'সে-ই।'

মারভেলকে বার পারলারের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বারম্যান। ভাঙা জানালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে স'রে এসে অন্য দু'জনের সঙ্গে যোগ দিলো।

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক।

'আমার লাঠিটা থাকতো যদি,' বললো পুলিস। ইতস্তত ভাব নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়েগেল। 'দরজা খুললেই ভেতরে ঢুকে পড়বে। থামাবার উপায় নেই।'

'দরজা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কিছু করে ব'সো না,' উদ্বিগ্ন-ভাবে বললো ফ্যাকাশে কোচোয়ান।

'ছিটকিনি খুলে দাও,' বললো দাড়িঅলা লোকটা, 'ভেতরে ঢোকে যদি—' কথা শেষ না ক'রে হাতের রিভলভারটা দেখালো সে।

'উঁহু,' আপত্তি জানালো পুলিস, 'সেটা খুনের শামিল হবে।'

'জানি,' বললো দাড়িঅলা। 'পায়ে গুলি করবো আমি। খুলে দাও ছিটকিনি।'

'আমি পারবো না,' সভয়ে বললো বারম্যান।

'বেশ,' বলে দাড়িঅলা রিভলভার বাগিয়ে ধরে ঝুঁকে পড়ে নিজেই খুলে দিলো ছিটকিনি। বারম্যান, কোচোয়ান এবং পুলিস সরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

এক পা পিছিয়ে এলো দাড়িঅলা। রিভলভার ধরা হাতটা পেছনে রেখে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললো, 'এসো এবার।'

কেউ ঢুকলো না, যেমন ছিল তেমনি ভেজানো রইলো দরজা। প্রায় পাঁচ মিনিট পর ধীরে ধীরে দরজা সামান্য ফাঁক হলো। রক্ত-মাংসের হাত দেখা গেল একখানা। দরজা ঠেলে সাবধানে গলা বাড়ালো আরেকজন কোচোয়ান। নাকের ডগায় রিভলভারের চক-চকে নল দেখে আঁতকে উঠলো সে।

বার-পারলারের ভেতর থেকে উঁকি দিলো মারভেল। 'সব দরজা বন্ধ আছে তো?' জানতে চাইলো উদ্বিগ্ন স্বরে। 'ঘোরাফেরা করছে চারদিকে—ঢোকার পথ খুঁজছে। শয়তানের মতো ধূর্ত ও।'

'হায় খোদা!' আর্তনাদ করে উঠলো বিশালবপু বারম্যান। 'পেছন দিকটার কথা মনেই ছিল না! শিগ্‌গির যাও ওদিকে! জলদি!' —চারদিকে অসহায়ভাবে তাকালো সে।

বার-পারলারের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। চাবি ঘুরিয়ে ভেতর থেকে লক করে দিলো মারভেল।

'আঙিনার দিকে দরজা আছে একটা, আরেক দিকে একটা প্রাই-ভেট ডোর আছে। আঙিনার দরজা—' বলতে বলতে নিজেই ছুটে

বেরিয়ে গেল বারম্যান।

মিনিটখানেক পরে একখানা মাংস-কাটা ছুরি হাতে ফিরে এলো সে। 'খোলা ছিল আঙিনার দরজা!' বললো হাঁপাতে হাঁপাতে। তার পুরু ঠোঁট নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

'হয়তো ভেতরে ঢুকে পড়েছে এতক্ষণে!' বললো প্রথম কোচোয়ান।

'রান্নাঘরে নেই,' বারম্যান বললো। 'ছুরি দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি খুঁচিয়ে দেখেছি আমি। রান্নাঘরের মেয়েরাও বললো তাদের মনে হয় না ভেতরে ঢুকতে পেরেছে—'

'দরজা বন্ধ করে দিয়েছো তো?' জিজ্ঞেস করলো প্রথম কোচোয়ান।

'কচি খোকা নই আমি,' বললো বারম্যান।

দাড়িঅলা আমেরিকান আবার রিভলভার হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সে-সময় বন্ধ হয়ে গেল বারের ফ্ল্যাপ, খুট্ করে লেগে গেল ছিটকিনি। আর তারপরই ভয়ঙ্কর শব্দে কিছু একটা আছড়ে পড়লো বার-পারলারের দরজার ওপর। তালা ভেঙে গিয়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ফাঁদে পড়া খরগোশের বাচ্চার মতো চিঁচিঁ করে উঠলো মারভেল। শোনামাত্র সবাই লাফিয়ে বার পার হয়ে ছুটলো তাকে উদ্ধার করতে। গুড়ুম করে গুলি বেরিয়ে গেল দাড়িঅলার রিভলভার থেকে—পারলারের পেছনের আয়না ভেঙে চুরমার হয়ে ঝন্ ঝন্ করে ঝরে পড়লো নিচে।

প্রথমে ঘরে ঢুকলো বারম্যান। দেখতে পেলো কুণ্ডলী পাকানো অদ্ভুত ভঙ্গিতে মারভেল ওপাশে কিচেনে যাবার বন্ধ দরজার কাছে আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। ইতস্তত করছে বারম্যান, এমন সময় খুলে

গেল দরজা, মারভেলের শরীরটা সড়সড় করে কিচেনের ভেতর ঢুকে পড়লো। একটা আর্তচিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বাসনপত্রের ঝনঝনানি শোনা গেল। মারভেলের মাথা এবং দু'হাত নিচের দিকে, পা দু'টো খাড়া হয়ে আছে শূন্যে। হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে পারলারের দিকে ফিরে আসতে চাইছে সে। কিন্তু অদৃশ্য দু'হাত তাকে জোর করে কিচেনের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল একেবারে ওপাশে বাইরের দরজার কাছে। খুট করে খুলে গেল ছিটকিনি।

বারম্যানের বিশাল বপুর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল পুলিসটা। একটু ফাঁক পেতেই ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লো সে। ছুটে গিয়ে মারভেলকে ধরে থাকা অদৃশ্য একটা হাতের কব্জি ধরে ফেললো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর ঘা খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল একপাশে। খুলে গেল পেছনের দরজা। পাগলের মতো একটা কিছু অবলম্বন খুঁজছে মারভেল কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না হাতে।

পুলিসের ঠিক পেছন পেছন ভেতরে ঢুকেছে প্রথম কোচোয়ান। সে এবার কী একটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো, ধরেছি!'

বারম্যানের বিশাল লাল হাতদু'টো বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল সেদিকে। 'পেয়েছি! এই যে!'

বোঁটা-খসা ফলের মতো ঝুপ করে মাটিতে আছড়ে পড়লো মারভেল। হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি যুদ্ধরত লোকগুলোর পায়ের কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করলো।

দরজার সামনে অন্ধের মতো লড়ছে সবাই। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। অদৃশ্য শত্রুর পা মাড়িয়ে দিয়েছে পুলিসটা। এই প্রথমবারের মতো শোনা গেল অদৃশ্য মানবের কণ্ঠ। প্রচণ্ড রোষে গর্জন করতে করতে অবিরাম ঘুসি ছুঁড়তে লাগলো সে চারপাশে।

হঠাৎ কোচোয়ান 'হিঁক্' করে আওয়াজ তুলে পেট চেপে ধরে দু'ভাঁজ হয়ে গেল। কিচেন এবং বার পারলারের মধ্যের দরজা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। তার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বার পেরিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে মারভেল।

হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো সবাই, বাতাসের সঙ্গে লড়ছে তারা। পালিয়ে গেছে অদৃশ্য মানব।

'কোথায় গেল?' চেঁচিয়ে উঠলো দাড়িঅলা। 'বেরিয়ে গেছে?'

'এদিকে,' বললো পুলিস। আঙিনায় নেমেই থমকে দাঁড়ালো সে। টালির একটা ভাঙা টুকরো শাঁ করে উড়ে এসে তার কানের পাশ ঘেঁষে কিচেনের ভেতর গিয়ে পড়লো। চুরমার হয়ে গেল টেবিলের ওপর রাখা বাসনপত্র।

'দেখাচ্ছি মজা,' গর্জে উঠলো দাড়িঅলা। পুলিসটার কাঁধের ওপর দিয়ে চকচক করে উঠলো ইস্পাতের একটা নল। যেদিক থেকে এসেছে টালির টুকরোটা, পরপর পাঁচটা বুলেট সগর্জনে ছুটে গেল সেদিকে। বাঁ থেকে ডাইনে আনুভূমিক একটা বৃত্তচাপ রচনা করে গুলি ছুঁড়েছে দাড়িঅলা। ছোট আঙিনার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পাঁচটি সরলরেখায় ছুটে গেছে পাঁচটি বুলেট।

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর শোনা গেল দাড়িঅলার উত্তেজিত স্বর, 'তোফা! চার টেক্কা, এক জোকার। লণ্ঠন নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি! খুঁজে দেখি লাশটা।'

সতেরো

গুলির শব্দে চমকে মুখ তুললেন ডক্টর কেম্প। আপনাআপনি স্থির হয়ে গেল কলম-ধরা হাত। গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম,—পরপর পাঁচবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

'সে কী?' মুখে কলম পুরে কান খাড়া করলেন কেম্প। 'বারডকে রিভলভার ছোঁড়ে কে? আবার কিসে মাতলো গাধার দল!'

দক্ষিণের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকালেন। রাতের শহর। সারি সারি আলোকিত জানালা, গ্যাসের আলোর মালা, দোকান-পাট।

'পাহাড়ের নিচে লোকজনের ভিড় দেখা যাচ্ছে,' আপন মনে বললেন কেম্প, 'ক্রিকেটারস্-এর পাশে।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভ্রূ কুঁচকে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি শহর ছাড়িয়ে চলে গেল অনেক দূরে—দিগন্তের কাছাকাছি। সমুদ্রের বুকে ঝিকমিক করছে জাহাজের আলো, ছোট্ট জেটি হলুদ আলোয় উদ্ভাসিত একখণ্ড মণির মতো ঝলমল করছে। পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর শুক্লপক্ষের বাঁকা চাঁদ ঝুলে আছে। অসংখ্য উজ্জ্বল তারায় ছেয়ে আছে আকাশ।

দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন কেম্প। বর্তমানকে পেছনে ফেলে তাঁর মন ভেসে চললো সুদূর আগামীর কল্পলোকে। অনাগত ভবিষ্যতের বাঁকে বাঁকে কেমন

করে বদলে যাবে মানুষের সমাজ, কল্পনায় সে-সব ছবি দেখতে দেখতে শেষে একসময় ভাবনার খেই হারিয়ে ফেললেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার পর্দা নামিয়ে ফিরে এলেন পড়ার টেবিলে।

গুলির আওয়াজ শোনার পর থেকে ডক্টর কেম্পের লেখার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। মনোযোগ টুটে যাচ্ছে বারবার। প্রায় এক ঘন্টা সময় কেটে গেছে এর মধ্যে, কিন্তু কাজ তেমন এগোয়নি।

হঠাৎ সদর দরজার ঘন্টা বেজে উঠলো। লেখা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন তিনি। পরিচারিকা গিয়ে দরজা খুললো, আওয়াজ পেলেন। একটু পর আবার দরজা বন্ধ করে দেবার শব্দ হলো। এখুনি স্টাডির সিঁড়িতে পরিচারিকার পায়ের শব্দ শোনা যাবে। কেম্প অপেক্ষা করে রইলেন কলম মুখে পুরে। কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। পরিচারিকার দেখা নেই।

'কে এলো তাহলে,' বিড়বিড় করে বললেন কেম্প

আবার লেখায় মন দিতে গিয়েও পারলেন না তিনি। উঠে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ল্যাণ্ডিংয়ে নেমে ঘন্টা বাজালেন। নিচের হলঘরে পরিচারিকা এসে দাঁড়ালো। মুখ তুলে তাকালো জিজ্ঞাসু চোখে।

'চিঠি এলো নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন কেম্প।

'জী না, কে যেন শুধু শুধু ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে পালিয়েছে।'

'বড়ো অস্থির লাগছে আজ,' আপনমনে বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়ালেন কেম্প।

স্টাডিতে ফিরে এসে এবার সবটুকু মনোযোগ একত্রিত করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখার ভেতর সম্পূর্ণ ডুবে গেলেন তিনি। ঘড়ির টিক্ টিক্ এবং কলমের মৃদু খস্

খস্ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই ঘরের ভেতর। টেবিল-ল্যাম্পের বৃত্তাকার আলোর নিচে ব্যস্তভাবে বারবার এপাশ থেকে ওপাশে এগিয়ে চলেছে কেম্পের হাত।

লেখা ছেড়ে কেম্প যখন উঠলেন তখন রাত দু'টো বেজে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুললেন। নিচে নেমে এসে ঢুকলেন শোবার ঘরে। কোট এবং ভেস্ট খুলে ফেলবার পর হঠাৎ তাঁর মনে হলো, খুব তেষ্টা পেয়েছে, গলাটা একটু ভেজানো দরকার। মোমবাতি হাতে নিচে ডাইনিং রুমের দিকে চললেন হুইস্কির খোঁজে।

ফেরার পথে হলঘর পার হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে একটু থামলেন কেম্প। লিনোলিয়ামের ওপর কিসের যেন একটা গাঢ় ছোপ। বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে তিনি উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু কিছুদূর উঠেই মনের ভেতর একটা তাগিদ অনুভব করলেন। মনে হলো, দাগটা কিসের ভালো করে দেখা দরকার। আবার ফিরে এলেন সিঁড়ির গোড়ায়। হুইস্কি এবং সোডা ওয়াটার একপাশে নামিয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ে দাগটায় আঙুল ছোঁয়ালেন। শুকিয়ে আসা চটচটে লাল রক্ত মনে হলো জিনিসটা। খুব একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটলো না ডক্টর কেম্পের মুখে।

হুইস্কি নিয়ে আবার ওপরে উঠে এলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রক্তের দাগের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলেন। ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লেন আশ্চর্য হয়ে। তাঁরই শোবার ঘরের দরজার হাতলে রক্তের ছোপ লেগে আছে!

নিজের হাতের দিকে চাইলেন তিনি। পরিষ্কার। মনে পড়ে গেল,

স্টাডি থেকে ফিরে শোবার ঘরের দরজা খোলাই পেয়েছেন তিনি, কাজেই হাতল ছোঁবার আদৌ দরকার পড়েনি।

সোজা ঘরে ঢুকে পড়লেন কেম্প। মুখের ভাব এখনও সম্পূর্ণ শান্ত—স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য একটু বেশি দৃঢ় হয়তো বা। তাঁর চোখের দৃষ্টি এদিক ওদিক অনুসন্ধিৎসুভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিছানার ওপর গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বেডকভারের ওপর একগাদা রক্ত, চাদর ছেঁড়া। প্রথমবার ঘরে ঢুকে সোজা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে আগে এসব তাঁর চোখে পড়েনি। বিছানার অন্যপাশটা কুঁচকে রয়েছে—যেন একটু আগে কেউ বসেছিল সেখানে।

পরক্ষণে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো। কেম্পের মনে হলো, একটা উঁচু গলা শুনতে পেলেন তিনি: 'হায় ঈশ্বর!—কেম্প না?'

দৈববাণীতে কেম্পের বিশ্বাস নেই। অগোছালো বিছানার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সত্যিই কি কথা বলে উঠলো কেউ? আবার তাকালেন চারপাশে। কিন্তু রক্তমাখা অগোছালো বিছানা ছাড়া অস্বাভাবিক আর কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না।

তারপরই আওয়াজটা কানে এলো কেম্পের। ওয়াশ-হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলেন পরিষ্কার। এই প্রথম তাঁর গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো। আলগোছে কনুই দিয়ে ঠেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে হাতের জিনিস-গুলো নামিয়ে রাখলেন। ধীরে ধীরে আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ওয়াশ-হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তাঁর এবং ওয়াশ-হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের মাঝামাঝি শূন্যের ভেতর ঝুলে আছে লিনেনের একটা গোলাকার রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ।

বিহ্বল বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ডক্টর কেম্প। শূন্যে ভাসমান

ব্যাণ্ডেজটা পেঁচিয়ে বাঁধা রয়েছে ঠিকঠাকমতো—কিন্তু কিসের সঙ্গে পেঁচিয়ে! ভেতরটা একেবারে ফাঁকা।

নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই জিনিসটার। মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়ালেন কেম্প। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতের স্পর্শ বাধা দিলো তাঁকে।

'কেম্প!' খুব কাছেই শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

'আঁ?' হাঁ হয়ে গেছে কেম্পের মুখ।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, কেম্প। আমি একজন অদৃশ্য মানুষ।'

কিছুক্ষণ কথা সরলো না কেম্পের মুখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি ব্যাণ্ডেজটার দিকে। 'অদৃশ্য মানুষ!' শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন ঢোক গিলে।

'আমি একজন অদৃশ্য মানুষ,' গম্ভীর পুনরাবৃত্তি হলো কথাটার।

যে-গল্পটাকে আজ সকালেই কেম্প গাঁজাখুরি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেটাই আবার প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ফিরে এলো তাঁর মাথায়। কিন্তু বিস্ময় কিংবা আতঙ্কের কোনো চিহ্ন ফুটলো না তাঁর মুখে।

'আমি ভেবেছিলাম সবটাই গুজব,' যেন ধীরে ধীরে কেম্পের বোধোদয় ঘটলো। 'তোমার শরীরে কি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে কোথাও?' জানতে চাইলেন শান্ত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' বললো অদৃশ্য মানব।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কেম্প। 'বুঝলাম,' বিড়বিড় ক'রে বললেন নিজের মনে। 'কিন্তু এ কী করে সম্ভব? নিশ্চয় মস্ত কোনো ফাঁকি আছে কোথাও।' বলতে বলতে আচমকা ধেয়ে গেলেন সামনে। ব্যাণ্ডেজের দিকে বাড়ানো তাঁর হাত অদৃশ্য কয়েকটি আঙুলের সঙ্গে ঠেকে গেল।

কুঁকড়ে গেলেন কেম্প। পাল্টে গেল মুখের রঙ।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, কেম্প, ঈশ্বরের দোহাই! পাগলামি ক'রো না!' অদৃশ্য একটা হাত কেম্পের বাহু চেপে ধরলো। হাতে সজোরে ঘা মারলেন কেম্প।

'কেম্প!' ক্রুদ্ধ আর্তনাদ শোনা গেল। 'কেম্প! কথা শোনো বলছি!' আরো বাড়লো অদৃশ্য হাতের চাপ।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা প্রাণপণ ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কেম্পের ভেতর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা এবার খামচে ধরলো তাঁর কাঁধ। একই সঙ্গে পায়ে একটা হালকা লাথি এবং বুকে আচমকা ধাক্কা খেয়ে কেম্প বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। চিৎকার করবার জন্য মুখ খুলতেই বিছানার চাদরের একটা কোণ দ্রুত গুঁজে দেয়া হলো তাঁর মুখের ভেতর। অদৃশ্য মানব বিছানার ওপর শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে তাঁকে। হাত-পা দিয়ে তিনি সমানে লড়বার চেষ্টা করছেন।

'শোনো, কথা শোনো!' পাঁজরে একটা শক্ত ঘা খেয়েও হাত আলগা করেনি অদৃশ্য মানব। 'দোহাই ঈশ্বরের, থামো! তুমি কিন্তু আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছো!' কেম্পের কানের কাছে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'চুপচাপ শুয়ে থাকো, গর্দভ কোথাকার!'

আরো কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করবার পর নিঃসাড় পড়ে রইলেন কেম্প।

'শোনো,' হিংস্র কণ্ঠে বললো অদৃশ্য মানব, 'চিৎকার করবার চেষ্টা করো যদি, মুখ থেঁতলে দেবো।' কেম্পের মুখ থেকে চাদরের কোণ বের করে নেয়া হলো। 'আমি একজন অদৃশ্য মানুষ। এরমধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই, এটা কোনো ম্যাজিক নয়। সত্যিই অদৃশ্য এক-

জন মানুষ আমি। আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার গায়ে হাত তুলতে চাই না, কিন্তু গেঁয়ো ভূতের মতো পাগলামি করো যদি, তাহলে হাত তুলতে আমি বাধ্য হবো। আমার কথা তোমার মনে নেই, কেম্প ?—ইউনিভার্সিটি কলেজের গ্রিফিনকে তোমার মনে পড়ে ?'

'আগে উঠে বসতে দাও আমাকে,' কেম্প বললেন। কথা দিচ্ছি, নড়বো না।'

সরে গেল অদৃশ্য দু'টি হাত। উঠে বসে কেম্প ঘাড়ে হাত ঘষতে লাগলেন।

'আমি ইউনিভার্সিটি কলেজের গ্রিফিন। নিজেকে আমি অদৃশ্য করে ফেলেছি। আমাকে তুমি চিনতে, কেম্প।'

'গ্রিফিন ?' বললেন কেম্প।

'হ্যাঁ, গ্রিফিন,' উত্তর এলো। 'কলেজে তোমার জুনিয়র ছিলাম। দেখো তো মনে করতে পারো কিনা : ছ'ফুট লম্বা, যথেষ্ট চওড়া, গায়ের রঙ ধবধবে শাদা—প্রায় পুরোপুরি অ্যালবিনো বলতে পারো, লাল-শাদায় মেশানো মুখ, লালচে চোখ,—কেমিস্ট্রিতে মেডেল পেয়েছিলাম।'

'বুঝতে পারছি না কিছু,' বললেন কেম্প। 'মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এসবের সঙ্গে গ্রিফিনের কী সম্পর্ক ?'

'আমিই গ্রিফিন।'

একটু চিন্তা করলেন কেম্প। 'অবিশ্বাস্য। ভয়ঙ্কর ! কোন্ শয়তানি বিদ্যার বলে এমন কাণ্ড সম্ভব ?'

'শয়তানির কিছু নেই এর মধ্যে। এটা একটা সুস্থ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বোঝা কঠিন নয় জিনিসটা—'

'ভয়ঙ্কর কাণ্ড !' বললেন কেম্প। 'কী করে সম্ভব—'

'ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নেই। কিন্তু, কেম্প, আমি জখম হয়েছি, হাতে বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। সাংঘাতিক ক্লান্ত আমি—ঈশ্বর! কেম্প, তুমি ব্যাটাছেলে। সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো ব্যাপারটা। আগে কিছু খেতে দাও আমাকে, স্থির হয়ে বসতে দাও।'

কেম্প দেখতে পেলেন ব্যাণ্ডেজটা দুরে সরে যাচ্ছে। একট বাস্কেট চেয়ার ঘরের কোণ থেকে হড় হড় করে মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে বিছানার কাছে এসে থামলো। ক্যাঁচ করে উঠলো চেয়ারখানা, বসবার জায়গাটা সিকি ইঞ্চির মতো দেবে গেল।

চোখ রগড়ে নিয়ে আবার তাকালেন কেম্প। 'ভূতপ্রেতকেও হার মানায়,' বলে বোকার হাসি হেসে উঠলেন তিনি।

'এই তো, বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করছো এখন!'

'কিংবা নির্বোধের মতো,' বললেন কেম্প।

'হুইস্কি দাও একটু। মর মর অবস্থা হয়েছে আমার।'

'সেরকম তো মনে হলো না,' ঘাড়ে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন কেম্প। 'কোথায় তুমি? উঠলে তোমার সঙ্গে ধাক্কা খাবো নাকি? এখানে! ঠিক আছে। হুইস্কি? এই যে। কোথায় দেবো?'

আবার মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো চেয়ারখানা। হাতে ধরা গ্লাসটায় মৃদু টান অনুভব করলেন কেম্প। হাত থেকে খ'সে গিয়ে হুইস্কিভর্তি গ্লাস চেয়ারের সামনের কিনারা থেকে বিশ ইঞ্চি ওপরে শূন্যের ভেতর স্থির হয়ে রইলো।

বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন কেম্প। 'হিপনোটিজম!' যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'আমাকে সম্মোহিত ক'রে তুমি নিশ্চয় সাজেশন দিয়েছো যে তুমি অদৃশ্য।'

'বাজে কথা ব'লো না,' বললো অদৃশ্য মানব।

'উদ্ভট পাগলামি—'

'আমার কথা শোনো।'

'আজ সকালে আমি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, কারো পক্ষে অদৃশ্য হওয়া—'

'কী প্রমাণ করেছো তুমি তাতে কিছু এসে যায় না!' বাধা দিয়ে বললো অদৃশ্য মানব। 'আমি উপোস করছি, তাছাড়া কাপড়চোপড় ছাড়া বড্ড শীতও করছে।'

'খেতে দেবো?' বললেন কেম্প।

হুইস্কির গ্লাস কাত হলো একদিকে। 'হ্যাঁ,' বলে খট্ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো অদৃশ্য মানব। 'ড্রেসিং গাউন হবে একটা?'

চাপা একটু বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এলো কেম্পের মুখ থেকে। ওয়ারড্রোবের কাছে গিয়ে তিনি একটা নোংরামতো লাল গাউন বের করলেন।

'চলবে?' জিজ্ঞেস করতেই মৃদু টানে হাত থেকে বেরিয়ে গেল সেটা। শূন্যের ভেতর শিথিলভাবে ঝুলে রইলো এক মুহূর্ত, তারপর অস্থিরভাবে নড়েচড়ে কারো শরীরে পরা অবস্থার মতো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। বোতামগুলো চটপট আপনাআপনি লেগে গেল। এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো গাউনটা।

'পাজামা, মোজা, চটিজুতো পেলে ভালো হতো,' অবলীলায় ব'লে ফেললো অদৃশ্য মানব। এবং খাবার।'

'সব হবে। কিন্তু এর চেয়ে অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি!'

ড্রয়ার খুলে জিনিসগুলো বের করে দিয়ে কেম্প নিচতলায় গেলেন ভাঁড়ারে কী আছে খুঁজে দেখতে। ফিরে এলেন ঠাণ্ডা কয়েকটা কাট-

লেট আর রুটি নিয়ে। একটা হালকা টেবিল টেনে এনে সেগুলো অতিথির সামনে নামিয়ে রাখলেন।

'ছুরি-টুরি লাগবে না,' বললো অদৃশ্য অতিথি। একটা কাটলেট উঠে পড়লো শূন্যে। কামড় দেবার শব্দ হলো।

'অদৃশ্য!' ব লে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ডক্টর কেম্প।

গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে অদৃশ্য মানব।

'কব্জিটা ভেঙে যায়নি আশা করি,' বললেন কেম্প।

'ভাঙেনি।'

'এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য--'

'ঠিক। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে আমি তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়বো এটাও কম আশ্চর্য নয়। এই প্রথম একটু সৌভাগ্যের মুখ দেখলাম বলতে হবে। যাই হোক, আজ রাতে এখানে ঘুমোবো বলে আগেই স্থির করেছিলাম। এ-অত্যাচারটুকু তোমাকে সইতেই হবে! রক্তের দাগ-টাগ লেগে বিশ্রী অবস্থা হয়েছে, না? ওখানে বিছানায় তো একগাদা রক্ত লেগে গেছে। জমে গেলে চোখে দেখা যায়, বুঝতে পারছি।—তিন ঘণ্টা হলো এ-বাড়িতে ঢুকেছি আমি।'

'কিন্তু কী করে সম্ভব ব্যাপারটা?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে শুরু করলেন কেম্প। 'চুলোয় যাক্! আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটাই যুক্তিতর্কের অতীত মনে হচ্ছে।'

'তা নয়,' বললো অদৃশ্য মানব। 'মোটেই তা নয়।'

হুইস্কির বোতলটা শূন্যে উঠে পড়লো। কেম্প একদৃষ্টে তাকিয়ে ড্রেসিং-গাউনের খাবার গেলা দেখছেন। ডান কাঁধের ছেঁড়া একটা জায়গা দিয়ে মোমবাতির আলো ঢুকে পড়ে বাম পাঁজরের নিচে

একটা আলোকিত ত্রিভুজ তৈরি করেছে।

'সন্ধ্যায় গুলির আওয়াজ হলো কিসের?' জানতে চাইলেন কেম্প।

'এক জোচ্চোর—আমার এক স্যাঙাত বলতে পারো—আমার টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিকই টাকা নিয়ে কেটে পড়েছে হারামজাদা—'

'অদৃশ্য নাকি সে-ও?'

'না।'

'তারপর কী হলো?'

'বলছি। তার আগে আর কিছু খাবার পাওয়া যায় না? খিদে পেয়েছে আমার—হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। এ-অবস্থায় তুমি আবার বলছো গল্প শোনাতে।'

উঠে দাঁড়ালেন কেম্প। 'গুলি তাহলে তুমি ছোঁড়োনি?'

'না। এক গর্দভ ছুঁড়েছে, আগে কখনো দেখিনি ব্যাটাকে। আমার ভয়ে সবাই অস্থির হয়ে গিয়েছিল। গোল্লায় যাক্!—কেম্প, আরো খাবার চাই বলেছি।'

'নিচতলায় গিয়ে দেখছি আর কী আছে,' বললেন কেম্প। 'মনে হয় না খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে।'

প্রচুর খেলো অদৃশ্য মানব। খাওয়া শেষ করে একটা চুরুট চাইলো। কেম্প ছুরি এনে দেবার আগেই সে হিংস্রভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে ফেললো চুরুটের ডগা। ধূমপানের দৃশ্যটা হলো দেখবার মতো। পাকানো ধোঁয়ার ছাঁচে স্পষ্ট হয়ে উঠলো মুখ-গহ্বর, গলা, নাসারন্ধ্র।

'আ-হ্!' তৃপ্তির একটা বিরাট নিঃশ্বাস ছাড়লো অদৃশ্য মানব।

'আমার ভাগ্য ভালো, কেম্প, তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে কারো সাহায্যের আমার খুবই দরকার। সাংঘাতিক বেকায়দা অবস্থায় পড়ে আছি আমি। উন্মাদের মতো হয়ে গেছি। কতো দুর্ভোগ যে সইতে হয়েছে! বলছি তোমাকে সব—'

আরো হুইস্কি এবং সোডা ঢেলে নিলো অদৃশ্য মানব। কেম্প উঠে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে স্পেয়ার রুম থেকে নিজের জন্যে একটা গ্লাস নিয়ে এলেন। 'গলাটা ভিজিয়ে নিই একটু—'

'এত বছরেও তুমি খুব একটা বদলাওনি, কেম্প। তোমাদের মতো ভালো ছেলের পরিবর্তন হয়ও না খুব একটা। একবার ভুল হয়ে গেলে ধীর-স্থিরভাবে হিসেব ক'রে চলো। তোমাকে সব বলবো আমি। আমরা একসঙ্গে কাজ করবো

'কিন্তু এসব কী দেখছি?' বললেন কেম্প, 'তুমি এমন হ'লে কী করে?'

'ঈশ্বরের দোহাই, চুরুটটা একটু শান্তিতে টানতে দাও! তারপর বলছি সব।'

কিন্তু সে-রাতে অদৃশ্য মানবের গল্প কিছুই শোনা হলো না। তার কব্জির ব্যথা বেড়ে গিয়েছিল। জ্বর জ্বর, অবসন্ন বোধ করছিল সে। পাহাড়ের পথে মারভেলকে তাড়া করে আসা আর সরাইখানার সংঘর্ষের ছবি ফিরে ফিরে আসছে তার মনে। টুকরো টুকরো কথা বলছে মারভেলকে নিয়ে, ধোঁয়া ছাড়ছে আরো ঘন ঘন, গলার স্বরে ফুটে উঠছে ক্রোধ। তার কথা থেকে যতটুকু সম্ভব কেম্প বুঝে

নিতে চেষ্টা করছেন।

'ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বুঝতে পারছিলাম, আমাকে ভয় পেয়েছিল,' ঘুরে ফিরে অনেকবার কথাটা বললো অদৃশ্য মানব। 'আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল—সুযোগ খুঁজছিল সারাক্ষণ! কী নির্বোধ আমি!—নেড়িকুত্তা!—আগেই খুন করা উচিত ছিল ওকে—'

'তুমি টাকা পেলে কোথায়?' আচমকা প্রশ্ন করলেন কেম্প।

কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর গম্ভীর উত্তর এলো, 'আজ রাতে বলতে পারছি না।'

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো অদৃশ্য মানব অদৃশ্য হাতের ওপর অদৃশ্য মাথা রেখে বললো, 'কেম্প, প্রায় তিন দিন হলো ঘুমোইনি আমি—দু'একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে শুধু একটু ঝিমিয়ে নিয়েছি। এক্ষুণি আমাকে ঘুমোতে হবে।'

'বেশ তো, ঘুমোও আমার ঘরে—এখানে ঘুমোও।'

'কিন্তু কী করে ঘুমোবো? আমি ঘুমোবো, আর ওদিকে সরে পড়বে ও।—ধুত্তোর! তাতে কী এসে যায়?'

'গুলিতে কেমন ক্ষত হয়েছে?' কেম্প জিজ্ঞেস করলেন।

'তেমন কিছু হয়নি—ছ'ড়ে গিয়ে কিছু রক্ত পড়েছে ঈশ্বর! আমার ঘুমোনো দরকার!'

'অসুবিধে কোথায়?'

মনে হলো কেম্পকে খুঁটিয়ে দেখছে অদৃশ্য মানব। 'মানুষের হাতে ধরা পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো সে।

চমকে উঠলেন কেম্প

'গর্দভ আমি একটা!' টেবিলে চড় মেরে ফিসফিস্ করে বলে উঠলো অদৃশ্য মানব। 'আমিই হয়তো চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিলাম তোমার মাথায়!'

আঠারো

আহত অবসন্ন অদৃশ্য মানব কেম্পের অভয়বাণী কানে তুললো না বেডরুমের জানালাদু'টো পরীক্ষা করে দেখলো সে। দরকার হলে জানালা গ'লে পালাতে পারবে—কেম্পের এই আশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে পর্দা তুলে শার্সি খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলো। শান্ত, নিস্তব্ধ রাত। বাঁকা চাঁদ অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। বেডরুমের সব দরজার চাবি এবং ড্রেসিং রুমের দু'টো দরজাও খুঁটিয়ে দেখে শেষপর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হলো। হাই তোলার শব্দ পেলেন কেম্প।

'দুঃখিত,' বললো অদৃশ্য মানব, 'আমার সব কথা আজ রাতে বলতে পারছি না। সাংঘাতিক ক্লান্ত আমি। জানি, তোমার কাছে সব আজগুবি মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর লাগছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, কেম্প, খুবই বাস্তব জিনিসটা। এটা আমার একটা বিশেষ আবিষ্কার। গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, সম্ভব হচ্ছে না। সঙ্গী চাই একজন। যদি তুমি —তুমি আমি মিলে এমন সব কাজ—থাক, কাল হবে সেসব কথা কেম্প মনে হচ্ছে, না ঘুমোলে মারা পড়বো আমি।'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেম্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুণ্ডহীন ড্রেসিং-গাউনের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য!' ফিসফিস করে বললেন, 'এরকম আর দু'টি-একটি ঘটনাই আমার ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস গুঁড়িয়ে আমাকে পাগল বানিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। অথচ

অস্বীকার করবার উপায় নেই, সবটাই বাস্তব!' নিজেকে সামলে নিলেন তিনি, '—আমি তাহলে যাই। আর কিছু চাই তোমার?'

'না,' শুধু তুমি বিদায় নিলেই চলবে,' বললো গ্রিফিন।

'গুড নাইট,' ব'লে কেম্প অদৃশ্য হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

হঠাৎ ড্রেসিং-গাউনটা দ্রুত এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। 'মনে রেখো আমার কথাটা!' বললো অদৃশ্য মানব। 'আমাকে বাধা দেবার কিংবা আটক করবার কোনোরকম চেষ্টা করো না! নইলে—'

একটু বদলে গেল কেম্পের মুখভাব। 'তোমাকে আমি কথা দিয়েছি,' বললেন তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে কেম্প আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাবি লাগিয়ে দেবার আওয়াজ হলো। মুখে অপার বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেম্প। ঘরের ভেতর পায়ের শব্দ ড্রেসিং-রুমের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল, চাবি লাগানো হলো সেদিকের দরজায়ও। নিজের কপালে মৃদু চড় দিয়ে কেম্প বলে উঠলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? পৃথিবীটা উন্মাদ হয়ে গেছে—নাকি আমি?'

নিজের মনে একটু হেসে বন্ধ দরজায় হাত রাখলেন কেম্প। 'নিজের ঘরে ঢোকা নিষেধ আমার, জলজ্যান্ত এক কিম্ভূত জিনিসের ইচ্ছেয়!'

সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। তাকিয়ে রইলেন বন্ধ দরজার দিকে। 'সবটাই বাস্তব,' বলে নিজের ঘাড়ে হাত রাখলেন। সামান্য ছড়ে গেছে ঘাড়। হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'অনস্বীকার্য বাস্তব! কিন্তু—' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আবার। নেমে এলেন নিচে।

ডাইনিং-রুমের বাতি জ্বেলে একটা চুরুট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করলেন কেম্প। থেকে থেকে তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো তাঁর নিজের সঙ্গেই।

'অদৃশ্য!—অদৃশ্য প্রাণী ব'লে কি কোনকিছুর অস্তিত্ব আছে? আছে। সাগরে। হাজার হাজার! লক্ষ লক্ষ! ছোট ছোট শূককীট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক সব প্রাণী, জেলি-ফিশ। চোখে দেখা যায় এমন জিনিসের চেয়ে অদৃশ্য জিনিসের সংখ্যাই বেশি সাগরে। ব্যাপারটা আগে কখনও ভেবে দেখিনি। এমন কি পুকুর সম্পর্কেও একই কথা খাটে! জলের ছোট ছোট জীবাণু—অতি ক্ষুদ্র বর্ণহীন স্বচ্ছ জেলির মতো প্রাণী। কিন্তু বাতাসের ভেতর আছে অমন কিছু? নেই!

'না, এ হতে পারে না।

'কিন্তু পারবেই বা না কেন?

'পারে না, কারণ, কাচের তৈরি হলেও একজন মানুষকে ঠিকই চোখে দেখা যাবে।'

গভীর থেকে গভীরতর ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন কেম্প। সেই ফাঁকে একে একে তিনটি চুরুট অদৃশ্য হয়ে গেল, কার্পেটের ওপর এখানে ওখানে শুধু কিছু শাদা ছাইয়ের চিহ্ন পড়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ের একটা অস্ফুট ধ্বনি করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে ছোট্ট কনসালটিং-রুমে ঢুকে গ্যাসের বাতি জ্বাললেন। ঘরটা ছোট, কারণ ডাক্তার কেম্প রোগী দেখে জীবিকা অর্জন করেন না। দিনের বিভিন্ন সংবাদপত্র রয়েছে ঘরে। সকালের কাগজখানা এলোমেলোভাবে একপাশে খোলা পড়ে আছে। হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টালেন কেম্প। দ্রুত পড়ে ফেললেন 'আইপিংয়ের

বিচিত্র ঘটনা।'

'ব্যাণ্ডেজ মোড়া।' বললেন কেম্প। 'ছদ্মবেশ পরা। ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা। ''তাহার অত্যাশ্চর্য স্বরূপ সম্পর্কে কেহই অবগত ছিল না।'' মতলব কী ওর?'

হাতের কাগজখানা নামিয়ে রেখে এদিক ওদিক চাইলেন কেম্প। 'ওই যে!' সেণ্ট জেম্‌স্‌ গেজেটখানা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। যেমন এসেছে তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে সেটা। 'এবার আসল খবর জানা যাবে,' বলতে বলতে কেম্প কাগজখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কয়েক কলাম জুড়ে ছাপা হয়েছে খবরটা। হেডিংয়ে লেখা: 'ত্রাসের ঝবলে সাসেক্সের গ্রাম।'

'ঈশ্বর!' আগের দিন বিকেলে ঘটে যাওয়া আইপিংয়ের অবিশ্বাস্য কাহিনী নিবিষ্ট মনে পড়তে পড়তে বলে উঠলেন কেম্প। সকালের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টটাও এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

আবার পুরো খবরটা খুঁটিয়ে পড়লেন কেম্প। '···ডাইনে-বামে আঘাত হানিতে হানিতে রাস্তা দিয়া ধাবিত হয়।···জেফার্স সংজ্ঞাহীন।···মিস্টার হাক্সটার গুরুতর অসুস্থ—ঘটনা বর্ণনায় এখনও অক্ষম।···ভিকারের দুঃখজনক মানহানি।···আতঙ্কগ্রস্ত মহিলার জটিল অবস্থা।···জানালা চূর্ণবিচূর্ণ···এই অত্যদ্ভুত কাহিনী সম্ভবত কল্পনাপ্রসূত।···'

কাগজ নামিয়ে রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইলেন কেম্প। 'সম্ভবত কল্পনাপ্রসূত!'

কাগজখানা আবার তুলে নিয়ে আরো একবার পড়ে দেখলেন সমস্ত খবর। 'কিন্তু এই ভবঘুরে লোকটা এলো কোত্থেকে? একজন ভবঘুরেকে ও তাড়া করবেই বা কেন?'

ঝুপ্ করে সাজিক্যাল কাউচের ওপর বসে পড়লেন কেম্প। 'শুধু অদৃশ্য নয়,' বললেন তিনি, 'ও একটা উন্মাদ! খুনে!'

ডাইনিং-রুমের বাতির আলো এবং চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে যখন ভোরের ম্লান আলো মিশতে শুরু করেছে, তখনও ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছেন কেম্প। পরিচারক-ভৃত্যেরা ঘুমচোখে নিচে নেমে এসে তাঁকে এ-অবস্থায় আবিষ্কার করে ধরে নিলো, ব্যাপারটা রাত জেগে বেশি পড়াশোনা করবার কুফল। কেম্প একটা অদ্ভুত অথচ প্রাঞ্জল নির্দেশ দিলেন তাদের। স্টাডিতে দু'জনের ব্রেকফাস্ট দিতে বললেন এবং সেইসঙ্গে কড়া নির্দেশ জারি করলেন, ব্রেকফাস্ট পরিবেশনের পর থেকে সবাই যেন শুধু বেসমেন্ট এবং নিচতলার মধ্যে চলাফেরা সীমাবদ্ধ রাখে।

সকালের সংবাদপত্র না আসা পর্যন্ত ডাইনিং-রুমে পায়চারি অব্যাহত রাখলেন কেম্প। অনেক কথা লিখেছে কাগজে, তার ভেতর কাজের কথা সামান্যই। শুধু আগের সন্ধ্যার ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করা হয়েছে এবং পোর্টবারডকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার অত্যন্ত দুর্বল একটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেটা পড়ে কেম্প জলি ক্রিকেটার্সের ঘটনার মূলকথা জানতে পারলেন। মারভেল নামটিও সেখানে পাওয়া গেল। "সে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা তার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করে," মারভেল বলেছে। আইপিংয়ের কাহিনীর সঙ্গে আরো কিছু ছোট ছোট তথ্য যোগ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবার ঘটনা। কিন্তু ভবঘুরে মারভেলের সঙ্গে অদৃশ্য মানবের যোগসূত্রটি কোথায়

সে-বিষয়ে কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা হয়নি। আসলে অদৃশ্য মানবের তিনখানা ডায়েরি এবং পকেটভর্তি টাকার কথা বেমালুম চেপে গিয়েছে মারভেল। যাইহোক, অবিশ্বাসের সুরটা আর এখন বজায় নেই। ঘটনার পেছনে সেঁটে গিয়েছে একঝাঁক রিপোর্টার এবং অনুসন্ধানী।

তন্ন তন্ন করে রিপোর্টটা পড়লেন কেম্প। তারপর পরিচারিকাকে পাঠিয়ে সকালের যতগুলো কাগজ পাওয়া যায় সব আনিয়ে নিলেন। গোগ্রাসে গিললেন সেগুলোও।

'চোখে দেখা যায় না ওকে!' নিজের মনে বললো কেম্প। 'এবং মনে হচ্ছে, রাগলে ও উন্মাদ হয়ে যায়! কী না করতে পারে ও। কী না পারে! অথচ হাওয়ার মতো মুক্ত ও এখন। কী যে করবো আমি!' নীরবে একটু চিন্তা করলেন কেম্প। 'বিশ্বাসঘাতকতা হবে নাকি, যদি—' বলে আবার ডুবে গেলেন ভাবনার অতলে। অনেকক্ষণ পর যেন গভীর আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে জেগে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। মৃদু অথচ স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে বললেন, 'না।'

কোণের একটা ছোট অগোছালো ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। নিবিষ্ট মনে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। অর্ধেক লিখে কী ভেবে ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। লেখা শেষ হলে বারকয়েক পড়লেন চিঠিটা। ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর একখানা এনভেলপ টেনে নিয়ে ঠিকানা লিখলেন: 'কর্ণেল এডাই, পোর্ট বারডক।'

ওপর তলায় তখন ঘুম ভেঙেছে অদৃশ্য মানবের। রুক্ষ মেজাজ নিয়েই জেগেছে সে। কেম্প ক্ষীণতম শব্দটির জন্যও উৎকর্ণ হয়েছিলেন। মাথার ওপর বেডরুমে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলেন

তিনি। তারপরই একটা বিকট আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলেন, চেয়ারের ঘায়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ওয়াশ-হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের টাম্বলার। এক দৌড়ে ওপরতলায় উঠে বেডরুমের দরজায় দ্রুত টোকা দিলেন কেম্প।

উনিশ

'কী ব্যাপার ?' ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন কেম্প।

'কিছু না,' উত্তর এলো।

'বাহ্। ওটা তাহলে ভাঙলো কী করে ?'

'মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল,' বললো অদৃশ্য মানব। জখম হাত-টার কথা একদম মনে ছিল না।

'বরং বলো, তোমার স্বভাবই এরকম।'

'ঠিক।'

কেম্প এগিয়ে গিয়ে কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার সবকথা সবাই জেনে গেছে। আই-পিংয়ের সমস্ত ঘটনা, এখানে বারডকে যা ঘটেছে—সব। পৃথিবীর অদৃশ্য বাসিন্দা সম্পর্কে সবাই এখন সচেতন। কিন্তু কেউ জানে না, তুমি এখানে।'

কিছু খিস্তি বর্ষণ করলো অদৃশ্য মানব।

'তোমার গোপন অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে,' বললেন কেম্প। 'তুমি কী করতে চাও জানি না, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।'

অদৃশ্য মানব বিছানার ওপর বসলো।

'ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে ওপরে,' যতোটা সম্ভব সহজভাবে বল-

লেন কেম্প। অদ্ভুত অতিথিকে স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়াতে দেখে খুশি হলেন মনে মনে। সরু সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে স্টাডি-তে নিয়ে এলেন তাকে।

নার্ভাস চোখে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে নিয়ে বসে পড়লেন কেম্প।

'যা-ই করি আমরা, আগে তোমার এই অদৃশ্য অবস্থার ব্যাপার-টা আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার আমার,' গুরুত্বপূর্ণ আলো-চনা শুরু করবার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। পুরো ঘটনাটার বাস্তবতা নিয়ে আবার তাঁর মনে এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহের উদয় হলো। কিন্তু ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসা গ্রিফিনকে এই মুহূর্তে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। মুণ্ডহীন, হাতহীন একটা ড্রেসিং-গাউন অদৃশ্য হাতে ধরা ন্যাপকিন দিয়ে অদৃশ্য ঠোঁট মুছছে।

'অনায়াসে বুঝতে পারবে, সোজা ব্যাপার—' ন্যাপকিন এক-পাশে সরিয়ে রেখে অদৃশ্য হাতের ওপর অদৃশ্য থুতনি রেখে বললো গ্রিফিন।

'তোমার কাছে সোজা, কিন্তু—' কেম্প হাসলেন।

'হ্যাঁ, তা বটে। তবে আমার কাছেও প্রথমে খব অদ্ভুত লেগে-ছিল। কিন্তু এখন, ঈশ্বর!—ব্যাপারটা প্রথম আমার মাথায় আসে চেসিলস্টোতে।'

'চেসিলস্টো?'

'লণ্ডন থেকে ওখানে যাই আমি। তুমি বোধহয় জানো, আমি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছিলাম? জানো না?—হ্যাঁ, পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছিলাম। আলোকবিদ্যা নিয়ে মেতে উঠেছিলাম আমি।'

'তাই নাকি ?'

'বিষয়টা ছিল : অপটিক্যাল ডেনসিটি। পুরো জিনিসটাই যেন বিশাল একটা ধাঁধার জাল। তার ফাঁক দিয়ে সমাধানগুলো বারবার উঁকি দিয়ে যায় শুধু—ধরা দেয় না কিছুতেই। তখন বাইশ বছরের টগবগে তরুণ আমি। জীবনপাত করবো বলে প্রতিজ্ঞা করলাম বাইশ বছর বয়সে কেমন অর্বাচীন থাকি আমরা জানোই তো।'

'বাইশ বছর বয়েসে না হলেও এ-বয়েসে থাকি বৈকি!' কেম্প বললেন।

কথাটা গায়ে মাখলো না গ্রিফিন। 'শুধু জেনে কি একজন মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে! কাজে লেগে গেলাম আমি। মাথা খাটাতে লাগলাম। ছ'মাস যেতে না যেতে একদিন বিদ্যুৎচমকের মতো একটা জিনিস এলো মাথায়। বস্তুকণা এবং প্রতিসরণের একটা সাধারণ সূত্র পেয়ে গেলাম,—বস্তুর চতুর্মাত্রাবিষয়ক একটা ফরমুলা, একটা জ্যামিতিক তত্ত্ব বলা যায় সেটাকে। সাধারণ লোকে, এমনকি সাধারণ কোনো গণিতজ্ঞও বুঝবে না মলিকিউলার ফিজিক্সের একজন ছাত্রের কাছে এরকম একটা সাদামাটা সূত্রের কী মানে দাঁড়াতে পারে। ওই ব্যাটা ভবঘুরে যে-বইগুলো নিয়ে পালিয়েছে, যাদুমন্ত্র আছে সেগুলোর পৃষ্ঠায়—অলৌকিক সব ব্যাপারের কথা আছে! তবে তখনও আমি কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে পারিনি। তখন পর্যন্ত জিনিসটা ছিল একটা আইডিয়ামাত্র। সেটার ওপর ভিত্তি করে আমি এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চেয়েছি যার সাহায্যে বস্তুর সমস্ত গুণাগুণ অপরিবর্তিত রেখে—হয়তো কখনো শুধুমাত্র রঙের কিছুটা পরিবর্তন করে—কঠিন কিংবা তরল পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়।'

'ধুত্তোর!' বললেন কেম্প। 'যতোসব আজগুবি কথা! আমার কাছে এখনওকিছু পরিষ্কার হচ্ছে না।—বুঝলাম ওভাবে হয়তো একটা দামী পাথরের বারোটা বাজাতে পারো তুমি, তাই বলে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলা কি অতোই সোজা?'

'ঠিক বলেছো,' বললো গ্রিফিন। 'কিন্তু ভেবে দেখো: কোনো বস্তু দেখা যাবে কি যাবে না সেটা নির্ভর করে আলোর ওপর ওই বস্তুর ক্রিয়ার ওপর। যে-কোনো বস্তু হয় আলো শুষে নেবে, অথবা আলো প্রতিফলিত কিংবা প্রতিসরিত করবে, নয়তো এর সবগুলোই করবে। যদি কোনো বস্তু আলো প্রতিফলিত কিংবা প্রতিসরিত না করে, এমনকি আলো শোষণও না করে, তাহলে সে-বস্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, তুমি একটা অস্বচ্ছ লাল বাক্স দেখতে পাচ্ছো। এখানে আসলে যা ঘটছে তা হলো, বাক্সের রঙ আলোর লাল অংশ ছাড়া বাকি অংশ শুষে নিচ্ছে এবং শুধু লাল অংশটুকু প্রতিফলিত করছে। বাক্সটা যদি আলোর কোনো বিশেষ অংশ শুষে না নিয়ে পুরো আলোটাই প্রতিফলিত করতো, তাহলে একটা ঝক্‌ঝকে শাদা বাক্স দেখতে পেতে তুমি। রুপোর তৈরি বাক্স যেমন! হীরার বেলায় দেখা যাবে, সমতল উপরিভাগ থেকে খুব বেশি আলো প্রতিফলিত হচ্ছে না, বেশি আলো শুষেও নিচ্ছে না হীরা,শুধুমাত্র এখানে-ওখানে সুবিধাজনক জায়গায় আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ঘটছে। ফলে জোরালো প্রতিফলন এবং আধা-স্বচ্ছ অবয়ব হীরাকে দিচ্ছে উজ্জ্বল ঝক্‌মকে চেহারা,—আলোর একটা কঙ্কাল যেন! কাচের তৈরি বাক্স অতো বেশি ঝক্‌মক করবে না, অতো স্পষ্টভাবে চোখেও পড়বে না। এর কারণ, প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনের মাত্রা এখানে কম। বুঝতে পারছো? কোনো কোনো

বিশেষ দিক থেকে তাকালে কাচের বাক্সের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দৃষ্টি চলে যাবে। কিছু কিছু কাচ আবার বেশি চোখে পড়ে। যেমন, সাধারণ জানালার কাচের তুলনায় ফ্লিণ্ট গ্লাস বেশি উজ্জ্বল দেখায়। খুব পাতলা সাধারণ কাচের তৈরি একটা বাক্স অল্প আলোয় প্রায় চোখেই পড়বে না, কারণ এ-ক্ষেত্রে আলোর শোষণ প্রায় ঘটছেই না, প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনও ঘটছে খুব সামান্য পরিমাণে। যদি সাধারণ কাচের একটা খণ্ড পানিতে কিংবা আরো ঘন কোনো তরল পদার্থে ডোবাও, তাহলে সেটা প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। এর কারণ, আলো পানি থেকে কাচের ভেতর ঢুকবার সময় প্রতিফলিত কিংবা প্রতিসরিত হচ্ছে খুবই কম। কাচের খণ্ডটিকে তখন প্রায় বাতাসে মিশে থাকা কয়লার গ্যাস কিংবা হাইড্রোজেনের মতোই অদৃশ্য মনে হবে। কারণও দু'টি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক।'

'হুঁ,' বললেন কেম্প, 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'আরেকটা ব্যাপার দেখো, কেম্প। কাচের একটা শীট যদি ভেঙে গুঁড়ো করে মিহি পাউডার বানিয়ে ফেলা যায় তাহলে বাতাসের ভেতর সেটা বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। যতো বেশি গুঁড়ো করা যাবে ততো বেশি অস্বচ্ছ শাদা মনে হবে জিনিসটা। এর কারণ হচ্ছে, যতই গুঁড়ো হচ্ছে কাচ ততই তার তল বা পিঠের সংখ্যা বাড়ছে। আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ঘটে বস্তুর এই তলেই। কাচের একটা শীটের থাকে মাত্র দু'টি তল। কিন্তু কাচের গুঁড়োর প্রতিটি কণাতেই আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ হচ্ছে। খুব সামান্য পরিমাণ আলোই সরাসরি গুঁড়ো ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারছে। এখন এই গুঁড়ো করা কাচ যদি পানিতে ছেড়ে দেয়া যায় তাহলেই আর তা চোখে দেখা যাবে না। কাচের গুঁড়ো এবং পানির প্রতি-

সরাঙ্ক প্রায় এক, তার মানে, আলো পানি থেকে কাচে কিংবা কাচ থেকে পানিতে যাবার সময় প্রতিসরিত এবং প্রতিফলিত হচ্ছে খুব কম।—তাহলে দেখো, প্রায় একই প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট তরল পদার্থের ভেতর কাচ ডোবালে কাচ অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, স্বচ্ছ কোনো জিনিস প্রায় সমান প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে রাখলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, বাতাসের ভেতরেও কাচের গুঁড়ো অদৃশ্য করে দেয়া সম্ভব। তার জন্যে শুধু দরকার, কাচের গুঁড়োর প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের পর্যায়ে নিয়ে আসা, কারণ, তাহলেই আর কাচ থেকে বাতাসে ঢুকবার সময় আলো প্রতিসরিত কিংবা প্রতিফলিত হবে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম,' বললেন কেম্প। 'কিন্তু মানুষ তো আর কাচের গুঁড়ো নয়!'

'না,' বললো গ্রিফিন। 'মানুষ তারও চেয়ে স্বচ্ছ।'

'বাজে বকো না!'

'তুমি না ডাক্তার! মানুষ এমন ক'রে ভুলে যায়! দশ বছরেই তোমার পদার্থবিদ্যার জ্ঞান ধুয়ে-মুছে গেছে? এমন জিনিস কি নেই যা স্বচ্ছ, অথচ দেখলে স্বচ্ছ মনে হয় না? কাগজের কথাই ধরো। কাগজ তৈরি স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে। কাচের গুঁড়ো যে-কারণে শাদা এবং অস্বচ্ছ দেখায়, ঠিক সেই একই কারণে কাগজও শাদা ও অস্বচ্ছ মনে হয়। শাদা কাগজ তেলে চুবিয়ে নাও। কাগজের কণাগুলোর সূক্ষ্ম ফাঁক-ফোকর তেলে ভর্তি হয়ে যাবে। কাগজের উপরিভাগ ছাড়া আর কোথাও আলোর প্রতিসরণ কিংবা প্রতিফলন ঘটবে না। কাচের মতো স্বচ্ছ দেখাবে কাগজ। শুধু কাগজ নয়, কেম্প, তুলোর আঁশ, লিনেনের আঁশ, উলের আঁশ, কাঠের আঁশ, এমন কি—কেম্প,—

হাড়, মাংস, চুল, নখ, স্নায়ু—সত্যি বলতে কি রক্তের লাল রঙ আর চুলের কালো কণিকা ছাড়া মানুষের সমস্ত শরীর স্বচ্ছ, বর্ণহীন কোষকলায় তৈরি। আমরা যে একে অন্যকে দেখতে পাই, তার পেছনে ভূমিকা রয়েছে খুব সামান্য জিনিসেরই। কারণ জীবিত প্রাণীর শরীরের অধিকাংশ কোষই পানির চেয়ে এমন কিছু বেশি অস্বচ্ছ নয়।'

'ঈশ্বর!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন কেম্প। 'ঠিক তাই, ঠিক তাই! কাল রাতেই আমি সমুদ্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট, জেলি-ফিশ, এসবের কথা ভাবছিলাম!'

'আমার কথা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো! আজ থেকে ছ'বছর আগে—লণ্ডন ছেড়ে আসবার এক বছর পর—এ-সব ভাবনা-চিন্তাই ছিল আমার মাথা জুড়ে। কিন্তু বলিনি কাউকে। ভয়ঙ্কর অসুবিধার মধ্যে আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। আমার প্রফেসর অলিভার ছিল মহা ধড়িবাজ, অন্যের আইডিয়া চুরি করায় সিদ্ধহস্ত। আমার পেছনে ঘুর ঘুর করতো সর্বক্ষণ। আমিও কিছুতেই কিছু বলবো না, আমার কৃতিত্বের ভাগ নিতে দেব না তাকে। এভাবেই কাজ করে গিয়েছি। ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গিয়েছি আমার ফরমুলাকে বাস্তব একটি পরীক্ষায় রূপ দেবার পথে। কাউকে বলিনি কিছু, কারণ আমি ভেবেছি, আমার আবিষ্কার সবার সামনে হঠাৎ হাজির করে গোটা পৃথিবীকে চমকে দেব—বিখ্যাত হয়ে যাব রাতারাতি। কালো কণিকার ব্যাপারে কিছু কিছু অসম্পূর্ণ জিনিস সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় মগ্ন ছিলাম আমি। সেই সময় খুব আকস্মিকভাবে—একেবারে দৈবক্রমে শরীরতত্ত্বের একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করে ফেলি।'

'আচ্ছা।'

'রক্তের লাল উপাদান কী জিনিস, তোমার জানা আছে। রক্তের সমস্ত গুণাগুণ বজায় রেখে লাল কণিকাকে শাদা বর্ণহীন করে ফেলা যায়!'

প্রবল বিস্ময়ের ধাক্কায় কেম্পের গলা চিরে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

অদৃশ্য মানব উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট স্টাডির ভেতর পায়চারি শুরু করলো। 'অবাক হবারই কথা। সে-রাতের কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন অনেক রাত,—দিনের বেলায় নির্বোধ ছাত্রের দল হাঁ করে চেয়ে থাকতো বলে মাঝে মাঝে আমি রাত জেগে ভোর পর্যন্ত কাজ করতাম। গোটা জিনিসটা হঠাৎ খুব চমৎকারভাবে আমার মাথায় এসে যায়। একা ছিলাম আমি। ল্যাবরেটরিতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। লম্বা বাতিগুলো নিঃশব্দে উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সবসময় আমার একা থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে। হঠাৎ করেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি, যে-কোনো প্রাণীকে স্বচ্ছ রূপ দেয়া সম্ভব—অদৃশ্য করে ফেলা সম্ভব, শুধু কালো কণিকাগুলো ছাড়া! তারপরই একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল। আমি একজন অ্যালবিনো! নিজেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে ফেলতে পারি আমি! একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। হাতের কাজ ফেলে রেখে ল্যাবরেটরির বিশাল জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে রইলাম তারাভরা আকাশের দিকে। অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি আমি, মনে মনে বললাম আবার। ব্যাপারটা যাদুবিদ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে। সন্দেহের ছিটেফোঁটা রইলো না মনে—পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারলাম, অদৃশ্য একজন মানুষকে ঘিরে থাকবে কেমন রহস্য, কী অসীম ক্ষমতা থাকবে তার হাতে, কেমন স্বাধীন হবে

তার জীবন। অসুবিধা কিংবা খারাপ দিক আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না। একবার ভাবো, হতচ্ছাড়া দুঃস্থ কোণঠাসা এক ডেমন্‌স্ট্রেটর, প্রভিন্সিয়াল কলেজের একগাদা মূর্খকে পড়িয়ে যার জীবন কাটে, তার সামনে হঠাৎ এই অসামান্য সুযোগ। কেম্প, ওই অবস্থায় দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না হাত গুটিয়ে বসে থাকা। নতুন উদ্যম নিয়ে গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এরপর তিন বছর একনাগাড়ে কাজ করেছি আমি। পর্বতপ্রমাণ এক একটা সমস্যার সুরাহা করতে না করতেই হাজির হয়েছে আরেক সমস্যা। খুঁটিনাটি অজস্র জিনিসের মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারপর রয়েছে সেই জ্বালাতন, অনবরত ঘুর ঘুর করছে প্রফেসর অলিভার। এক প্রশ্ন তার : তোমার এই গবেষণার বিষয় প্রকাশ করছো কবে? সেই সঙ্গে আছে গণ্ডমূর্খ ছাত্রের দল! তিন বছর আমার কেটেছে এভাবে। এবং তিন বছর ব্যাপারটা গোপন রেখে, খাটুনি খেটে, জ্বালাতন স'য়ে শেষ পর্যন্ত কী দেখা গেল জানো? কাজ শেষ করা অসম্ভব,—অসম্ভব।'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলেন কেম্প।

'টাকা,' বলে জানালার কাছে এগিয়ে গেল অদৃশ্য মানব। বাইরের দিকে চেয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো সে। 'তখন বুড়োর সর্বনাশ করলাম আমি। আমার বাবাকে সর্বস্বান্ত করলাম।'

আবার ধীরে ধীরে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো অদৃশ্য মানব। 'টাকাটা তাঁর নিজের ছিল না। বন্দুকের গুলিতে আত্ম-হত্যা করেন তিনি।'

বিশ

জানালার ধারে দাঁড়ানো মুণ্ডহীন মূর্তিটির পিঠের ওপর চোখ রেখে কেম্প কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরলেন অদৃশ্য মানবের।

'তুমি ক্লান্ত,' তাকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আনতে বললেন কেম্প, 'সেখানে কিনা আমি বসে রয়েছি আর তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছো। বসো আমার চেয়ারটায়।'

গ্রিফিন এবং নিকটতম জানালার মাঝামাঝি একটা জায়গায় নিজে বসলেন কেম্প।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো অদৃশ্য মানব। তারপর আচমকা আবার শুরু করলো, 'ব্যাপারটা ঘটে যখন, তখন আমি চেসিলস্টো কলেজ ছেড়ে চলে এসেছি। গত ডিসেম্বর মাসের কথা সেটা। লণ্ডনের গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটের কাছে এক বস্তিতে যেমন-তেমন একটা বড়ো লজিং-হাউসের আসবাবপত্রহীন বিশাল একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। বাবার টাকা দিয়ে কেনা নানা যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামে ঘর ভরে উঠেছে, তর তর করে এগিয়ে চলেছে কাজ। প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এমন সময় ঘটলো সেই ট্র্যাজেডি—যদিও সে-মুহূর্তে ঘটনাটা নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়েছিল আমার কাছে।

'কবর দিতে গেলাম তাঁকে। তখনও আমার মন পড়ে রয়েছে

কাজের ভেতর। বাবার মিথ্যে কলঙ্ক ঘোচাবার কোনো চেষ্টাই করিনি আমি। শেষকৃত্যের কথা মনে আছে সব,—সস্তা কফিন-টানা গাড়ি, নামমাত্র অনুষ্ঠান, তুষারঢাকা পাহাড়ের কোল, ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস। প্রার্থনা পাঠ করেছিল থুথুড়ে, কালো, কুঁজো, সর্দিতে কাহিল এক বুড়ো—বাবার কলেজের এক পুরনো বন্ধু।

'মনে আছে, হেঁটে হেঁটে ফিরে এসেছিলাম শূন্য ঘরে। পথের দু'পাশে নড়বড়ে নোংরা ঘর-বাড়ি, ছন্নছাড়া একটা কালো ছায়া-মূর্তির মতো আমি চকচকে পিছল পেভমেণ্ট দিয়ে একলা হেঁটে চলেছি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি ঘিরে ছিল আমাকে, চারপাশের কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। বাবার জন্যে আমার একটুও দুঃখ হয়নি। নির্বোধ ভাবাবেগের শিকার মনে হয়েছিল লোকটাকে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে তাঁকে কবর দিতে যেতে হয়েছিল, সেটুকু ছাড়া ব্যাপারটার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়নি।

'কিন্তু হাই স্ট্রীট ধরে যাবার সময় ক্ষণিকের জন্যে আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার পুরনো জীবনে। দশ বছর আগে আলাপ ছিল যে-মেয়েটির সঙ্গে, তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। চোখা-চোখি হবার পর কিসের আকর্ষণে জানি না, ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম।—খুব সাধারণ ছিল মেয়েটি।···পুরনো দিনগুলো সব অলীক স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। নিজেকে একা মনে হয়নি আমার, মনে হয়নি পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে একধূসর নিরানন্দ জগতে এসে পড়েছি।

'নিজের ঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল বাস্তবে ফিরে এলাম। আমার প্রিয় পরিচিত যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে, পরীক্ষা-

নিরীক্ষার সমস্ত আয়োজন অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। বলতে গেলে আর কোনো বাধাবিঘ্ন নেই, শুধু খুঁটিনাটি কিছু পরিকল্পনা বাকি।

'সমস্ত জটিল প্রক্রিয়ার কথা তোমাকে পরে বলবো, কেম্প। এখন সেসব থাক। সেসবের বেশির ভাগ সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে রেখেছি ওই খাতাগুলোয়, কিছু কিছু জিনিস শুধু মুখস্থ করে রেখেছি। ···জোচ্চোরটাকে যে করেই হোক পাকড়াও করতে হবে। ফিরে পেতেই হবে খাতাগুলো।

'সবচেয়ে জরুরি কাজটা ছিল, যে-পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক কমাতে হবে সেটাকে এক ধরনের ইথারিয়াল কম্পনের দু'টি বিকিরণ-কেন্দ্রের মধ্যে স্থাপন করা। পরে পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বলবো তোমাকে। দু'টো ছোট ডায়নামোর দরকার হয়েছিল, সেগুলো চালাবার ব্যবস্থা করেছিলাম একটা শস্তা গ্যাস এন্‌জিনের সাহায্যে। প্রথম পরীক্ষাটা করেছিলাম এক টুকরো শাদা উলের কাপড়ের ওপর। পরমাশ্চর্য সেই দৃশ্যটার কথা কোনোদিন ভুলবো না। ব্যগ্র চোখে কাপড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে আছি। অধীর উত্তেজনায় কাঁপছি থরথর করে। চোখের সামনে নরম শাদা জিনিসটা উজ্জ্বল আলোর ঝলকের নিচে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। শূন্য জায়গাটায় হাত দিতেই আঙুলে ঠেকলো কাপড়ের টুকরোটা—যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। গায়ের ভেতর কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সেটা মেঝেতে। পরে আবার খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

'এরপর হলো আরেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পেছনে "মিঁয়াও" করে শব্দ হতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখি জানালার বাইরে সিস্টার্ণের ঢাকনির

ওপর বসে রয়েছে একটা শাদা বেড়াল। রোগা চেহারা, গায়ে প্রচুর ময়লা। ওটাকে দেখামাত্র মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সব তৈরি তোমার জন্যে, বললাম মনে মনে। উঠে গিয়ে জানালা খুলে আস্তে করে ডাকলাম। গরগর করতে করতে ভেতরে চলে এলো বেড়ালটা। বেচারা উপোস করছিল, একটু দুধ দিলাম খেতে। ঘরের কোণে কাবার্ডের মধ্যে আমার সব খাবার থাকতো। দুধটুকু খেয়ে বেড়ালটা সারা ঘর শুঁকে বেড়াতে লাগলো। বোঝা গেল, আরাম করে ঘুমোবার জন্য জায়গা খুঁজছে। অদৃশ্য কাপড়ের টুকরোটা বেশ একটু ঘাবড়ে দিয়েছিল তাকে—রগড় দেখতে যদি! আমার ট্রাক্‌ল্-বেডের বালিশের ওপর বেড়ালটার জায়গা করে দিলাম। মাখন খেতে দিয়ে সেই সুযোগে গায়ের ময়লা সাফ করে নিলাম।'

'তারপর পরীক্ষা চালালে বেড়ালটার ওপর?'

'হ্যাঁ, পরীক্ষা চালালাম। কিন্তু বেড়ালকে ওষুধ খাওয়ানো সহজ কথা নয়, কেম্প।—এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কাজ হয়নি।'

'কাজ হয়নি!'

'দু'টি ক্ষেত্রে। নখ এবং ওই পিগমেন্ট জিনিসটা গোল বাধালো।—কোন্ পিগমেন্ট?—বেড়ালের চোখের ভেতরের দিকে থাকে। দেখোনি?'

'টেপিটাম?'

'হ্যাঁ, টেপিটাম। থেকে গিয়েছিল জিনিসটা। রক্ত বিরঞ্জনের ওষুধ প্রয়োগ করে এবং আরো কয়েকটি কাজ সেরে নিয়ে আফিম খাইয়ে ঘুমন্ত বেড়ালটাকে বালিশসুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলাম যন্ত্রের ওপর। আস্তে আস্তে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল সমস্ত শরীর। শুধু ছোট্ট ভুতুড়ে চোখদুটো দেখা যেতে লাগলো।'

'তাজ্জব ব্যাপার।'

'সব ব'লে বোঝাতে পারবো না আমি। কাপড়ে জড়িয়ে ক্ল্যাম্পে আটকে রেখেছিলাম বেড়ালটাকে—কাজেই হাতছাড়া হবার ভয় ছিল না। কিন্তু একসময় আচমকা জেগে উঠে ভয়ঙ্কর মিউ মিউ করতে শুরু করলো। তখনও শরীরটা আবছামতন চোখে পড়ছে। ঠিক তখুনি ঘা পড়লো দরজায়। নিশ্চয় নিচতলার বুড়ি। তার সন্দেহ ছিল, আমি জ্যান্ত প্রাণী কাটা-ছেঁড়া ক'রে গবেষণা করি। সবসময় মদে চুর হয়ে থাকতো সে, দুনিয়ায় আপনজন বলতে ছিল ওই শাদা বেড়ালটা। চট্ করে খানিকটা ক্লোরোফর্ম নিয়ে বেড়ালটার নাকে লাগিয়ে দিলাম। থেমে গেল ডাক।

'দরজা খুলতেই বুড়ি জিজ্ঞেস করলো, "বেড়ালের ডাক শুনলাম মনে হলো! আমার বেড়াল?" খুব বিনীতভাবে আমি বললাম, "এখানে নয়।" তবু সন্দেহ গেল না বুড়ির। আমার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা দেখে নিতে চেষ্টা করলো। আশ্চর্য হয়ে গেল সে, সন্দেহ নেই।—খোলা দেয়াল, পর্দাছাড়া জানালা, ট্রাক্‌ল্-বেড। সেই সঙ্গে চলছে গ্যাস এন্‌জিন, হিস্ হিস্ শব্দ তুলে জ্বলছে উজ্জ্বল দু'টি বিকিরণ-বিন্দু। বাতাসে ক্লোরোফরমের হালকা ঝাঁঝালো গন্ধ। সব দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত বুড়িকে ফিরে যেতেই হলো।'

'কতোটা সময় লাগলো বেড়ালটা পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে কেম্প প্রশ্ন করলেন।

'তিন-চার ঘণ্টা। সবচেয়ে শেষে গেল হাড়গোড়, পেশীতন্তু, চর্বি এবং গায়ের রঙিন লোমের ডগা। আর চোখের পেছনের ওই শক্তমতো ঝকমকে সাতরঙা পদার্থটা একেবারেই গেল না। রয়ে গেল নখগুলোও।

'অনেকক্ষণ আগেই রাত নেমেছে বাইরে। গ্যাস এন্‌জিন বন্ধ করে বেড়ালটাকে ক্ল্যাম্প থেকে ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে গায়ে চড় দিলাম। দেখলাম তখনও জ্ঞান ফেরেনি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমন্ত বেড়ালটাকে অদৃশ্য বালিশের ওপর ওভাবেই ফেলে রেখে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। ঘুম এলো না। বিনিদ্র শুয়ে রইলাম। এলোমেলো অর্থহীন নানা চিন্তা চলতে লাগলো মাথার ভেতরে। এক্সপেরিমেন্টটা আগাগোড়া বার বার ভেবে দেখলাম। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে যেতে লাগলাম, আমার চারপাশের সব-কিছু আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে, একে একে সব অদৃশ্য হতে হতে একসময় পায়ের নিচের মাটিও বিলীন হয়ে গেল—আমি তলিয়ে গেলাম অতল গহ্বরে।···

'রাত দু'টোর দিকে বেড়ালটা সারা ঘর জুড়ে মিউ মিউ করে ঘুরতে শুরু করলো। প্রথমে কথাবার্তা বলে ডাকাডাকি থামাতে চেষ্টা করলাম। শেষে ভাবলাম ঘর থেকে বের করে দিই। বেশ মনে আছে, আলো জ্বেলে কেমন ছমছম করে উঠেছিল গা—সবুজ চকচকে গোল চোখদু'টো দেখা যাচ্ছিল শুধু, চারপাশ ফাঁকা। দুধ দিতে পারলে হতো, কিন্তু ছিল না দুধ। থামলো না বেড়ালটা, দর-জার দিকে মুখ করে অনবরত মিউ মিউ করে চললো। জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেবো মনে করে ধরতে গেলাম, ধরা গেল না। ঘরময় ডাকাডাকি করে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত জানালা খুলে জোরে তাড়া দিলাম। মনে হলো বেরিয়ে গেল বেড়ালটা। আর কখনো সেটাকে দেখিনি।

'তারপর—ঈশ্বর জানেন কেন—বাবার সেই শেষকৃত্যের কথা মনে হতে লাগলো আমার,—সেই তুষারে ঢাকা পাহাড়ের পাদদেশ,

ঘোড়ো বাতাসের আর্তনাদ আচ্ছন্ন করে রাখলো আমার সমস্ত চেতনা। এমনি করে ভোর হয়ে গেল। ঘুমোনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। দরজায় চাবি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এলোমেলো।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, অদৃশ্য একটা বেড়াল এখন ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছেমতো?' বললেন বিস্মিত কেম্প।

'মারা না পড়ে গিয়ে থাকে যদি,' অদৃশ্য মানব বললো। 'অবাক হবার কী আছে?'

'না, না, ঠিক আছে, বলে যাও,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কেম্প।

'খুব সম্ভব মারাই পড়েছে বেড়ালটা,' অদৃশ্য মানব বললো। 'ওই অবস্থায় অন্তত চারদিন বেঁচে ছিল, জানি। চার দিন পর দেখেছিলাম, গ্রেট টিচফিল্ড স্ট্রীটের এক জায়গায় নর্দমার ঝাঁঝরির নিচ থেকে বেড়ালের ডাক ভেসে আসতে শুনে একদল লোক জড়ো হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা।'

প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে থাকলো অদৃশ্য মানব। তারপর সহসা শুরু করলো আবার।

'খুব পরিষ্কারভাবে মনে আছে আমার সেই সকালটা। ঘোরের মধ্যে নিশ্চয় গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীট পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। অ্যাল-বেনি স্ট্রীটের ব্যারাকগুলোর কথা মনে আছে, ঘোড়সওয়ার সৈন্য-দের বেরোতে দেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত একসময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম প্রিমরোজ হিলের চূড়ায়। সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝলাম, সাংঘাতিক অসুস্থ আর কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। জানুয়ারি মাসের উজ্জ্বল ঝকঝকে দিন। তখনো বরফ পড়া শুরু হয়নি। আমার ক্লান্ত

মস্তিষ্ক সমস্ত পরিস্থিতি ভালোভাবে খতিয়ে দেখছে, চেষ্টা করছে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করতে।

'ভেবে অবাক লাগলো আমার, এত করে চেয়েছি যা এখন তা হাতের মুঠোয় পেয়েও সিদ্ধান্ত নেয়াটা কেমন কঠিন মনে হচ্ছে। আসলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। একনাগাড়ে প্রায় চার বছর ধরে প্রচণ্ড কাজের ধকল সইবার পর আমার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল প্রায়। খুব নির্বিকার লাগছিল নিজেকে। আবিষ্কারের প্রচণ্ড নেশায় বুড়ো বাবাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও আমি বিচলিত হইনি। অথচ এখন চেষ্টা করেও গোড়ার দিকের সেই উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে পারছি না কিছুতেই। যেন কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনে হলো, এ-অবস্থা ক্ষণস্থায়ী—অতিরিক্ত খাটুনি আর ঘুমের অভাবই এর জন্যে দায়ী। ওষুধপত্র খেলে কিংবা বিশ্রাম নিলেই আবার বল ফিরে আসবে শরীরে ও মনে।

'এরপর শুধু এই চিন্তাটাই মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলো যে, কাজটা শেষ করতে হবে। এবং শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। নিচে তাকিয়ে দেখলাম, পাহাড়ের কোলে খেলা করছে শিশুরা। মেয়েরা তাদের দেখছে। মনে মনে আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, অদৃশ্য একজন মানুষ এই পৃথিবীতে কেমন অকল্পনীয় সব সুবিধা ভোগ করতে পারে। একটু পরে গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিছু খাবার মুখে দিয়ে স্ট্রিকনিনের একটা কড়া ডোজ নিয়ে কাপড়চোপড়সুদ্ধ অগোছালো বিছানায় শুয়ে পড়লাম। স্ট্রিকনিনের তুলনা হয় না, কেম্প, নিমেষে দূর করে দেয় সমস্ত জড়তা ও অবসাদ।'

'খুব খারাপ জিনিস,' বললেন কেম্প। 'বোতলভর্তি আদিম বন্যতা যেন।'

'যখন ঘুম ভাঙলো তখন টগবগ করে ফুটছি আমি। মেজাজটাও হয়ে উঠেছে ভয়ানক। বুঝতে পেরেছো?'

'জিনিসটা চেনা আছে আমার।'

'এমন সময় কে যেন দরজায় ঘা দিলো। খুলে দেখি, বাড়িওয়ালা। লোকটা পোলিশ ইহুদি। গায়ে লম্বা ধূসর কোট, পায়ে চটিজুতো। চোখমুখ লাল করে সে বললো, তার নিশ্চিত ধারণা, রাতভর একটা নিরীহ বেড়ালের ওপর আমি অত্যাচার করেছি। বুঝলাম, বুড়ি বেশ ফলাও করে প্রচার করেছে গল্পটা। সব ঘটনা খুলে বলবার জন্য চাপ দিতে থাকলো বাড়িওয়ালা। বললো, জ্যান্ত প্রাণী কাটা-ছেঁড়া করে গবেষণা চালানো এদেশে আইনের চোখে লাংঘাতিক অপরাধ—নিজেও সে এর জন্যে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। বেড়া-লের কথা আমি অস্বীকার করলাম। এরপর সে তুললো গ্যাস এনজিনের কথা, সেটার কাঁপুনি বাড়ির সব জায়গা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কথাটা সত্যি, অস্বীকার করবার উপায় নেই। আস্তে করে আমার পাশ কাটিয়ে লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। তারপর তার জার্মান-সিলভারের চশমার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে সবকিছু নিরীক্ষণ করতে শুরু করলো। হঠাৎ ভয় ঢুকে গেল আমার মনে। গোপন জিনিস কিছু হয়তো ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাড়া-তাড়ি যন্ত্রপাতি আড়াল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। তাতে লোকটার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল।—কী করছি আমি? কেন সবসময় একা একা থাকি, সবকিছু ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি? যা করছি সেটা কি আইনসঙ্গত? কাজটা কি বিপজ্জনক? স্বাভাবিক

ভাড়ার অতিরিক্ত কিছুই তো আমি দিই না। এই কুখ্যাত পাড়ায় তার বাড়ি বরাবর সুনাম নিয়ে টিকে আছে।—অবিরাম বকে যেতে লাগলো লোকটা। হঠাৎ আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চিৎকার করে বললাম ওকে বেরিয়ে যেতে। আপত্তি করলো সে, ক্ষেপে গিয়ে তার প্রবেশাধিকার নিয়ে বুলি আওড়াতে শুরু করলো। ঝট্ করে আমি ওর কলার চেপে ধরলাম, ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল খানিকটা। এক ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্যাসেজের ভেতর গিয়ে পড়লো। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিলাম আমি বসে পড়লাম কাঁপতে কাঁপতে

'খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করলো লোকটা। কানে তুললাম না। কিছুক্ষণ পর ও চলে গেল।

'কিন্তু অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠলো এ-ঘটনার পর কী করবে লোকটা,বুঝতে পারছিলাম না। কতদূর কী করবার ক্ষমতা রাখে সে, তা-ও আমার জানা ছিল না। নতুন অ্যাপার্টমেণ্ট খুঁজে নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে,তাছাড়া অতো টাকাও নেই হাতে। সব মিলিয়ে এখন আছে বিশ পাউণ্ড, তারও প্রায় সবটাই রাখা আছে ব্যাঙ্কে।

'অদৃশ্য হয়ে যাবো! দুর্নিবার হয়ে উঠলো ইচ্ছেটা। তারপর হয়তো তল্লাশী চলবে, তছনছ হবে আমার ঘর কিন্তু এখন এই চূড়ান্ত মুহূর্তে সব ফাঁস হয়ে যাবে—লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে আমার কাজ, তা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না। ক্ষিপ্ত, তৎপর হয়ে উঠলাম আমি। নোট লেখার তিনখানা খাতা এবং চেকবই নিয়ে দ্রুত নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। কাছাকাছি পোস্ট অফিস থেকে সেগুলো নিজের নামে পাঠিয়ে দিলাম গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে ডাকবিভাগের একটি বিশেষ দপ্তরের ঠিকানায়, যেখান থেকে প্রাপক হিসেবে

আমি জিনিসগুলো পরে সংগ্রহ করে নিতে পারবো। ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকে দেখি, বাড়িওয়ালা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। দরজা বন্ধ করবার শব্দ পেয়েছিল সে, অনুমান করলাম। পেছন থেকে দুমদাম পা ফেলে আমি উঠে আসতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে ল্যাণ্ডিংয়ের একপাশে সরে গেল সে—দৃশ্যটা দেখলে তুমি না হেসে পারতে না। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রক্তচক্ষু মেলে তাকালো সে আমার দিকে। ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম সারা বাড়ি কাঁপিয়ে। পা টেনে টেনে ওপরে উঠে এলো লোকটা। বেশ বুঝতে পারলাম, খানিকক্ষণ ইতস্তত করলো আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, তারপর নেমে গেল নিচে। দেরি না করে আমি কাজে লেগে গেলাম।

'সন্ধ্যারাতের ভেতরেই সব কাজ সারা হয়ে গেল। রক্ত বিরঞ্জনের ওষুধের অস্বস্তিকর প্রভাবে বসে বসে ঝিমোচ্ছি, এমন সময় দরজায় পর পর বেশ কয়েকটা ঘা পড়লো। আমি সাড়া দেবার আগেই থেমে গেল শব্দটা, পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। একটু পর আবার শোনা গেল পায়ের আওয়াজ, দরজায় ঘা পড়তে শুরু করলো আবার। দরজার নিচ দিয়ে কিছু একটা ভেতরে ঠেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। একটা নীল কাগজ। মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। উঠে গিয়ে একটানে হাট করে খুলে ফেললাম দরজা। গর্জে উঠলাম, "কী চাই?"

'দেখলাম বাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বাড়ি ছাড়বার নোটিস জাতীয় কিছু একটা। সেটা বাড়িয়ে ধরলো আমার সামনে। আমার হাতের দিকে এক নজর চেয়ে ঝট্ করে চোখ তুলে তাকালো সে আমার মুখের দিকে।

'বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লোকটা এক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার হাঁ-করা মুখের ভেতর থেকে। হাত থেকে একসঙ্গে খসে পড়লো মোমবাতি আর কাগজখানা। অন্ধের মতো ছুটলে সে অন্ধকার প্যাসেজ বেয়ে সিঁড়ির দিকে। দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিয়ে আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারলাম লোকটার আতঙ্কের কারণ। একেবারে শাদা হয়ে গেছে আমার মুখ—শ্বেতপাথরের মতো শাদা।

'কিন্তু পুরো ব্যাপারটার ভয়াবহতা তখনও বুঝিনি কতোটা যন্ত্রণা সইতে হবে, আমার জানা ছিল না। রাতভর চললো অসহ্য যন্ত্রণার নিষ্পেষণ। ব্যথায়, অস্বস্তিতে কয়েকবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। মনে হলো, গায়ের চামড়ায় আগুন ধরে গেছে—সমস্ত শরীরে জ্বলছে আগুন। তবু দাঁতে দাঁত চেপে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। বেড়ালটা কেন ক্লোরোফর্ম না দেয়া পর্যন্ত অমন চিৎকার করছিল সেটা এবার টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। ভাগ্য ভালো, একা ছিলাম আমি—পরিচারকজাতীয় কেউ ছিল না। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, অনবরত গোঙানি বেরিয়েছে গলা দিয়ে, একা একা কথা বলেছি। তবু ভেঙে পড়িনি। কখন যেন পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলাম জানি না। এক সময় অবসন্ন, নিস্তেজ অবস্থায় জেগে উঠলাম অন্ধকারে।

'যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে। এবার আসল কাজের শুরু। একবার ভাবলাম, হয়তো স্বেচ্ছায় আমি নিজের মৃত্যু ডেকে আনছি। তবু পরোয়া করলাম না। সেই আশ্চর্য ভোরের কথা কখনো ভুলবো না আমি। গ্যাস এনজিনের গুঞ্জন এবং একটানা যান্ত্রিক হিস্‌হিস্‌ শব্দের ভেতর পাথরের মতো অনড় পড়ে আছি। দু'পাশের দু'টি

তীব্র উজ্জ্বল বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঝকঝকে শাদা আলোক-রশ্মি। অদ্ভুত এক আতঙ্ক নিয়ে একসময় দেখলাম, ধোঁয়াটে কাচের মতো মনে হচ্ছে আমার দু'হাত। একঘণ্টা দু'ঘণ্টা করে সময় এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে আরো স্বচ্ছ, আরো হালকা হয়ে উঠলো আমার হাত। শেষ পর্যন্ত হাতের ভেতর দিয়ে ঘরের এলোমেলো জিনিস-পত্র পরিষ্কার চোখে পড়তে লাগলো। এমনকি, আবিষ্কার করলাম, চোখ বুজলেও চোখের স্বচ্ছ পাতা ভেদ করে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। কাচের মতো হয়ে গেছে আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হাড় এবং শিরা-উপশিরা আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেছে। সবচেয়ে শেষে অদৃশ্য হলো সরু সরু শাদা স্নায়ুর জাল। দাঁতে দাঁত পিষে একেবারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম আমি। সবশেষে রয়ে গেল নখের বিবর্ণ শাদা মরা ডগা, আর হাতের আঙুলে লেগে থাকা এসিডের বাদামি ছোপ।

'কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। অদৃশ্য পা নিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রথমে শিশুর মতো অসহায় মনে হলো নিজেকে। দুর্বল লাগছে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। দাড়ি কামাবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে তাকিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর চোখে পড়লো, চোখের রেটিনার পেছনে ফিকে হয়ে আসা পিগমেন্ট তখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি—কুয়াশার চেয়েও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

'শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে অদৃশ্য শরীরটাকে আবার টেনে নিয়ে গেলাম যন্ত্রের কাছে। যেটুকু বাকি ছিল, সেরে নিলাম।

'শুয়ে পড়লাম বিছানায়। আলো থেকে চোখ আড়াল করবার জন্য চোখের ওপর চাদর টেনে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

'দুপুরের দিকে দরজায় আবার নক্ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। শরীরে তখন কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে। উঠে বসে কান পেতে শুনলাম, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে পড়লাম আমি। তারপর যতটা নিঃশব্দে সম্ভব যন্ত্রপাতি-গুলো টুকরো টুকরো করে খুলে ফেললাম। সারা ঘরে ছড়িয়ে রাখ-লাম সেগুলো। কোন্‌টা কোথায় জুড়তে হবে কেউ যাতে বুঝতে না পারে তার জন্যেই এ ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে আবার জোরে জোরে ঘা পড়তে শুরু করেছে দরজায়, সেইসঙ্গে ডাকাডাকিও চলছে। প্রথমে শোনা গেল বাড়িওয়ালার গলা, তারপর আরো দু'জনের। একটু সময় করে নেবার জন্যে আমি সাড়া দিলাম। অদৃশ্য কাপড়ের টুকরো ও বালিশটা হাতে পেয়ে জানালা খুলে সে-দু'টো ছুঁড়ে দিলাম সিস্টার্নের ঢাকনার ওপর। ঠিক জানালা খোলার মুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কা পড়লো দরজায়। গুঁতিয়ে তালা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে, বুঝলাম। কয়েকদিন আগে আমি শক্ত একটা ছিটকিনি লাগিয়েছিলাম দরজায়। ছিটকিনিটা হজম করে নিলো ধাক্কা। অস্থির হয়ে উঠলাম আমি, সেইসঙ্গে রাগে জ্বলে গেল সর্বশরীর। কাঁপতে কাঁপতে ত্রস্তহাতে সারতে লাগলাম কাজ।

'কাগজপত্র, খড়কুটো, প্যাকিং পেপার এবং এ-ধরনের যা-কিছু পেলাম হাতের কাছে সব ঘরের মাঝখানটায় এনে জমা করে গ্যাস ছেড়ে দিলাম। দরজার ওপর দমাদম ঘা পড়ছে তখন। এদিকে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। আক্রোশে মাথা কুটতে লাগ-লাম দেয়ালের ওপর। আর সময় নেই। গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। সমস্ত জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে জানালা গলে চলে গেলাম সিস্টার্নের ঢাকনার ওপর। খুব আস্তে নামিয়ে দিলাম জানালার শাসি। কী

ঘটে দেখবার জন্য চুপচাপ বসে রইলাম। রাগে থর থর করে কাঁপছি। তবে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না জানি। অবিরাম আঘাতের ফলে শেষে চিড় ধরে গেল দরজায়। পরের মুহূর্তে ছিটকিনির এক মাথা উঠে এলো কাঠের ওপর থেকে। এক ঝট্‌কায় খুলে গেল দরজা। দেখতে পেলাম, বাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে তার দুই সৎ ছেলে, তেইশ-চব্বিশ বছরের গাট্টাগোট্টা দুই যুবক। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে নিচতলার সেই ডাইনি বুড়ি।

'বুঝতেই পারছো, ঘরের ভেতর আমাকে না দেখে কেমন হত-বাক হয়ে গেল ওরা। বাড়িওয়ালার দুই ছেলের একজন দৌড়ে এলো জানালার কাছে। তাড়াতাড়ি শার্সি তুলে উঁকি দিলো বাইরে। তার গোল গোল চোখ, পুরু ঠোঁট আর দাড়িসমেত মুখটা আমার মুখের ঠিক এক ফুটের মধ্যে এসে পড়লো। কদাকার সেই মুখে একটা ঘুসি আরেকটু হলেই বসিয়ে দিয়েছিলাম, বহু কষ্টে বশে রাখলাম মুঠি-পাকানো হাতটাকে। সোজা আমার শরীরের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইলো গর্দভটা। বাকি সবাইও এসে তার সঙ্গে যোগ দিলো। বুড়ো গিয়ে উঁকি দিলো বিছানার নিচে। তারপর সবাই একসঙ্গে দৌড়ে গেল কাবার্ডের দিকে। দুর্বোধ্য ইডিশ আর ককনিতে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিলো ওরা। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছুলো : আসলে আমি সাড়া দিইনি ভেতর থেকে, ওরা ভুল শুনেছে। বুড়ি ঘরের ভেতর এসে সন্দিগ্ধ চোখে বেড়ালের মতো এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে, বুঝতে চেষ্টা করছে অদ্ভুত এই ধাঁধা। জানালার বাইরে বসে হতভম্ব চারজনের দিকে তাকিয়ে আমি তখন রাগের বদলে অসাধারণ এক উল্লাস অনুভব করছি

'বুড়োর কথা যতদূর বুঝতে পারলাম তাতে মনে হলো, বুড়ির

সঙ্গে সে একমত যে, আমি একজন ভিভিসেকশনিস্ট—জ্যান্ত প্রাণীর ওপর গবেষণা চালাই। কিন্তু ছেলেদু'টোর বিশ্বাস, আমার কারবার বিদ্যুৎ নিয়ে—প্রমাণ হিসেবে তারা ডাইনামো আর রেডিয়েটরগুলো দেখালো। সবাই ভয় পাচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে আমি আবার এসে পড়তে পারি। বুড়ি আবার দেখে এলো কাবার্ডের ভেতরটা, তারপর উঁকি দিয়ে দেখলো বিছানার নিচে। ছেলেদের একজন চিমনির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওপরে। এমন সময় ল্যাণ্ডিংয়ের ওপর আরেকজন লোক এসে দাঁড়ালো। এখানকারই বাসিন্দা, ফলমূল-শাকসবজির ব্যবসা করে, উল্টোদিকের ঘরটায় থাকে এক কসাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে। সে-ও এসে যোগ দিলো অন্য সবার সঙ্গে।

'একটা আশঙ্কা উঁকি দিলো আমার মনে। শিক্ষিত চালাক-চতুর কারো হাতে যদি রেডিয়েটরগুলো পড়ে, সে হয়তো অনেককিছুই ঠিক ঠিক অনুমান করে নিতে পারবে। সুযোগ বুঝে আমি আবার নিঃশব্দে জানালা গ'লে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ভারি ডাইনামোদু'টো একটার ওপর আরেকটা দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। ওপরেরটা কাত করে ঠেলে ফেলে গুঁড়িয়ে দিলাম রেডিয়েটরদু'টো। চমকে ফিরে তাকালো সবাই। কী করে উল্টে পড়লো ডাইনামো, তাই নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। আমি দরজা দিয়ে শাঁৎ করে বেরিয়ে পা টিপে টিপে নেমে গেলাম নিচে

'নিচতলায় একটা বসবার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে বসে রইলাম। একটু পরে সবাই নিচে নেমে এলো। জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্ক তখনও পুরোদমে চলছে। ভয়ঙ্কর কিছুই আবিষ্কার করতে না পেরে সবাই একটু হতাশ হয়েছে বলে মনে হলো। এক বাক্স দেশলাই যোগাড় করে আমি আবার সন্তর্পণে ওপরে উঠে গেলাম। আগুন ধরিয়ে

দিলাম খড়কুটো আর কাগজপত্রের গাদায়। সবগুলো চেয়ার, বিছানা-বালিশ, কাপড়চোপড় এনে ফেললাম আগুনে। রাবারের একটা নলের সাহায্যে গ্যাসের রাস্তা করে দিলাম আগুন পর্যন্ত। শেষ-বারের মতো ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।'

'আগুন ধরিয়ে দিলে বাড়িতে!' চোখ বড়ো বড়ো করে তাকা-লেন কেম্প।

'হ্যাঁ, আগুন ধরিয়ে দিলাম। আমার কাজকর্মের সব চিহ্ন মুছে ফেলার আর কোনো উপায় ছিল না।—এরপর আর ভাবনা রইলো না। বাড়ির সামনের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। নিঃশব্দে সেটা খুলে বেরিয়ে এলাম খোলা রাস্তায়। অদৃশ্য অস্তিত্বের কী সীমাহীন সুবিধা, তখন তা মাত্র বুঝতে শুরু করেছি। মাথার ভেতর গিজগিজ করছে অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য হাজারো পরিকল্পনা।'

একুশ

'সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় অপ্রত্যাশিত একটা অসুবিধা বোধ করছিলাম। অদৃশ্য পা-দু'টো ঠিকমতো ফেলতে পারছিলাম না কিছুতেই। দু'বার তো হোঁচটই খেলাম। অদৃশ্য আঙুলে দরজার ছিটকিনি ধরতে গিয়েও বেশ খানিকক্ষণ হাতড়াতে হয়েছিল। অবশ্য সমতল জায়গায় এসে পায়ের দিকে না তাকিয়ে হেঁটে দেখলাম মোটামুটি ভালোই চলতে পারছি।

'মনে তখন প্রচণ্ড উল্লাস। পায়ের তলায় নরম প্যাড বেঁধে একজন স্বাভাবিক মানুষ অন্ধদের রাজ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ালে তার যেমন অনুভূতি হবে, অনেকটা সে-রকম লাগছিল আমার। চারপাশের লোকজনকে নিয়ে তামাশা করবার, যাকে ইচ্ছে তাক্ লাগিয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হাতে এর-ওর পিঠ্ চাপড়ে দিচ্ছি, খোঁচা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছি কারো মাথার হ্যাট। ফুর্তি লাগছে খুব।

'গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে মাত্র পা দিয়েছি, এমন সময় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এসে লাগলো আমার পেছনে, ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো কী যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঝুড়িভর্তি সোডা-ওয়াটারের বোতল নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন—অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ঝুড়ির দিকে। বেশ ব্যথা পেয়েছিলাম, কিন্তু লোকটার অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না—হেসে উঠলাম হো হো

করে। "শয়তান ঢুকেছে ঝুড়িতে," বলে এক হ্যাঁচকা টানে ঝুড়িটা ছিনিয়ে নিলাম তার বিবশ হাত থেকে, তুলে ধরলাম শূন্যে।

'হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে এক গর্দভ কোচোয়ান ঝুড়িটা ধরতে গেল হাত বাড়িয়ে। তার বাড়ানো আঙুলগুলোর তীব্র খোঁচা এসে লাগলো আমার কানের নিচে। গোটা ঝুড়িটা ঝুপ্ করে ছেড়ে দিলাম তার মাথার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আশপাশের সমস্ত দোকান থেকে লোকজন ছুটে এলো। একের পর এক থেমে পড়তে লাগলো গাড়ি-ঘোড়া। কী ভুল করেছি আমি, বুঝতে পেরে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো। তাড়াতাড়ি পিছু হটে একটা দোকানের জানালার সামনে চলে গেলাম। জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ভিড় যে-হারে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে অবিলম্বে কোণঠাসা হয়ে পড়বো আমি, ধরা পড়ে যাবে আমার অস্তিত্ব। তাড়াতাড়ি এক কসাই ছোকরাকে ঠেলে সরিয়ে কোচোয়ানের চার চাকার গাড়ির পেছনে চলে গেলাম। ভাগ্যিস কে ধাক্কা দিলো দেখবার জন্যে ছোকরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি। শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলো কী করে, আমার জানা নেই। তখন মনের ভেতর ভয় ঢুকে পড়েছে। কোনো দিকে না চেয়ে সোজা রাস্তা পার হয়ে গিয়ে পড়লাম অক্সফোর্ড স্ট্রীটের সান্ধ্য জনারণ্যের ভেতরে।

'লোকের ভিড়ে মিশে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে ভিড়টা একটু বেশি ঘন হওয়ায় তেমন সুবিধা করতে পারলাম না। দেখতে দেখতে অনেকগুলো জুতো মাড়িয়ে দিলো আমার পা। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গিয়ে গাটার ধরে হাঁটতে লাগলাম। খালি পায়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। পেছন থেকে একটা

জুড়িগাড়ি আসছিল গুঁড়ি মেরে, লক্ষ্য করিনি। গাড়ির সামনের লম্বা দণ্ড সজোরে এসে গুঁতো মারলো আমার শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচে। চামড়া ছড়ে গেল বেশ খানিকটা। টলতে টলতে একপাশে সরে দাঁড়াতেই দেখি,গোড়ালির কাছে এসে পড়েছে একটা প্যারাম-বুলেটর। সেটার ধাক্কা বাঁচিয়ে ছিটকে চলে এলাম আবার জুড়ি-গাড়ির পেছনে। মন্থর গাড়িটার পেছনে সেঁটে গিয়ে সেটার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে লাগলাম। আমার সাধের অ্যাডভেঞ্চারের এই আকস্মিক দুর্গতিতে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছি। কাঁপছি রীতি-মতো।

কাঁপছি শুধু ভয়ে কিংবা উত্তেজনায় নয়, শীতেও। জানুয়ারি মাসের পড়ন্ত বেলা। রাস্তার হালকা কাদার আস্তরণ জমে যেতে শুরু করেছে। আমি আপাদমস্তক নগ্ন। নিজের বোকামির কথা ভাবলে এখন অবাক লাগে, আগে একবারও মনে হয়নি, অদৃশ্য হই আর যা-ই হই, আবহাওয়ার প্রভাব এড়াবার ক্ষমতা আমার নেই।

'হঠাৎ একটা চমৎকার বুদ্ধি এলো মাথায়। দৌড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে উঠে বসলাম গাড়িতে। গাড়ি ধীরগতিতে এগিয়ে চললো অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে। শীতে কাঁপছি থর থর করে, ভয়ে আর ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, নাক টানছি ঘন ঘন—অচিরেই সর্দিতে ধরবে মনে হচ্ছে। পিঠের ব্যথাটা বেড়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। গাড়ি টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ছাড়িয়ে গেল। দশ মিনিট আগে যে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম তার সঙ্গে আমার এখনকার মানসিক অবস্থার কতো তফাৎ! অদৃশ্য হওয়ার সুখ অনুভব করছি হাড়ে হাড়ে। এখন একমাত্র চিন্তা, বর্তমান বিপ-দের হাত থেকে কী করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

'গাড়ি মাডি'স্ লাইব্রেরী পার হয়ে যাবার সময় হলুদ লেবেল-আঁটা পাঁচ-ছ'খানা বই হাতে এক লম্বা মহিলা হাত তুলে কোচোয়ানকে থামতে বললো। মহিলা গাড়িতে উঠে বসবার ঠিক আগের মুহূর্তে কোনরকমে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম আমি। পালাতে গিয়ে একটা রেলওয়ে ভ্যানের নিচে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম ব্লুম্স্বেরি স্কোয়ারের দিকে। উদ্দেশ্য, যাদুঘর ছাড়িয়ে উত্তরে নির্জন এলাকায় গিয়ে ঢুকবো। ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড় হয়ে এসেছে। অদ্ভুত সেই পরিস্থিতিতে এতই মুষড়ে পড়েছি যে দৌড়ুতে দৌড়ুতে রীতিমতো কাতরাচ্ছি আমি। স্কোয়ারের উত্তর দিকের কোণে এসে পৌঁছুতেই ছোট একটা শাদা কুকুর ফারমাসিউটিক্যাল সোসাইটির অফিস থেকে বেরিয়ে নাক নিচু করে সোজা তেড়ে এলো আমার দিকে।

'ব্যাপারটা আগে কখনো ভেবে দেখিনি, মানুষের কাছে যেমন চোখ, কুকুরের কাছে ঠিক তেমনি হচ্ছে তার নাক। মানুষ যেমন করে মানুষের চলাচল চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কুকুর তেমন নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে মানুষের অস্তিত্ব পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে। জানোয়ারটা ঘেউ ঘেউ করে এমন লাফালাফি শুরু করলো যে আমার বুঝতে বাকি রইলো না আমার অস্তিত্ব ওর কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। বার বার পেছনে ফিরে তাকাতে তাকাতে গ্রেট রাসেল স্ট্রীট পার হয়ে মন্টেগ্যু স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর যেতেই জোরালো বাজনার শব্দ কানে এলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, লাল পোশাক পরা একদল লোক রাসেল স্কোয়ারের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। তাদের সামনে স্যালভেশন আর্মির ব্যানার। সমস্ত রাস্তা এবং পেভমেন্ট দখল করে তারস্বরে গান

গাইতে গাইতে আসছে ওরা। ওদের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে যাওয়া অসম্ভব মনে হলো আমার কাছে। পেছন ফিরে পরিচিত জায়গা ছেড়ে আরো দূরে সরে যাবো, সে-সাহসও হচ্ছে না। বেশি ভাববার সময় নেই। যাদুঘরের রেলিঙের দিকে মুখ করা একটি বাড়ির শাদা সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গেলাম। ভিড়টা পার হয়ে যাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। ব্যাণ্ডের শব্দ শুনে কুকুরটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে লেজ নামিয়ে সে আবার দৌড়ে ফিরে গেল ব্লুমস্‌বেরি স্কোয়ারের দিকে।

'শোভাযাত্রা এগিয়ে এলো। সমবেত কণ্ঠে তখন নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো ধ্বনিত হচ্ছে গান: "হোয়েন শ্যাল উই সী হিজ ফেস?"—আমার সামনের পেভমেণ্ট দিয়ে জনতার স্রোত এগিয়ে চলেছে। সে-স্রোতের যেন শেষ নেই। অধৈর্য হয়ে পড়ছি আমি ক্রমশ ড্রিম, ড্রিম, ড্রিম, এগিয়ে এলো ঢাকের আওয়াজ। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমার পাশেই রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দু'টো ডানপিটে বাচ্চা ছেলে "দেখ্‌, দেখ্‌," বলে উঠলো একজন। "কী?" বললো অন্য ছেলেটা। "পায়ের ছাপ! কাদামাখা খালি পায়ের ছাপ!" উত্তেজিতভাবে আঙুল তুলে দেখালো প্রথমজন।

'চট্‌ করে চোখ নামিয়ে দেখলাম, ধবধবে শাদা সিঁড়ির ওপর স্পষ্ট ফুটে রয়েছে আমার কাদামাখা পায়ের ছাপ। ছেলেদু'টো হাঁ ক'রে সেদিকে তাকিয়ে আছে লোকজন ধাক্কা মেরে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে চলে যাচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। ওদের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে আমার পায়ের ছাপ ড্রিম, ড্রিম, ড্রিম, বেজে যাচ্ছে ঢাক। প্রবল হয়ে উঠেছে গানের আওয়াজ: হোয়েন শ্যাল উই সী

হিজ ফেস। "খালি পায়ে একটা লোক এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে না গিয়ে থাকে তো কী বলেছি," বললো এক বিচ্ছু। "এবং সে আর নিচে নামেনি। আর তার পা থেকে রক্ত পড়ছিল।"

'আসল ভিড়টা এর ভেতর পার হয়ে গেছে। "টেড, দেখ্, দেখ্!" সোজা আমার পায়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো ক্ষুদে টিকটিকিদু'টোর ছোটটি। আমি চমকে উঠে চোখ নামিয়ে দেখতে পেলাম, সিঁড়ির ওপর আমার কাদামাখা পায়ের আকৃতি আবছাভাবে চোখে পড়ছে। মুহূর্তের জন্যে নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেললাম আমি। "আশ্চর্য তো," বললো বড়ো ছেলেটি। "সাংঘাতিক আশ্চর্য ব্যাপার! ভূতের পা নাকি?" একটু ইতস্তত করলো সে। তারপর দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আমার দিকে গুড়িগুড়ি পায়ে এগিয়ে এলো। ছেলেটা কী ধরছে অমন করে, দেখবার জন্য হাঁটা থামিয়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে পড়লো সিঁড়ির পাশে। দেখা-দেখি এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। আর মুহূর্তমাত্র, ছেলেটা খপ্ করে ধরে ফেলবে আমার পা। দ্রুত এক পা পিছিয়ে এলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও পিছিয়ে গেল সবিস্ময়ে। আমি ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাড়ির পোর্টিকোর ভেতর ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ছোট ছেলেটার চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলো না। আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে পেভমেন্টে পা দেবার আগেই বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠে সে চিৎকার করে জানিয়ে দিলো ভূতুড়ে পায়ের গতি-বিধি।

'দৌড়ে বেরিয়ে এলো ওরা রাস্তায়, নিচের সিঁড়িতে এবং পেভ-মেন্টের ওপর আমার নতুন পায়ের ছাপ দ্রুত ফুটে উঠতে দেখলো চোখের সামনে। "কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো কে যেন। "পা!

ওই যে! দু'টো পা দৌড়ুচ্ছে!" যে-তিনজন আমাকে ধাওয়া করে আসছে তারা ছাড়া রাস্তার সমস্ত লোক স্যালভেশন আর্মির পেছন পেছন চলেছে। ভিড়ের জন্যে শুধু আমার নয়, তাড়া করে আসছে যারা তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। বিস্ময় এবং প্রশ্ন ক্রমেই বাড়ছে। শেষে এক ছোকরাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ভিড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এলাম আমি। রাসেল স্কোয়ারের গোলচক্কর ঘুরে সোজা ছুটে চললাম। ছ'সাতজন হতভম্ব লোক আমার পায়ের ছাপ ধরে পিছু ধাওয়া করছে। দাঁড়াবার সময় নেই, রাস্তার সব লোক তাহলে পিছু নেবে।

'দু'বার রাস্তার বাঁকে এসে ঘুরে উল্টো দিকে দৌড় দিলাম, তিনবার আড়াআড়ি পার হলাম রাস্তা। ছুটতে ছুটতে পা গরম হয়ে শুকিয়ে গেল। একসময় দেখলাম, ছাপ পড়ছে না আর। শেষ পর্যন্ত একটু শ্বাস নেবার সময় পাওয়া গেল। হাত দিয়ে ঘষেপা ভালোভাবে মুছে ফেললাম। রেহাই পেয়ে গেলাম সে-যাত্রা। ঘটনার শেষ যে দৃশ্যটি দেখেছি তা হচ্ছে, ডজনখানেক লোক রাস্তার এক জায়গায় উবু হয়ে বসে অপরিসীম বিস্ময় আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা শুকিয়ে-আসা পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখছে।

'দৌড়াদৌড়ির ফলে শরীর কিছুটা গরম হয়ে উঠেছিল। একটু ধাতস্থ হয়ে আশেপাশের অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। পিঠের ক্ষত শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। কোচোয়ান ব্যাটার আঙুলের খোঁচায় টনসিলে ব্যথা জমেছে, ঘাড়ের চামড়া ছ'ড়ে গেছে তার নখের আঁচড়ে। পা টনটন করছে ব্যথায়। এক পা সামান্য কেটে যাওয়ায় কিছুটা খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে। অন্ধ একটা লোককে আসতে দেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেলাম—অন্ধদের অন্য সব ইন্দ্রিয় খুব

প্রখর হয় শুনেছি। পথচলতি লোকজনের সঙ্গে দু'একবার ধাক্কা লেগে গেল আমার। হৃতভম্ব ব্যাটাদের পেছনে ফেলে অভিসম্পাত দিতে দিতে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম।

'তারপর এক সময় কিসের যেন নিঃশব্দ নরম ছোঁয়া অনুভব করলাম চোখেমুখে। তাকিয়ে দেখলাম তুষারের হালকা চাদর নেমে আসছে চারদিক আচ্ছন্ন করে। সর্দি লেগে গেছে আমার। যতই চেষ্টা করি না কেন, মাঝে মাঝে হাঁচি না দিয়ে পারছি না। যতগুলো কুকুর পড়লো সামনে, সবগুলো নাক উঁচিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো আমার দিকে তেড়ে এলো।

'হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখর হয়ে উঠলো চারদিক। দৌড়ুচ্ছে লোকজন—ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ সবাই। প্রথমে একজন-দু'জন, শেষে দল বেঁধে—চিৎকার করতে করতে। আগুন! আগুন লেগেছে! সবাই দৌড়ুচ্ছে আমার ফেলে আসা আবাসের দিকে। একটা রাস্তা বরাবর পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরবাড়ির ছাদ এবং টেলিফোনের তার ছাড়িয়ে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। আমার ঘর জ্বলছে—আমার কাপড়চোপড়, যন্ত্রপাতি, সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ছে আগুনে। শুধু আমার চেকবই আর তিনখানা ডায়েরি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে। আগুন জ্বলছে! পুড়িয়ে দিয়েছি আমার জাহাজ, ফেরার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি। আগুনের রক্তিম শিখা গ্রাস করে ফেলেছে পুরো বাড়ি।'

কথা থামিয়ে কী যেন ভাবছে অদৃশ্য মানব। কেম্প জানালা দিয়ে একবার চকিত দৃষ্টি ফেললেন বাইরে। 'কী হলো?' বলে উঠলেন তিনি। 'বলে যাও।'

বাইশ

'হ্যাঁ, জানুয়ারির সেই তুষারঝড় ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছে আমার চারপাশে। জমে-ওঠা তুষারকণার নিচে বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে আমার অবয়ব। আমি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, শীতার্ত, বিপর্যস্ত—ধুঁকছি অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। আমার নতুন জীবনের তখুনি শুরু। কোনো আশ্রয় নেই, সহায়-সম্বল নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার কাছে সব খুলে বলতে পারি। কাউকে কিছু বলতে যাবার অর্থ হবে মানুষের হাতে স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয়া—আজব এক দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হওয়া। তবু একবার ভাবলাম, পথচলতি কাউকে থামিয়ে সব বলি তাকে, তার দয়ার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিই। কিন্তু খুব ভালোভাবে জানা ছিল আমার, কতোখানি ত্রাসের সৃষ্টি করবে ঘটনাটা, আর পরিণামে আমাকে কেমন পাশবিক নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হবে। বুঝলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো পরিকল্পনা করবার চেষ্টা বৃথা। প্রথমে দরকার আশ্রয়, বরফের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে—শরীর ঢাকতে হবে। তারপর ভাবা যাবে কী করা যায়। কিন্তু কোথায় আশ্রয়? আমি অদৃশ্য, কিন্তু লণ্ডন শহরের সারি সারি বাড়ির খিল-আঁটা রুদ্ধ দরজা ভেদ করবার সাধ্য আমার নেই। শুধু একটা জিনিসই আমার সামনে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এখন। তা হচ্ছে, এই তুষারাচ্ছন্ন ঝোড়ো রাতের ভয়াবহ ঠাণ্ডায় একা নগ্নদেহে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবার দুঃসহ যন্ত্রণা।

'চকিতে একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। গোয়ার স্ট্রীট থেকে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড পর্যন্ত বিস্তৃত একটা রাস্তা ধরে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। এসে দাঁড়ালাম অমনিয়াম্স্-এর সামনে। বিশাল বিপণি-বিতানটা চেনো তুমি। সবকিছু পাওয়া যায়—মাংস, মনোহারী জিনিস, লিনেন, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, এমনকি তৈলচিত্রও পাবে সেখানে। একটামাত্র দোকান না বলে জায়গাটাকে অসংখ্য দোকানের একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা বলাই ভালো। ভেবেছিলাম দরজাগুলে খোলা পাবো। কিন্তু দেখলাম, দরজা বন্ধ। চওড়া প্রবেশপথের মুখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাইরে। ইউনিফর্ম-পরা একটা লোক—মাথার টুপিতে লেখা "অমনিয়াম"—দরজা খুলে দিল। সুযোগ বুঝে আমি একা পাশ দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। প্রথমেই যে-জায়গাটা সামনে পড়লো সেখানে দেখলাম বিক্রি হচ্ছে রিবন, দস্তানা, মোজা এবং এ-জাতীয় অন্যান্য জিনিস। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম আরো বিস্তৃত একটা জায়গায়। সেখানে মজুদ রয়েছে পিকনিক বাস্কেট আর বেতের আসবাবপত্র।

'জায়গাটা আমার পক্ষে নিরাপদ মনে হলো না; অনবরত লোকজন এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। অস্থিরভাবে নানা দিকে ঘুর ঘুর করে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। শেষে ওপরতলার বিশাল একটা অংশে এসে পৌঁছলাম। শত শত খাট সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। ওগুলো ছাড়িয়ে আরো সামনে এগিয়ে যেতেই শেষ পর্যন্ত ভাঁজকরা নরম জাজিমের একটা প্রকাণ্ড গাদার ভেতরে আশ্রয় নেবার মতো একটা জায়গা পেয়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই সেখানে আলো জ্বলে উঠেছে, বেশ উষ্ণ লাগছে। স্থির করলাম, আপাতত আর কোথাও না গিয়ে

ওখানেই দোকানের লোকজন আর খরিদ্দারদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করবো। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে খাবার এবং কাপড়-চোপড় খুঁজে নিতে নিশ্চয় খুব অসুবিধা হবে না। তারপর ছদ্ম পোশাকে ঘুরে ফিরে সমস্ত জায়গাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখবো কোথায় কী আছে। হয়তো ঘুমোবার মতো বিছানাপত্রও কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবো। বুদ্ধিটা ভালোই মনে হলো। কাপড়-চোপড় যোগাড় করতে পারলে মোটামুটি স্বাভাবিক দৃশ্যমান একটা মানুষের রূপ ধারণ করা যাবে। চেকবই ও ডায়েরির পার্সেল ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বসবাসের একটা জায়গা খুঁজে নেবো। তারপর ধীরেসুস্থে ভেবে ঠিক করা যাবে আমার এই অদৃশ্য অবস্থার যে-সব সুবিধা রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কী করে করা যায়।

'দোকান বন্ধ হবার সময় এসে গেল। জাজিমের গাদায় আশ্রয় নেবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখলাম জানালার ব্লাইণ্ড টেনে নামানো হচ্ছে, খরিদ্দাররা সার বেঁধে চলেছে দরজার দিকে। একটু পরে একদল চটপটে জোয়ান ছেলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এলোমেলো জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলো। ভিড় কমে আসতেই আমি আমার আশ্রয় ছেড়ে লোকজনের গা বাঁচিয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা শুরু করলাম। সারাদিন ধরে যে-সব জিনিস বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল সে-সব কী আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে দোকানের মেয়ে-পুরুষ কর্মচারীরা গোছগাছ করে সরিয়ে ফেলছে দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। বাক্সভর্তি নানা জিনিস, ঝুলিয়ে রাখা জামাকাপড়, ফিতার ঝালর, মনোহারী বিভাগের মিষ্টান্নের বাক্স, এটা-সেটা নানা জিনিস ঝপাঝপ নামিয়ে, গুটিয়ে, বন্ধ করে, ভাঁজ করে ছিমছাম আকৃতি দিয়ে

জায়গামতো তুলে রাখা হচ্ছে। সরিয়ে রাখা সম্ভব নয় যে-সব জিনিস সে-সব ঢেকে রাখা হচ্ছে ত্রিপল কিংবা চট দিয়ে। সবশেষে ফ্লোর থেকে সমস্ত চেয়ার তুলে সাজিয়ে রাখা হলো কাউন্টারের ওপর। কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে যার যার মতো তড়িৎবেগে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো। এরপর করাতের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে বালতি আর ঝাড়ু নিয়ে হাজির হলো একদল ছোকরা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলাম সেখান থেকে। অন্ধকার নির্জন ডিপার্টমেন্টগুলোর ভেতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুনতে পেলাম ওদের ঝাঁটার শব্দ। শেষ পর্যন্ত, দোকান বন্ধ হবার এক ঘণ্টা কি তারও বেশি পরে দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শোনা গেল। নীরবতা নামলো চারপাশে। আমি একা একা দোকানপাট, গ্যালারি, শোরুমের বিশাল জটিল গোলকধাঁধার ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে গাঢ় নিস্তব্ধতা। মনে আছে, ঘুরতে ঘুরতে একটা প্রবেশপথের কাছে এসে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড থেকে পথচলতি লোকজনের পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনেছিলাম।

'প্রথমে যে-জায়গাটায় ঢুকেছিলাম সেখানে মোজা এবং দস্তানা বিক্রি হতে দেখেছিলাম। এখন জায়গাটা অন্ধকার। অনেকক্ষণ ধরে পাগলের মতো খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত ছোট্ট ক্যাশ ডেস্কের ড্রয়ারে দেশলাই পেলাম। এরপর খুঁজে বের করলাম মোমবাতি। একটার পর একটা মোড়ক ছিঁড়ে, অনেক বাক্স এবং ড্রয়ার হাতিয়ে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম যা খুঁজছিলাম : ভেড়ার লোমের প্যান্ট এবং ভেস্ট। এরপর যোগাড় করলাম জুতো, মোজা এবং মোটা একটা কমফর্টার। পোশাকের স্টোরে গিয়ে বেছে নিলাম ট্রাউজার, লাউঞ্জ জ্যাকেট, ওভারকোট এবং একটা স্নাউচ হ্যাট। এতক্ষণে

আবার নিজেকে দেহধারী একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগলো। এখন দরকার খাবার।

'ওপরতলায় রিফ্রেশমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ঠাণ্ডা মাংস পাওয়া গেল। কফির পাত্রে কিছুটা কফি অবশিষ্ট ছিল, গ্যাসের চুলো জ্বেলে সেটুকু গরম করে নিলাম। সব মিলিয়ে খেতে খুব খারাপ লাগলো না। খাওয়া শেষ হলে কম্বল খুঁজতে বেরিয়ে দোকানের একটা মনোহারী বিভাগ পেয়ে গেলাম। প্রচুর চকোলেট, মোরব্বা এবং কিছু শাদা বারগানডি মজুদ ছিল সেখানে—আমার দরকারের তুলনায় বেশিই বলতে হবে। কাছেই একটা খেলনার ডিপার্টমেন্ট দেখে চমৎকার একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। কয়েকটা নকল নাক খুঁজে নিলাম। গাঢ় রঙিন চশমার কথাও মনে এলো, কিন্তু অম্নিয়াম্স্-এ অপটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নেই। পরচুলা এবং মুখোশ পরবার বুদ্ধিটাও তখুনি প্রথম মাথায় আসে। আপাতত আর কিছু করবার নেই। বিশ্রামের প্রয়োজন। কম্বলের একটা উষ্ণ গাদার ওপর শুয়ে পড়লাম আরাম করে।

'নতুন জীবনে পা দেবার পর এই প্রথম একটু সুস্থভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার অবকাশ পাওয়া গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম পেয়ে শরীরে বেশ একটা প্রশান্তির ভাব এসেছে। মনেও সঞ্চারিত হলো সেই প্রশান্তির আমেজ। মনে মনে ভাবলাম, কমফর্টার দিয়ে মুখ ঢেকে কাপড়চোপড় পরা অবস্থায় সকালবেলা সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারবো। টাকা-পয়সা যা যোগাড় হয়েছে তা দিয়ে চশমা এবং আরো যা-কিছু দরকার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করার জন্যে, সব কিনে নেয়া যাবে।

'এলোমেলো স্বপ্নের ভেতর ডুবে গেলাম অচিরেই। গেল ক'দিনের

সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা টুকরো টুকরো অবস্থায় ফিরে এলো ঘুমের ভেতরে। কুৎসিত ক্ষুদে ইহুদিটাকে দেখলাম—তার বাড়িতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার দুই ছেলে তাজ্জব হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে। সেই লোলচর্ম বুড়ির আকুঞ্চিত মুখটাও দেখতে পেলাম, আমাকে জিজ্ঞেস করছে তার বেড়ালের কথা। কাপড়ের টুকরোটা অদৃশ্য হয়ে যাবার আশ্চর্য দৃশ্যটাও আবার দেখলাম। তারপর মনে হলো আবার চলে গেছি সেই পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন পাদদেশে। কনকনে ঝোড়ো বাতাস বইছে। সর্দিতে আক্রান্ত বুড়ো পাদ্রী বিড়বিড় করছে: "ডাস্ট টু ডাস্ট, আর্থ টু আর্থ···"—বাবার উন্মুক্ত কবর যেন চেয়ে আছে আমারই দিকে

"তোমারও সময় হয়েছে," বলেই হঠাৎ কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চললো কবরের দিকে। হাত-পা ছুঁড়ছি আমি, চিৎকার করছি, শবযাত্রীদের কাছে কাকুতি-মিনতি করছি,—কিন্তু তারা পাষাণের মতো নির্বিকারভাবে প্রার্থনানুষ্ঠান আগাগোড়া শেষ করলো। বুড়ো পাদ্রীও নাক টানতে টানতে গুন্‌গুন্ করে নির্বিবাদে সমস্ত স্তোত্র পাঠ করে গেল। বুঝতে পারলাম, আমি অদৃশ্য এবং আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না—বিপুল এক মহাশক্তির করাল থাবা আমার ওপর ক্ষমাহীনভাবে চেপে বসেছে। আমার সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়া হলো কবরের ভেতর। সজোরে আছড়ে পড়লাম কফিনের ওপর। ফাঁকা মনে হলো কফিনটা। কোদালভর্তি মাটি-পাথর দুমদাম আমার গায়ের ওপর পড়তে লাগলো। মাটির নিচে ঢাকা পড়ে যাচ্ছি আমি, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কবর থেকে উঠে আসবার জন্য পাগলের মতো চেষ্টা করছি। এমন সময় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল।

'বাইরে লণ্ডনের বিবর্ণ ভোর। জানালার ব্লাইণ্ডের কিনারা দিয়ে চুঁইয়ে আসা ধূসর ম্লান আলোয় আমার চারপাশ আলোকিত হয়ে আছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। প্রকাণ্ড ঘরের ভেতর লম্বা টানা কাউণ্টার, গুটিয়ে রাখা জিনিসপত্রের গাদা, গদি-কম্বলের স্তূপ, লোহার মোটা থাম,—এ আমি কোথায়! বেশ কিছুক্ষণ কিছুই মনে করতে পারলাম না। তারপর আবছাভাবে মনে এলো রাতের ঘটনা। পরক্ষণে হঠাৎ সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। এমন সময় কানে এলো কথাবার্তার শব্দ।

'অনেক দূরে, অন্য এক ডিপার্টমেণ্টের খোলা জানালার আলোয় দেখতে পেলাম দু'জন লোক এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম, পালাবার জন্যে এদিক ওদিক চাইলাম দ্রুত। নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেল লোকদু'টো। বোধহয় আমার পলায়মান মূর্তি ওরা মুহূর্তের জন্যে অস্পষ্টভাবে দেখে ফেললো। "কে ওখানে?" চেঁচিয়ে উঠলো একজন। "দাঁড়াও!" আরেকজন হুঙ্কার ছাড়লো। দৌড়ে একটা কোণ ঘুরতেই আমি হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লাম বছর পনেরোর ঢ্যাঙা এক ছোকরার ওপর। চোখের সামনে আমার মুণ্ডহীন ধড় দেখে আর প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে যুগপৎ আতঙ্কে এবং যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো সে। তাকে ধরাশায়ী করে ছুটলাম আবার। আরেকটা বাঁক ঘুরে লাফ দিয়ে একটা কাউণ্টারের পেছনে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। মুহূর্তপরে পাশ দিয়ে পায়ের শব্দ ছুটে চলে গেল। অনেকগুলো কণ্ঠের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। কেউ দরজা সামাল দিতে বলছে, কেউ জানতে চাইছে আসল ব্যাপারটা কী। একজন আরেকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে কী করে আমাকে পাকড়াও করবে।

'মেঝেতে শুয়ে আছি আমি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এ-কথাটা সে-সময় আমার একদম মনে হয়নি যে পোশাক ছেড়ে ফেলে আমি অনায়াসে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। আসলে পোশাক-পরা অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে, এই চিন্তাটা তখনও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হঠাৎ কাউন্টারের সারির ভেতর থেকে চিৎকার উঠলো, "ওই যে!"

'লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কাউন্টারের ওপর থেকে ছোঁ মেরে একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বন্‌বন্ করে পাক খেতে খেতে চেয়ারটা সবেগে ছুটে গেল যে-গাধাটা চেঁচিয়ে উঠেছিল তার দিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলাম আবার। বাঁক নিতেই আরেকজনের সামনে পড়ে গেলাম। এক ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লো সে দূরে। সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠতে শুরু করলাম আমি। ঘুসি খাওয়া লোকটা চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো সিঁড়ি বেয়ে আমার পেছনে। সিঁড়ির মাথায় গাদা করা ছিল উজ্জ্বল রঙে রঙ-করা অসংখ্য পাত্রের মতো জিনিস—কী যেন ওগুলো?'

'আর্ট পট,' কেম্প বললেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আর্ট-পট। সিঁড়ির ওপরের ধাপে পৌঁছেই ঘুরে দাঁড়ালাম। পাশের গাদা থেকে একটা পাত্র তুলে নিয়ে সেটা গুঁড়ো করলাম পিছু-নেয়া গর্দভটার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আর্ট-পটের পুরো স্তূপটাই হুড়মুড় করে ধ'সে পড়লো। চিৎকার উঠলো চারদিক থেকে, পায়ের শব্দ ছুটে এলো। পাগলের মতো ছুটলাম রিফ্রেশমেন্ট ডিপার্টমেন্টের দিকে। শাদা পোশাক পরা বাবুর্চিমতো একটা লোক কাজ করছিল সেখানে, সে-ও পিছু নিলো আমার। শেষ চেষ্টা হিসেবে কপাল ঠুকে আরেক দিকে দৌড় দিলাম। গিয়ে পড়লাম লোহা

লক্কড়ের জিনিসপত্রের মধ্যে। কাউন্টারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। বাবুর্চি ব্যাটা আগে-ভাগে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকতেই ভারি একটা লণ্ঠনের প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিলাম মাথায়। ব্যথায় ভাঁজ হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। কাউন্টারের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব আমি কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলতে শুরু করলাম। কোট, জ্যাকেট, ট্রাউজার, জুতো, কোনোটাই খুলতে তেমন অসুবিধা হলো না। কিন্তু ভেড়ার লোমের ভেস্ট চামড়ার মতো সেঁটে রয়েছে গায়ে। পেছনের লোকজন প্রায় এসে পড়েছে, শব্দ পাচ্ছি। বাবুর্চি লোকটা কাউন্টারের অন্য পাশে অনড় পড়ে আছে। আবার আরেক দিকে দৌড়ুলাম আমি। "এই দিকে, পুলিশ!" কে যেন চিৎকার করে বললো।

'খাটবোঝাই সেই স্টোর-রুমটাতে এসে পড়েছি আমি। তারপরই সামনে পড়লো ওয়ারড্রোবের অরণ্য। ভেতরে ঢুকে সটান শুয়ে পড়লাম। অন্তহীন টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলাম ভেস্টের কবল থেকে। একজন পুলিশকে নিয়ে দোকানের তিনজন লোক যখন হাজির হলো তখন আমি স্বাধীন। এককোণে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে। ভেস্ট এবং প্যান্টের দিকে ছুটে এলো লোকগুলো। "চুরি করা জিনিসগুলো ফেলে গেছে," বললো ছোকরামতোন একজন। "এখানেই আছে কোথাও।"

'কিন্তু আমাকে খুঁজে পাওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না।

'অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। কাপড়চোপড়গুলো হারাতে হলো বলে দুঃখের সীমা রইলো না। মনে মনে অভিশাপ দিলাম নিজের দুর্ভাগ্যকে। শেষ পর্যন্ত রিফ্রেশমেন্ট-রুমে গিয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে আগুনের পাশে বসলাম নিজের

অবস্থাটা খতিয়ে দেখতে।

'একটু পরেই দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে খুব উত্তেজিতভাবে অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। কী কী কাণ্ড করেছি আমি, তার একটা ফাঁপানো গল্প শুনলাম তাদের মুখে। আমার পরিচয় নিয়েও অনেক জল্পনা-কল্পনা চললো। আবার আমি নিজের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলাম। এখানকার অনতিক্রম্য এক মুশকিল হচ্ছে, কোনো কিছু এখান থেকে বাইরে বের করা সম্ভব নয়—বিশেষ করে এখন যেখানে সবাই অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে আছে। একবার নিচে গুদাম-ঘরে গিয়ে দেখলাম কিছু জিনিস প্যাকেটে ভরে ঠিকানা লিখে পার্সেল হিসেবে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব কিনা। কিন্তু চেকিংয়ের পদ্ধতিটা ঠিক বোঝা গেল না ব'লে ঝুঁকিটা নিতে চাইলাম না।

'বাইরে তুষার গলতে শুরু করেছে। আগের দিনের তুলনায় এ-দিনটা কিছুটা উষ্ণ এবং পরিষ্কার। বসে থেকে কোনো লাভ নেই বুঝতে পেরে বেলা এগারোটার দিকে অম্‌নিয়াম্‌স্‌ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ব্যর্থতার ভার চেপে বসেছে মনে। কী করবো এরপর জানা নেই।'

তেইশ

'আমার অসহায় অবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করলো,' দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললো অদৃশ্য মানব। 'কোনো আশ্রয় নেই, আবরণ নেই। জামাকাপড় পরবার অর্থ সমস্ত সুবিধা বিসর্জন দেয়া, এবং সেইসঙ্গে বিকট এক ভয়ঙ্কর বস্তুতে পরিণত করা। উপোস করতে হচ্ছিল আমাকে, কারণ দেহকোষে খাবার পুরোপুরি শোষিত না হওয়া পর্যন্ত অজীর্ণ খাবার লুকিয়ে রাখবার উপায় নেই। পেটের ভেতরের খাবার চোখে পড়লে কিম্ভূত এক দৃশ্য হবে সেটা।'

'তাই তো, এতক্ষণ কথাটা আমার মনে আসেনি!' কেম্প বললেন।

'আগে আমিও ভাবিনি। কিন্তু আগের সন্ধ্যার তুষারপাতের অভিজ্ঞতার পর থেকে আরো অনেক বিপদ সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে গেছি। বুঝতে পেরেছি, বরফ পড়তে থাকলে বাইরে থাকা চলবে না—শরীরে বরফ জমা হয়ে প্রকাশ করে দেবে আমার অস্তিত্ব। বৃষ্টিতেও দেখা যাবে আমার আকৃতি—গড়িয়ে পড়া জলের আবরণের নিচে আমার চকচকে অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর কুয়াশার ভেতর আমাকে মনে হবে পরিচ্ছন্ন বাতাসভর্তি হালকা বুদবুদের একটা মানুষের মূর্তির মতো। এছাড়া লণ্ডনের রাস্তা-ঘাটে কিছুক্ষণ হাঁটা-হাঁটির পর দেখলাম, পায়ে ময়লা লাগছে, বাতাসের ধুলো-ময়লা জমা হচ্ছে গায়ের চামড়ায়। বুঝলাম এভাবে অচিরেই আমি মানু-

ষের চোখে ধরা পড়ে যাবো।

'স্থির করলাম, লণ্ডনে আর থাকা চলবে না কিছুতেই।

'গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটের বস্তির দিকে চললাম। এসে দাঁড়ালাম যে-রাস্তায় আমি থাকতাম তার মাথায়। এগোলাম না। কারণ রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় পোড়া বাড়িটার উল্টোদিকে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। এখনও ধোঁয়া উঠছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে।

'সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এখন কাপড়চোপড় যোগাড় করা। পোশাকের ব্যবস্থা যদি হয়ও, মুখ নিয়ে কী করা যাবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঘুরছিলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। হঠাৎ পাঁচ-মিশেলি জিনিসপত্রের একটা ছোট দোকানে চোখে পড়লো কয়েকটা মুখোশ আর নকল নাক। পেয়ে গেলাম সমস্যার সমাধান। পলকের মধ্যে স্থির করে ফেললাম আমার কর্তব্য। এখন আর লক্ষ্যহীন মনে হচ্ছে না নিজেকে। ব্যস্ত রাস্তা-ঘাট এড়িয়ে ঘুরপথে গিয়ে হাজির হলাম স্ট্র্যাণ্ডের উত্তরের রাস্তায়। আবছামতো মনে পড়ছিল, ওখানে কোথাও নাটকের পোশাকের দোকান আছে কয়েকটা।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে। দ্রুত হাঁটছি আমি যাতে পেছন থেকে কেউ হঠাৎ গায়ের ওপর এসে না পড়ে। যতবার কাউকে অতিক্রম করছি ততবারই খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে বেডফোর্ড স্ট্রীটে একজনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, আচমকা সে মোড় নিয়ে সোজা আমার দিকে এসে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে ছিটকে সরে এলাম রাস্তার মাঝখানে। চলন্ত একটা জুড়িগাড়ির চাকার নিচে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। খুব ভড়কে গিয়েছিলাম। কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে ঢুকে একটা ফুলের দোকানের বাইরে নির্জন এক কোণে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

রীতিমতো কাঁপছি তখন, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। সর্দি আবার জেঁকে ধরেছে। হাঁচির শব্দে কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে ভেবে একটু পরেই উঠে পড়তে হলো।

'অবশেষে যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম। ড্রুরি লেনের কাছে গলির ভেতরে ছোট্ট একটা নোংরা দোকান। জানালায় ঝোলানো ঝকমকে পোশাক, নকল মণিমুক্তা, পরচুলা, চটিজুতা, আলখাল্লা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা ভঙ্গির ছবি। পুরোনো ধাঁচের দোকান। নিচু এবং অন্ধকার। দোকানের ওপরে আরো চার তলা রয়েছে। গোটা বাড়িটার চেহারাই কেমন যেন অন্ধকার, নিরানন্দ জানালা দিকে উঁকি দিলাম। কাউকে দেখলাম না ভেতরে। ঢোকার জন্যে দরজা ঠেলতেই ঝনঝন করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভেতরে ঢুকে দরজা খোলা রেখেই শূন্য একটা পোশাকের স্ট্যাণ্ড পার হয়ে কোণের বড়ো আয়নার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় মিনিটখানেক পার হয়ে গেল, কেউ এলো না। তারপর একটা ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভেতরের দরজা ঠেলে দোকানের অন্য প্রান্তে উদয় হলো একজন লোক।

'ততক্ষণে আমি পাকাপোক্ত পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছি। বাড়ির ভেতর ঢুকে ওপরতলায় লুকিয়ে থাকবো সুযোগের অপেক্ষায়। চারদিক নীরব হয়ে এলে নেমে এসে জিনিসপত্র ঘেঁটে বেরকরে নেবো পরচুলা, মুখোশ, চশমা এবং কাপড়চোপড়। তারপর বেরিয়ে পড়বো বাইরে। চেহারাটা অস্বাভাবিক লাগতে পারে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হবে আমাকে নিশ্চয়। বাড়িতে টাকা-পয়সা কিছু পেলে তা-ও হাতিয়ে নেবো অবশ্যই।

'দোকানে এইমাত্র ঢুকেছে যে লোকটা, সে দেখতে ছোটখাটো,

বেটে। পিঠটা কুঁজো। উসকোখুসকো ঘন ভুরু দু'চোখের ওপর চাউনির মতো ঝুলে আছে। লোকটার হাতদু'টো বেশ লম্বা, অথচ পা'গুলো অস্বাভাবিকরকম খাটো আর ধনুকের মতো বাঁকা। বুঝতে পারলাম আমি তার ভোজনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। কাউকে দেখতে পাবে আশা করে দোকানের চারদিকে চাইলো লোকটা। দেখতে না পেয়ে প্রথমে বিস্ময় তারপর ক্রোধ ফুটলো তার চোখে। "গোল্লায় যাক বজ্জাত ছোকরার দল!" বলে উঠলো তিক্ত গলায়। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলো। ফিরে এলো মিনিটখানেক পর। সরোষে লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে গজগজ করতে করতে ভেতরের দরজার দিকে এগোলো।

'তাড়াতাড়ি তার পিছু নিলাম আমি। অমনি চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা। তৎক্ষণাৎ আমিও জমে গেলাম পাথরের মতো। তাজ্জব হয়ে গেলাম লোকটার শ্রবণশক্তির বহর দেখে। মনে হচ্ছে, আমার পায়ের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সে। এগিয়ে গিয়ে আমার মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিলো দরজা।

'দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ আবার এদিকেই ফিরে আসছে দ্রুত। আবার খুলে গেল দরজা। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো চারদিক। বোঝা যাচ্ছে, মন খুঁত খুঁত করছে তার। বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে এসে কাউন্টারের পেছন দিকটা পরীক্ষা করে দেখলো। উঁকি দিয়ে দেখলো কয়েকটা আসবাবপত্রের পেছনে। তবু তার মন থেকে সন্দেহ দূর হলো না। দাঁড়িয়ে রইলো দ্বিধা নিয়ে। বোধ হয় ভুল করে দরজা খোলা রেখে এসেছে সে। ফাঁক বুঝে আমি সুড়ুৎ

করে ঢুকে পড়লাম ভেতরের ঘরে।

'যেমন-তেমনভাবে সাজানো অদ্ভুত চেহারার ছোট্ট একটা ঘর। এক কোণে অনেকগুলো বড়ো বড়ো মুখোশ। টেবিলের ওপর লোকটার আধ-খাওয়া ব্রেকফাস্ট। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকে আবার খেতে বসলো সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আমি, কফির গন্ধ ঢুকছে নাকে। লোকটা খাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে, খাওয়ার ধরনটাও বিশ্রী। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলো মন। দোকানে যাবার দরজা ছাড়াও ঘরটার আরো দুটো দরজা আছে ওপরতলায় এবং বেসমেণ্টে যাবার জন্যে। কিন্তু সবগুলো দরজা বন্ধ। লোকটা এখান থেকে না-যাওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই। সামান্যতম নড়াচড়া করতেও ভয় হচ্ছে, লোকটা নির্ঘাত আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। বহু কষ্টে দু'বার একেবারে শেষ মুহূর্তে হাঁচি চাপলাম।

'ক্লান্তি এবং রাগের প্রায় শেষ সীমায় যখন পৌঁছে গেছি, তখন খাওয়া শেষ হলো লোকটার। টিনের কালো ট্রের ওপর জরাজীর্ণ থালাবাসন তুললো সে। হলুদ ছোপঅলা টেবিলক্লথে সমস্ত উচ্ছিষ্ট জড়ো করলো। এগিয়ে গিয়ে নিচে যাবার দরজাটা খুললো প্রথমে। তারপর সবকিছু একসঙ্গে বয়ে নিয়ে চললো। দু'হাতেই জিনিসপত্র থাকায় দরজাটা টেনে দিয়ে যেতে পারলো না। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে তার পিছু পিছু গিয়ে হাজির হলাম নোংরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কিচেনে। লোকটা বাসনকোসন ধুতে শুরু করলো দেখে খুশি হলাম মনে মনে। বুঝলাম ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই কিছু। তাছাড়া খালি পায়ে ইটের ঠাণ্ডা মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ কষ্টও হচ্ছিল। পা টিপে টিপে ওপরতলায় উঠে আগুনের ধারের চেয়ারে বসে পড়-

লাম। আগুন ভালো জ্বলছে না দেখে অতশত না ভেবেই কয়েক টুকরো কয়লা ছুঁড়ে দিলাম ফায়ারপ্লেসে। শব্দ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ওপরে উঠে এলো লোকটা। ঘরে ঢুকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রইলো। উঁকি দিয়ে দেখলো এদিক-ওদিক, আমার চুল পরিমাণ দূর থেকে ঘুরে গেল। সবরকম পর্যবেক্ষণের পরও তাকে আদৌ সন্তুষ্ট মনে হলো না। বেরোবার আগের মুহূর্তে দরজায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিলো।

'ছোট্ট ঘরটাতে এক যুগ অপেক্ষা করে রইলাম আমি। শেষ পর্যন্ত ফিরলো লোকটা। ওপরতলায় যাবার দরজা খোলামাত্র আমিও তার সঙ্গে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

'সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে আচমকা থেমে গেল সে। আর একটু হলেই আমি ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে কান খাড়া করে লোকটা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। "হলপ করে বলতে পারি আমি—" আচমকা বলে উঠলো সে। লম্বা লোমশ হাত দিয়ে নিজের নিচের ঠোঁট ধরে টানতে টানতে চোখ দিয়ে সিঁড়ির ওপর-নিচ জরিপ করলো একবার। ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠতে শুরু করলো।

'দরজার হাতলে হাত রেখে আবারও থমকে দাঁড়ালো লোকটা। চোখে-মুখে বিস্ময় এবং রাগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। আমার নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দে ও সজাগ হয়ে উঠেছে। শয়তানের মতো প্রখর ওর শ্রবণশক্তি। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো লোকটা। "যদি কেউ থেকে থাকো এ-বাড়িতে—" চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল সে, শেষ করলো না কথাটা। পকেটে হাত ঢোকালো চাবির জন্যে। পেলো না চাবি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার পাশ দিয়ে ক্যাপার

মতো ঝড়ের বেগে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। পেছন পেছন না গিয়ে আমি সিঁড়ির মাথায় চুপচাপ বসে রইলাম।

'একটু পরেই গজ গজ করতে করতে চাবি নিয়ে ফিরে এলো লোকটা। দরজা খুললো ঘরের, এবং আমি ঢোকার আগেই মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলো পাল্লাদুটো।

'বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলাম চারদিক। খুব পুরনো জরা-জীর্ণ বাড়ি। স্যাঁতসেঁতে। ঢালু ছাদের নিচের ঘরগুলো ইঁদুরে ভর্তি। দেয়াল থেকে কাগজ খসে পড়ে ঝুলছে। কোনো কোনো দরজার হাতল মরচে ধরে শক্ত হয়ে আছে, শব্দ হতে পারে ভেবে টানাটানি করলাম না। কয়েকটা ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। কোনো কোনো ঘরে গাদা করে রাখা হয়েছে থিয়েটারের নানারকম বাতিল জিনিসপত্র। দেখে মনে হলো সেগুলো পুরনো অবস্থায়ই কেনা হয়েছে। লোকটা যে-ঘরে ঢুকেছে তার কাছেই একটা ঘরে প্রচুর পুরনো কাপড় দেখতে পেলাম। ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম সেগুলো নিয়ে, কাজে লাগাবার মতো দু'একটা কাপড় হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে এতো তন্ময় হয়ে পড়লাম যে, গৃহকর্তার ধারালো শ্রবণশক্তির কথা আমার মন থেকে মুছে গেল। হঠাৎ মৃদু সাবধানী পায়ের আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিলো লোকটা। হাতে পুরনো একটা রিভলভার। একবিন্দু নড়ছি না আমি। লোকটা এলোমেলো কাপড়ের স্তূপের দিকে সন্দিগ্ধচোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'রিভলভার নামিয়ে আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করলো সে। চাবি লাগিয়ে দিলো। তার পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দূরে।

বুঝতে পারলাম, ফাঁদে আটকা পড়েছি আমি। দাঁড়িয়ে রইলাম হতবুদ্ধি হয়ে। কী করবো ভেবে পেলাম না। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে দরজার কাছ থেকে হেঁটে গেলাম জানালা পর্যন্ত। ফিরে এলাম। রাগে জ্বলে যাচ্ছে সর্বশরীর। তবু ঠিক করলাম আগে কাপড়চোপড়-গুলো সব পরীক্ষা করে দেখবো। ওপরের তাক থেকে আরেকটা গাঁট নামালাম মেঝেতে। শব্দ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটে এলো লোকটা। আরো কুটিল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকতেই আমার সঙ্গে তার সামানা ছোঁয়া লেগে গেল। চমকে উঠে এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্ব হয়ে।

'আস্তে আস্তে একটু ধাতস্থ হলো সে। ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস করে বললো, "ইঁদুর!" পরিষ্কার বুঝলাম, ভয় পেয়েছে লোকটা। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দেয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। একটা পুরনো তক্তা ক্যাঁচ ক'রে উঠলো পায়ের চাপে। আর যায় কোথায়! সেই ক্ষুদে নরকের কীট রিভলভার হাতে বাড়ি-ময় ছোটাছুটি ক'রে একটার পর একটা দরজা বন্ধ করে চাবি পকেটে পুরতে লাগলো। ওর মতলবটা বুঝতে পেরে রক্ত চড়ে গেল আমার মাথায়। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবার মতো ধৈর্য রইলো না আর। এর মধ্যে বুঝে গেছি, বাড়িতে আর কেউ নেই। কাজেই আর বেশি লুকোচুরি না করে সুযোগ বুঝে মাথায় বসিয়ে দিলাম এক ঘা।'

'এক ঘা বসিয়ে দিলে মাথায়!' আর্তনাদ করে উঠলেন কেম্প।

'হ্যাঁ, অজ্ঞান করে দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, ল্যাণ্ডিংয়ের ওপর একটা টুল দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে ঘা মারলাম পেছন থেকে। ছেঁড়া জুতোভর্তি বস্তার মতো গড়িয়ে নেমে গেল নিচে।'

'কিন্তু—শোনো ! মানবতা বলে একটা—'

'ওসব কথা সাধারণ লোকজনের বেলায় খুব খাটে। কিন্তু, কেম্প, আমার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখো। ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে আমাকে, এমনভাবে—যাতে লোকটা দেখতে না পায়। তার জন্যে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।—যাই হোক, মুখের ভেতর একটা ভেস্ট গুঁজে দিয়ে লোকটাকে একটা বড়ো চাদরে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম।'

'চাদরে মুড়ে বেঁধে ফেললে

'হ্যাঁ, একটা বোঁচকার মতো বানিয়ে। গাধাটা যাতে জ্ঞান ফিরে পেলেও ভয়ে চুপ করে থাকে সেজন্যে কায়দাটা বেশ ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। ওই বোঁচকা থেকে বেরোনোও চাট্টিখানি কথা নয়—গিঁট দিয়েছিলাম পায়ের দিকে। দেখো কেম্প, অমন চোখ লাল করে তাকিয়ে থেকো না। খুনে ডাকাত নই আমি। বলছি তো, আর কোনো উপায় ছিল না। হাতে রিভলভার ছিল ওর। তাছাড়া আমার ছদ্মবেশ একবার দেখে ফেললেই ওপরে অন্যের কাছে গড়গড় করে বলে দিতে পারতো।'

'তবু,' বললেন কেম্প, 'ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে—আজকের এই যুগে—। নিজের ঘরদোর তদারক করছিল লোকটা। তুমি তো সেখানে—বলতে গেলে—লুঠপাট করতেই গিয়েছিলে।'

'লুঠপাট ! বাজে ব'কো না ! এরপর হয়তো চোর বলে বসবে আমাকে ! কেম্প, বস্তাপচা নীতিকথা আওড়াবার মতো নির্বোধ তুমি নও নিশ্চয়। আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছো না ?'

'সেইসঙ্গে ওই লোকটার অবস্থাও বুঝতে পারছি,' কেম্প বললেন।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালো অদৃশ্য মানব। 'কী বলতে চাও তুমি ?'

একটু কঠিন হয়ে উঠলো কেম্পের মুখভাব। কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। 'যাই হোক,' হঠাৎ তাঁর সুর বদলে গেল, 'মনে হয় কাজটা না করে তোমার উপায়ও ছিল না। বেশ বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলে। তবু—'

'অবশ্যই বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলাম—বিশ্রী এক অবস্থায় পড়েছিলাম। লোকটা আমাকে ক্ষেপিয়েও তুলেছিল—বাড়িময় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হন্যিতন্যি করছিল রিভলভার হাতে, দরজা বন্ধ করছিল একবার—একবার খুলছিল। অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম একেবারে। তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না—নিশ্চয় দোষ দিচ্ছো না এখন, কী বলো?'

'কাউকে কখনো দোষ দিই না আমি,' বললেন কেম্প, 'সে দিন আর নেই। তারপর কী করলে, বলো।'

'খিদে পেয়েছিল। নিচে গিয়ে এক টুকরো রুটি এবং খানিকটা বাসি পনির পেলাম—খিদে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট মনে হলো। কিছুটা ব্র্যাণ্ডি এবং জল খেয়ে আবার পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে। বোঁচকাবন্দী লোকটা তেমনি মড়ার মতো পড়ে আছে। তার পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে সোজা গিয়ে ঢুকলাম পুরনো কাপড়ে ঠাসা সেই ঘরটায়। রাস্তার দিকে ঘরটার একটা জানালা আছে। ময়লায় বাদামি হয়ে আসা লেসের পর্দা ঝুলছে জানালায়। এগিয়ে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। বাইরে ঝলমলে রোদ—আধো-অন্ধকার বাড়ির ভেতর এতক্ষণ কাটিয়েছি, চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্রায়। প্রচুর যানবাহন চলছে রাস্তায়। ফলের গাড়ি, জুড়ি-গাড়ি, বাক্সের গাদা বোঝাই চার চাকার গাড়ি, মাছের গাড়ি একের পর এক চলে যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এখন যেদিকেই

তাকাচ্ছি চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে রঙিন আলোর ছোপ। উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে। নিজের অবস্থাটা আবার ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে নিজের কাছে।

'ঘরের ভেতর বেঞ্জোলিনের হালকা গন্ধ। জিনিসটা সম্ভবত কাপড় পরিষ্কার করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। স্থির করলাম, এক দিক থেকে শুরু করে সারা বাড়িতে গুছিয়ে তল্লাশি চালাবো। মনে হচ্ছে, কুঁজোটা বেশ কিছুদিন একা রয়েছে এখানে। লোকটা সত্যি ভারি অদ্ভুত।

'যেখানে যা-কিছু আমার কোনো কাজে আসতে পারে ব'লে মনে হলো, সব ওপরের ঘরে এনে জমা করলাম। তারপর যেগুলো বেশি দরকারি ব'লে মনে হলো সেগুলো বেছে নিলাম। একটা হাতব্যাগ পাওয়া গেল, কাজে দেবে জিনিসটা। খানিকটা পাউডার, রুজ এবং স্টিকিং প্লাস্টারও যোগাড় হলো।

'ভেবেছিলাম, মুখে এবং শরীরের অন্য যে-সব অংশ পোশাকে ঢাকা পড়বে না সে-সব জায়গায় রঙের প্রলেপ দিয়ে পাউডার মেখে নেব কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, অসুবিধা আছে। আবার অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইলে দরকার হবে তার্পিন তেল, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এবং প্রচুর সময়। শেষ পর্যন্ত ভালো দেখে একটা মুখোশই বেছে নিলাম। মুখটা একটু অস্বাভাবিক লাগলেও এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলাম যে, বাস্তবে এর চেয়েও কিম্ভূত হয় অনেক মানুষের মুখ। চোখে গাঢ় চশমা পরলাম, ধূসর গোঁফ লাগালাম ঠোঁটের ওপর, মাথায় পরলাম পরচুলা। কোনোরকম অন্তর্বাস খুঁজে পেলাম না, তবে সেটা পরে কিনে নিলেও চলবে। আপাতত একটা সুতী কাপড়ের আলখাল্লা এবং কাশ্মিরী শাল দিয়ে শরীর মুড়ে নিলাম।

মোজা পাওয়া গেল না, তবে কুঁজোর জুতোজোড়া বেশ ভালোভাবেই লেগে গেল পায়ে। দোকানের ডেস্কে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা আর তিরিশ শিলিংয়ের মতো রৌপ্যমুদ্রা ছিল। ভেতরের রুমের কাবার্ড ভেঙে পেলাম আট পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা। প্রস্তুতি শেষ। মানুষের পৃথিবীতে আবার আমি পা রাখতে পারি।

'শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা দ্বিধা এসে ভর করলো মনে। আমার চেহারা স্বাভাবিক মানুষের মতোই মনে হচ্ছে তো? পোশাকের কোথাও এক-আধ চিলতে ফাঁক থেকে যায়নি তো? বেডরুমের ছোট আয়নায় সম্ভাব্য সব দিক থেকে নিজেকে দেখে বিচার করলাম। মনে হলো, ঠিকই আছে। অদ্ভুত নাটকীয় চেহারা হয়েছে—নাটকের কৃপণ-চরিত্রের মতো লাগছে দেখতে, কিন্তু আমার শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে কারো সন্দেহের উদ্রেক হবার অবকাশ নেই কোথাও। মনে কিছুটা আত্মবিশ্বাস এলে ছোট আয়নাটা নিয়ে নিচে নেমে দোকানে ঢুকলাম। সবগুলো ব্লাইণ্ড নামিয়ে দিয়ে কোণের বড়ো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই আয়নার সাহায্যে সমস্ত দিক থেকে শেষবারের মতো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম নিজেকে।

'কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সাহস সঞ্চয় করে নিলাম। তারপর দোকানের দরজা খুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে এলাম রাস্তায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় ডজনখানেক বাঁক ফেলে এলাম পেছনে। কেউ আমাকে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে বলে মনে হলো না। বিপদ কেটে গেছে, মনে মনে ভাবলাম।'

কথা থামিয়ে আবার চুপ করে রইলো অদৃশ্য মানব।

'কুঁজোটাকে নিয়ে আর মোটেও মাথা ঘামালে না?' বললেন ডেম্প।

'না। কী হয়েছিল তার তা-ও শুনিনি। হয়তো কোনোভাবে বাঁধন খুলে বেরিয়ে এসেছিল। গিঁটগুলো বেশ শক্ত ছিল অবশ্য।'

জানালার কাছে গিয়ে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে রইলো অদৃশ্য মানব।

'স্ট্র্যাণ্ড-এ গিয়ে পৌঁছবার পর কী হলো?'

'ওহ্—হতাশ হতে হলো আবার, ভুল ভাঙলো। ভেবেছিলাম সব মুশকিলের অবসান হয়েছে। সত্যি বলতে কি, ভেবেছিলাম, আমার অদৃশ্য অস্তিত্বের কথা যদি শুধু ফাঁস না হয়, তাহলেই যা ইচ্ছে নিরাপদে করে যেতে পারি—কেউ আমার চুলের ডগা ছুঁতে পারবে না। যা-ই করি আমি, ফলাফল যা-ই দাঁড়াক, কিছুতেই কিছু হবে না আমার। পোশাক ছুঁড়ে ফেলে মুহূর্তের ভেতর আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। টাকা-পয়সা নিয়েও ভাবনার কিছু নেই, যেখানে পাই অদৃশ্য হাতে মুঠি ভরে তুলে নেবার অপেক্ষা শুধু।

'ঠিক করলাম, আগে সাধ মিটিয়ে ভুরিভোজন করতে হবে কোথাও। তারপর ভালো কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো। নতুন একপ্রস্থ পোশাক সেখান থেকে জুটিয়ে নেবো। সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না মনে। তখন ধরতে পারিনি আমি কতো বড়ো গাধা। এক জায়গায় গিয়ে লাঞ্চের অর্ডার দিচ্ছি, আচমকা মনে হলো, অদৃশ্য মুখ না বের করে তো খাবার উপায় নেই! অর্ডার দেয়া শেষ করে ওয়েটারকে বললাম, আমি মিনিট দশেকের ভেতর আসছি। তিক্ত মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। জানি না ক্ষুধার সময় এমন করে বিমুখ হবার অভিজ্ঞতা তোমার আছে কিনা।'

'অতটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই অবশ্য,' কেম্প বললেন, 'তবে

তোমার অবস্থাটা আমি অনুমান করতে পারছি।'

'শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে বললাম, আমার একটা প্রাইভেট রুম চাই। বললাম, অ্যাকসিডেন্টের ফলে আমার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে—মারাত্মকভাবে। কৌতূহলী চোখে তাকালো ওরা আমার দিকে, কিন্তু নিজেদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না বলে রাজি হয়ে গেল। নির্জন ঘরে লাঞ্চ দেয়া হলো আমাকে। পরিবেশনে কিছু ত্রুটি থাকলেও খাওয়াটা বেশ ভালোই হলো মোটামুটি। খাওয়া শেষ হলে একটা চুরুট ধরিয়ে ভাবতে বসলাম এরপর কী করা যায়। বাইরে তখন তুষারঝড় শুরু হয়ে গেছে।

'যতই ভাবলাম, কেম্প, ততই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, অদৃশ্য মানব আসলে কী অসহায় অদ্ভুত এক জীব—বিশেষ করে তার বিচরণের জায়গাটা যদি হয় জনাকীর্ণ শহর, আবহাওয়া যদি হয় ঠাণ্ডা, নোংরা। আজব এই এক্সপেরিমেন্টের আগে হাজারটা সুবিধার স্বপ্ন দেখেছি আমি। এখন চারদিকে দেখছি শুধুই হতাশা। যা-কিছু মানুষের কাম্য, সবই এখন আমার হাতের নাগালের মধ্যে। অদৃশ্য আমি সে-সব করায়ত্ত করতে পারি অনায়াসে। কিন্তু তার কিছুই ভোগ করবার সাধ্য আমার নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভাবি যদি—যতো উঁচুতেই উঠি আমি, কী মূল্য সেই উঁচু আসনের যদি সেখানে চিরকাল অপ্রকাশিত রাখতে হয় নিজেকে? নারীর প্রেমের কী দাম আছে যেখানে সে ডেলাইলার মতো জেনে নেবে আমার ক্ষমতার গোপন মন্ত্র? রাজনীতিতে রুচি নেই আমার, খ্যাতির মোহ নেই, মানবপ্রেমিক সাজতে চাই না, খেলাধুলা ভালোবাসি না। কী করবো তাহলে? আমি শুধু আঁধারে-ঢাকা রহস্য, কাপড়ে-মোড়ানো মানুষ নামের অদ্ভুত এক পরিহাস।'

নীরব হয়ে গেল অদৃশ্য মানব। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, জানালার বাইরে ঘুরছে তার দৃষ্টি।

'কিন্তু তুমি আইপিংয়ে গেলে কী করে?' তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলেন কেম্প। অতিথিকে কথাবার্তার ভেতর ব্যস্ত রাখতে চাইছেন তিনি।

'ওখানে কোথাও নির্জনে বসে কাজ করবো ভেবেছিলাম। একটা আশা ছিল মনে। আবছা একটা আইডিয়া এসেছিল মাথায়। এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আগের অবস্থায় ফিরে যাবার একটা উপায় আছে। যখন চাইবো, আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবো। অদৃশ্য অবস্থায় যা-কিছু করতে চাই সব করা হয়ে গেলে তারপর আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যাবো আমি। যা যা করবো বলে স্থির করেছি, এখন সে-সব নিয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'লণ্ডন থেকে সোজা আইপিং চলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, তার আগে শুধু ডায়েরি তিনখানা আর চেকবই তুলে এনেছিলাম এবং কিছু মালপত্র আর অন্তর্বাস যোগাড় করেছিলাম। নতুন আইডিয়াটা কাজে লাগাবার জন্যে কিছু কেমিক্যাল্স্-ও কিনতে হয়েছিল—খাতা তিনটে পেলে ক্যালকুলেশনগুলো দেখাবো তোমাকে। যাই হোক, সব নিয়ে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কী সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টির ভেতরই না পড়েছিলাম ট্রেন থেকে নেমে। পেস্টবোর্ডের নাকটা যাতে ভিজে না যায় তার জন্যে সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!'

'শেষ পর্যন্ত,' বললেন কেম্প, 'পরশুদিন যখন তোমার স্বরূপ ধরা পড়ে গেল সবার কাছে, তুমি—মানে খবরের কাগজ পড়ে যা বুঝতে পারছি—'

'হ্যাঁ, যা করেছি বেশ করেছি। ওই কনস্টেবল গর্দভটা মারা গেছে নাকি?'

'না,' কেম্প বললেন। 'সেরে উঠবে বোধহয়।'

'তাহলে ব্যাটার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। মেজাজ একদম বিগড়ে গিয়েছিল আমার। যতসব ছোটলোক জানোয়ার! আমাকে কেন একটু নিরিবিলি শান্তিতে থাকতে দিলো না?—ওই মুদি হারামজাদার কী খবর?'

'কেউ-ই মারা যাবে বলে মনে হয় না,' কেম্প বললেন।

'ভবঘুরেটার কথা অবশ্য আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না,' ক্রুর হাসি হেসে বললো অদৃশ্য মানব। 'কেম্প, তুমি জানো না ক্রোধ কী জিনিস! বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, হাজারটা পরিকল্পনা ক'রে, ছক কেটে সমস্ত কাজ প্রায় গুছিয়ে আনবার পর যদি সব তালগোল পাকিয়ে যায়, কোনো মূর্খ বজ্জাত যদি মাঝখানে এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তাহলে কেমন লাগতে পারে বলো! আশ্চর্য! মনে হয়, জগতের তাবৎ নরকের কীট, বর্বর জানোয়ার উঠে পড়ে লেগেছে আমার সমস্ত কাজ পণ্ড করতে! আবার যদি কিছু হয়, পাগল হয়ে যাবো আমি—সব কচুকাটা করতে শুরু করবো। এরই মধ্যে ওরা আমার কাজ হাজার গুণ কঠিন ক'রে তুলেছে।'

'নিঃসন্দেহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবারই কথা,' কেম্প বললেন শুষ্ককণ্ঠে

চব্বিশ

চোখের কোণ দিয়ে জানালার বাইরে একবার দৃষ্টিপাত করলেন কেম্প। 'কিন্তু এখন আমাদের কী করার আছে?' বলতে বলতে তিনি অতিথির কাছাকাছি গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে জানালা দিয়ে তার দৃষ্টি দূরের পাহাড়ি পথের ওপর না পড়তে পারে। তিনজন লোক উঠে আসছে পাহাড়ের পথ ধরে। অসহ্যরকম ধীরগতিতে এগোচ্ছে ওরা, কেম্পের মনে হলো।

'পোর্ট বারডকের দিকে এলে কেন? কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছিল তোমার?'

'দেশ ছেড়ে সরে পড়তে চেয়েছিলাম। আবহাওয়া এখন মোটা-মুটি উষ্ণ, অদৃশ্য অবস্থায় থাকবার মধ্যে তেমন ঝুঁকি নেই। ভাবলাম, এই সুযোগে দক্ষিণের দিকে রওনা হয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ এদিকে আমার রহস্য যখন ফাঁস হয়ে গেছে, লোকে নিশ্চয় মুখোশ-আঁটা কাপড়ে-ঢাকা একজন মানুষের সন্ধানে থাকবে সবসময়। এখান থেকে তো ফ্রান্সের স্টীমার ধরা যায়। ভেবেছিলাম, ঝুঁকি যা-ই থাক, একটাতে উঠে সরে পড়বো। ফ্রান্স থেকে ট্রেনে করে স্পেনে যাওয়া যেতো কিংবা আলজিয়ার্স চলে যাওয়া যেতো অনা-য়াসে। খারাপ হতো না জিনিসটা। ওদিকে হয়তো সারা বছরই অদৃশ্য অবস্থায় থাকা যেতো। এবং যা-ইচ্ছে করা যেতো।—যাই

হোক, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর প্ল্যান বদলে ফেলেছি আমি। ওই ভবঘুরেটাকে আমি আমার টাকার থলি আর মুটে হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। আমার জিনিসপত্র আর খাতাগুলো যাতে ফ্রান্সে আমার হাতে সময়মতো পৌঁছোয় তার একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই ওকে ছেড়ে দিতাম।'

'বুঝেছি।'

'কিন্তু তার আগেই বর্বর জানোয়ারটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে সবসুদ্ধ ভেগেছে! আমার ডায়েরিগুলো নিয়ে গেছে, কেম্প,—হারামজাদা ডায়েরিগুলো মেরে দিয়েছে! একবার যদি হাতে পেতাম বজ্জাতটাকে!'

'ডায়েরিগুলো ওর হাত থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করো আগে,' বললেন কেম্প।

'কিন্তু কোথায় আছে ইতরটা? জানো তুমি?'

'শহরের পুলিস স্টেশনে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে ওকে—ওরই অনুরোধে, সবচেয়ে মজবুত সেলটাতে।'

'নেড়িকুত্তা!'

'তোমার কাজ এখন আটকে থাকছে তাহলে,' বললেন কেম্প

'খাতাগুলো চাই-ই আমাদের। ওগুলোই আসল।'

'তা তো বটেই,' গলাটা একটু কেঁপে গেল কেম্পের, বাইরে পায়ের শব্দ হলো নাকি! 'খাতাগুলো অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে আমাদের। খুব কঠিন হবে না কাজটা, যদি ওগুলোর মূল্য ওর জানা না থাকে।'

'না, সেটা ওর জানবার কথা নয়,' বলে চিন্তায় ডুবে গেল অদৃশ্য মানব।

কথাবার্তা চালু রাখবার জন্যে প্রসঙ্গ খুঁজছেন কেম্প। কিন্তু নিজে থেকেই আবার কথা শুরু করলো অদৃশ্য মানব।

'না জেনেশুনে তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম, কেম্প, আর তারই ফলে আমার সমস্ত প্ল্যান আমি বদলে ফেলছি। কারণ তুমি সব বুঝবে। এর ভেতর অনেক কিছু ঘটে গেছে, সব জানাজানি হয়ে গেছে, খাতাগুলো হারিয়েছি, অনেক ভুগেছি, তবু—তবু এখনও অনেককিছু করা যায়, অনেককিছু—।' আচমকা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আমি যে এখানে, তুমি কাউকে বলোনি তো?'

উত্তর দেবার আগে একটু ইতস্তত করলেন কেম্প। 'বলবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কাউকে বলোনি?'

'কাউকে না।'

'বেশ—' অদৃশ্য মানব উঠে দাঁড়ালো। কোমরে হাত রেখে স্টাডির ভেতরে পায়চারি শুরু করলো। 'ভুল করেছিলাম, কেম্প, সব একা একা করতে গিয়ে মহা ভুল করেছিলাম। শক্তি, সময়, সুযোগের অনেক অপচয় করেছি। ভাবলে অবাক লাগে, একা একজন মানুষের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ!

'একজন সহযোগী চাই আমার, কেম্প, আমাকে সাহায্য করবে সে আর চাই লুকিয়ে থাকবার একটা জায়গা—যেখানে খেতে পারবো, ঘুমোতে পারবো, সব সন্দেহের নাগালের বাইরে থেকে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবো। একজন সহযোগী আমার চাই-ই চাই। একজন সহযোগী পেলে, খাবার-দাবার বিশ্রামের ব্যবস্থা হ'লে, হাজারটা জিনিস করা সম্ভব!

'এ-পর্যন্ত আমি সবকিছু ভাসা-ভাসাভাবে বিচার করেছি। এখন

আমাদের ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে, অদৃশ্য একজন মানুষের পক্ষে সত্যি কতটুকু কী করা সম্ভব, আর কী সম্ভব নয়। আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা অমনি ধরনের কোনকিছুতে অদৃশ্য অবস্থায় খুব সুবিধে করা যাবে না, কারণ সবসময় কোনো না কোনো শব্দ মানুষ করবেই— সে যতো সামান্যই হোক না কেন। চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রেও তেমন সুবিধে হবার কথা নয়। একবার কোন-ভাবে ধরে ফেলতে পারলে লোকে অনায়াসে আমাকে কারাগারে পুরে দিতে পারবে। তবে কি-না আমাকে ধরাটা সহজ নয়। আসলে অদৃশ্য অবস্থা কাজে আসতে পারে মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে : এক, অদৃশ্য অবস্থায় নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া যায় ; দুই, সন্তর্পণে কারো কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়। এতে করে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাবে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে। সেটা হচ্ছে, খুন-খারাবি। যে-অস্ত্রই থাকুক প্রতি-পক্ষের হাতে, ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক স'রে গিয়ে সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে মোক্ষম আঘাত হানতে পারবো আমি। অনা-য়াসে গা বাঁচাতে পারবো, এড়িয়ে যেতে পারবো প্রতিপক্ষের যে-কোনো আঘাত।'

কেম্পের হাত চলে গেল গোঁফের কাছে। নিচতলায় পায়ের শব্দ হলো না?

'খুন খারাবি-ই আমাদের করতে হবে, কেম্প।'

'খুন-খারাবিই আমাদের করতে হবে,' কথাটার প্রতিধ্বনি কর-লেন কেম্প। 'তোমার কথা আমি শুনছি, গ্রিফিন, তবে ভেবো না রাজি হয়ে যাচ্ছি। কেন খুন-খারাবি করতে হবে?'

'যথেচ্ছ খুন-খারাবির কথা বলছি না। বিচার-বিবেচনা করে মৃত্যু-দণ্ড দেবো আমরা। পরিষ্কার ক'রে বলছি শোনো। অদৃশ্য মানব

ব'লে একজনের অস্তিত্ব আছে, এ-কথা সবাই জানে। সেই অদৃশ্য মানব এবার এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে। হ্যাঁ, চমকে ওঠার মতোই কথাটা। কিন্তু আমি প্রলাপ বকছি না। ত্রাসের রাজত্বই তৈরি করবো আমি। এই বারডকের মতোই কোনো শহরকে বেছে নেবো। ভয় দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা করবো ক্ষমতা। প্রথমে আমার সমস্ত আদেশ-নির্দেশ জারি করতে হবে। অনেকভাবেই সেটা করা যাবে—এক টুকরো করে কাগজ সবার দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে এলেই হবে। আদেশ অমান্য করবে যারা, তাদের আমি খুন করবো। যারা আদেশ অমান্যকারীকে আশ্রয় কিংবা প্রশ্রয় দেবে তাদেরকেও খুন করা হবে।'

'হুম্!' বললেন কেম্প। গ্রিফিনের কথা আর তাঁর কানে ঢুকছে না। সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ করবার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন তিনি। বিক্ষিপ্ত মনোযোগ চাপা দেবার জন্য বলে উঠলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, গ্রিফিন, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা হবে, তোমার সহযোগীর।'

'কেউ জানবেই না কে আমার সহযোগী,' উৎসাহের সঙ্গে বললো অদৃশ্য মানব। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সে। 'চুপ! নিচতলায় কিসের শব্দ?'

'ও কিছু নয়,' বললেন কেম্প। আচমকা গলা চড়িয়ে তিনি দ্রুত বলে যেতে লাগলেন, 'আমি রাজি নই, গ্রিফিন। বুঝতে পারছো? আমি রাজি নই। স্বজাতির বিরুদ্ধে খেলায় মাতবার স্বপ্ন কেন দেখছো? এভাবে তুমি সুখের আশা করতে পারো কী ভাবে? নিঃসঙ্গ নেকড়ের জীবন বেছে নিতে যেয়ো না। তোমার গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করো, পৃথিবীকে সব জানতে দাও—অন্তত দেশের লোককে জানাও। একজন সহযোগীর বদলে লক্ষ সহযোগী পাও

যদি, তাহলে কত কী করতে পারবে ভেবে দেখো—'

হাত তুলে কেম্পকে থামালো অদৃশ্য মানব। 'কারা যেন আসছে ওপরে,' নিচুস্বরে বললো সে।

'কী যা-তা বলছো!' বললেন কেম্প।

'দেখছি আমি,' বলে অদৃশ্য মানব দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন কেম্প। তারপর লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন বাধা দিতে।

চমকে উঠে অনড় দাঁড়িয়ে পড়লো অদৃশ্য মানব। 'বিশ্বাসঘাতক!' হিস্ হিস করে উঠলো তার কণ্ঠ। সহসা ড্রেসিং-গাউনের সামনের দিকটা খুলে গেল, চট্ করে বসে পড়ে অদৃশ্য মানব পোশাক ছাড়তে শুরু করলো। কেম্প দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অদৃশ্য মানব। তার পা-দু'টো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক ধাক্কায় কেম্প দরজা খুলে ফেললেন। ধাবমান পায়ের শব্দ এবং গলার আওয়াজ ভেসে এলো নিচতলা থেকে।

ততক্ষণে দরজার কাছে চলে এসেছে অদৃশ্য মানব। অতর্কিতে এক ধাক্কায় তাকে আবার পেছনে ঠেলে দিয়ে কেম্প এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর মাত্র এক মুহূর্ত, স্টাডির ভেতরে বন্দী হয়ে যাবে একলা গ্রিফিন। কিন্তু বাদ সাধলো ছোট্ট একটি জিনিস। ঝাঁকুনি খেয়ে দরজার ফুটো থেকে চাবিটা ছিটকে বেরিয়ে এসে পড়ে গেছে কার্পেটের ওপর। সকালে তাড়াহুড়োয় সেটা আলগাভাবে লাগিয়ে রেখেছিলেন কেম্প।

শাদা হয়ে গেছে কেম্পের মুখ। দু'হাতে শক্ত করে দরজার হাতল চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে ধরে রেখেছেন। গ্রিফিনের সঙ্গে

পেরে উঠছেন না কিছুতেই। একটু একটু করে দরজাটা ছ'ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কেম্পের কপালে। হাতের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে। ছোট হয়ে আসছে দরজার ফাঁকটা। পুরো বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুণি। হঠাৎ হ্যাঁচকা এক টানে প্রায় এক ফুট ফাঁক হয়ে গেল দরজা। ড্রেসিং গাউনটা ঢুকে পড়লো ফাঁকের ভেতর। অদৃশ্য কয়েকটা আঙুল এসে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলো কেম্পের গলা। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দরজার হাতল ছেড়ে দিলেন কেম্প। ঠেলা খেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলেন। পা হড়কে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লেন ল্যাণ্ডিংয়ের কোণে। শূন্য ড্রেসিং-গাউনটা উড়ে গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর।

সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকটা উঠে বারডকের পুলিস চীফ কর্ণেল এডাই বিস্ফারিত চোখে ওপরের দিকে চেয়ে আছেন। ড্রেসিং-গাউনের অদ্ভুত ঝটপটানি আর কেম্পের সশব্দ পতন দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন তিনি। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন কেম্প। মাথা নিচু করে তেড়ে গেলেন তিনি সামনের দিকে। এবং পরমুহূর্তে দ্বিগুণ বেগে ছিটকে ফেরত এসে আবার হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন কর্ণেল এডাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ভারি কিছু একটা শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। চোখে দেখতে পেলেন না কিছুই। তীব্র একটা গুঁতো অনুভব করলেন উরুমূলে, সেইসঙ্গে একটা অদৃশ্য থাবা তাঁর গলা খামচে ধরে প্রবল এক হ্যাঁচকা টান মারলো পেছন দিকে। আধপাক ঘুরে হুড়মুড় করে সিঁড়ির গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। অদৃশ্য একটা পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল তাঁর পিঠ, ভুতুড়ে একটা

ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ নিচতলার দিকে নেমে গেল। পরমুহূর্তে হলঘরে দু'জন পুলিস অফিসারের চিৎকার আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির সদর দরজা ঝন্‌ঝন্‌ করে কেঁপে উঠলো।

গড়িয়ে চিৎ হয়ে উঠে বসলেন কর্ণেল এডাই। চোখ তুলে দেখতে পেলেন, সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নেমে আসছেন ডক্টর কেম্প। ধুলোমাখা এলোমেলো চেহারা, ঘুসি খেয়ে মুখের একপাশ ফুলে উঠেছে—ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁর হাতে একটা নোংরা লাল ড্রেসিং-গাউন।

'হায় ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠলেন কেম্প. 'সর্বনাশ হয়েছে! পালিয়েছে অদৃশ্য মানব!'

পঁচিশ

এইমাত্র অতি দ্রুত যে-ঘটনাটা ঘটে গেল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বার বার খেই হারিয়ে ফেলছেন ডক্টর কেম্প। ল্যাণ্ডিংয়ের ওপর কর্ণেল এডাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্রুত কথা বলছেন তিনি। হাতে ধরা এখনও গ্রিফিনের পোশাক। বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর অবশেষে অবস্থাটা মোটামুটি পরিষ্কার হলো এডাইয়ের কাছে।

'উন্মাদ লোকটা,' বললেন কেম্প, 'অমানুষ। চরম স্বার্থপর। নিজের সুবিধা আর নিরাপত্তার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না ও। ওর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার গল্প ওর মুখ থেকেই আজ সকালে শুনেছি। অনেক মানুষকে ও জখম করেছে। এক্ষুণি বাধা দিতে না পারলে ও খুন করবে যাকে ইচ্ছে। চারদিকে ত্রাস ছড়িয়ে দেবে। রাগে উন্মত্ত হয়ে ও ছুটছে এখন!'

'ওকে ধরতেই হবে,' গম্ভীরভাবে বললেন এডাই।

'কিন্তু কিভাবে?' বলেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেম্প। 'শুনুন, এই মুহূর্তে কাজ শুরু করতে হবে। যতো লোক পাওয়া যায় সবাইকে কাজে লাগাতে হবে। এই এলাকা ছেড়ে ওকে বেরোতে দেয়া চলবে না। একবার বেরোতে পারলে যেমন ইচ্ছে গ্রামের ভেতর দিয়ে খুন-জখম করতে করতে ছুটবে। ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় ও! হ্যাঁ, ত্রাসের রাজত্ব, তা-ই বলেছে আমাকে। [illegible]য়, রাস্তায়, জাহাজে সব জায়গায় পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করুন। সেনা-

বাহিনীর সাহায্য লাগবে। সাহায্য চেয়ে এক্ষুণি তার ক'রে দিন। আর হ্যাঁ, একটা মাত্র কারণেই এখানে ও আপাতত থেকে যেতে পারে। কয়েকখানা মূল্যবান নোটখাতা খোয়া গেছে ওর। সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে পারে। খুলে বলছি ব্যাপারটা। আপনার পুলিস ফাঁড়িতে একজন লোক আছে—মারভেল—'

'জানি,' বললেন এডাই, 'জানি আমি। ওই বাঁধানো খাতাগুলো—বুঝেছি।'

'আরো দেখতে হবে, ও যেন খেতে কিংবা ঘুমোতে না পারে। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা পুরো এলাকা সরগরম করে রাখতে হবে। সমস্ত খাবার—সবরকম খাবার তালা দিয়ে রাখতে হবে, খাবার যোগাড় করতে হলে যেন ওকে তালা ভাঙতে হয়। কোনো ঘরবাড়িতে যেন ওর ঢোকার পথ না থাকে। ঈশ্বর করুন যেন বৃষ্টি হয়, রাতে ঠাণ্ডা জেঁকে বসে। সমস্ত এলাকা জুড়ে তল্লাশি শুরু করতে হবে, অনবরত চালিয়ে যেতে হবে তল্লাশি। আমি বলে দিচ্ছি, কর্ণেল, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ও, অবিলম্বে ধ'রে আটক করতে না পারলে মহাপ্রলয় বাধিয়ে দেবে। কী সংঘাতিক অবস্থা দাঁড়াবে তাহলে—ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।'

'কিন্তু এর বেশি আর কী করার সাধ্য আছে আমাদের?' বললেন এডাই। 'এক্ষুণি যাচ্ছি আমি সব ব্যবস্থা করতে।—আপনিও আসুন না! হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিও চলুন! চলুন সবাই মিলে বসে আগে পরামর্শ করে নিই। হপ্‌স্‌ আর রেলওয়ে ম্যানেজারদের ডেকে পাঠাবো সাহায্যের জন্যে। ঈশ্বর! দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলুন চলুন, যেতে যেতে বলবেন আর কী করা যায়।—নামিয়ে রাখুন ওটা হাত থেকে।'

এডাইয়ের পিছু পিছু নিচে নেমে এলেন কেম্প। সদর দরজা হাট

করে খোলা। পুলিস অফিসার দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শূন্যের ভেতর চেয়ে আছে। 'পালিয়ে গেছে, স্যার,' একজন বলে উঠলো কর্ণেলকে দেখে।

'এক্ষুণি আমাদের সেণ্ট্রাল স্টেশনে যেতে হবে,' এডাই বললেন। 'তোমাদের একজন নিচে গিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে এসো—জলদি। তারপর, কেম্প, বলুন আর কী করবো?'

'কুকুর,' কেম্প বললেন। 'কুকুর লেলিয়ে দিন। কুকুর ওকে চোখে না দেখলেও গন্ধ শুঁকে খুঁজে বের করতে পারবে। কুকুর যোগাড় করুন।'

'ঠিক আছে।' হ্যালস্টেড জেলের অফিসারদের জানাশোনা এক লোক আছে—সে ব্লাডহাউণ্ড পোষে। কুকুর হলো। তারপর?'

'মনে রাখবেন,' বললেন কেম্প, 'ওর পেটের ভেতরকার খাবার দেখা যায়। খাবার পুরোপুরি হজম না-হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে। কাজেই খাবার পর কয়েক ঘণ্টা ওকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হয়। এক দিক থেকে তল্লাশি চালিয়ে যেতে হবে—ঝোপঝাড়, আনাচ-কানাচ কিছুই বাদ রাখা যাবে না। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা-কিছু, সব নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। কোনো অস্ত্র হাতে নিয়ে বেশিক্ষণ ঘুরতে পারবে না ও। কাজেই চট্ করে তুলে নিয়ে কাউকে আঘাত করতে পারে এমন ধরনের সব জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে

'ঠিক বলছেন,' বললেন এডাই। 'ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

'আর রাস্তায়—' বলে ইতস্তত করতে লাগলেন কেম্প।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে,' বললেন কেম্প। নিষ্ঠুর হবে

কাজটা, জানি। কিন্তু সুযোগ পেলে ও কী বীভৎস কাণ্ড ঘটাতে পারে, ভেবে দেখুন!'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে জোরে শ্বাস টানলেন এডাই। 'কাজটা ঠিক পুরুষোচিত হয় না। যা-ই হোক, কাচের গুঁড়ো রেডি থাকবে বেশি বাড়াবাড়ি দেখলে—'

'অমানুষ হয়ে গেছে ও,' বললেন কেম্প। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, পালাবার উত্তেজনাটা একটু কমে এলেই ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ছাড়বে। আগে-ভাগে সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ। মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ও নিজেকে। নিজের রক্ত দিয়ে ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

ছাব্বিশ

অন্ধ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে কেম্পের বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল অদৃশ্য মানব। একটা ছোট বাচ্চা খেলা করছিল গেটের কাছে। তাকে থপ্ করে তুলে নিয়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। বাচ্চাটার পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার আর কোনো হদিস কেউ পায়নি। কেউ জানে না, কোথায় গিয়েছে সে, কী করেছে। তবে পরবর্তী ঘটনা থেকে শুধু এটুকু অনুমান করা যায়, অসহ্য রাগে-দুঃখে-হতাশায় অধীর অদৃশ্য মানব কেম্পের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জুন মাসের তপ্ত রোদের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড় পেরিয়ে পোর্ট বারডকের পেছনে খোলা নিম্নভূমিতে গিয়ে হাজির হয়। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে হিনটনডীনের ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর আশ্রয় নিয়ে তার ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে যাওয়া পরিকল্পনা নতুন করে জোড়া দিতে বসে। কিন্তু নিশ্চিত করে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হারিয়ে যাবার পর থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ঠিক কোথায় কী করেছে সে।

এর মধ্যে দলে দলে ব্যস্ত মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাদের সংখ্যা। সকাল পর্যন্ত অদৃশ্য মানব ছিল অজানা ভয়ের বস্তু, অবিশ্বাস্য এক গুজবের মতো প্রায়। কিন্তু, বিশেষ করে কেম্পের সংক্ষিপ্ত গুরুগম্ভীর ঘোষণার ফলে, সে

এখন পরিণত হয়েছে বাস্তব এক শত্রুতে। যে-করেই হোক ঘায়েল করতে হবে তাকে, পরাস্ত করতে হবে—বন্দী করতে হবে। অভাবিত দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত লোকালয় জুড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বেলা দু'টোর মধ্যে অদৃশ্য মানব চেষ্টা করলে কোনো ট্রেনে চেপে এলাকা ছেড়ে হয়তো বা বেরিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু দু'টোর পর আর তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। সাউদ্যাম্পটন, ম্যানচেস্টার, ব্রাইটন এবং হর-শ্যাম নিয়ে বিশাল চতুর্ভুজাকার এলাকার মধ্যে সমস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল করছে রুদ্ধদ্বার অবস্থায়। মালপত্রবহনকারী প্রায় সমস্ত যান-বাহনের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পোর্ট বারডকের চার-পাশে বিশ মাইল এলাকার ভেতর বন্দুক-লাঠিসোটায় সজ্জিত অসংখ্য লোকজন তিন-চারজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কুকুরসহ রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে, ক্ষেত-খামারে ছড়িয়ে পড়েছে।

অশ্বারোহী পুলিসের লোক ছুটে চলেছে প্রতিটি গ্রামের রাস্তা বেয়ে। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে লোকজনকে সতর্ক করে দিচ্ছে তারা। দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে বলছে, নিরস্ত্র অবস্থায় বাইরে বেরোতে নিষেধ করছে। তিনটার মধ্যে সমস্ত স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়েরা গায়ে গায়ে সেঁটে ত্রস্তপায়ে বাড়ি ফিরছে। এডাইয়ের স্বাক্ষর করা কেম্পের ঘোষণা বিকেল চারটা-পাঁচটার মধ্যেই এলাকার প্রায় সর্বত্র সেঁটে দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঘোষণায়। অদৃশ্য মানবকে আহার-নিদ্রার সুযোগ না দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, সার্বক্ষণিক প্রহরার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অদৃশ্য শত্রুর উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র ত্বরিত ব্যবস্থা নেবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এত দ্রুত ও নিশ্চিত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং এতই

দ্রুত ও ব্যাপকভাবে অদ্ভুত এই শত্রুর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সূর্যাস্তের আগেই কয়েকশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নিশ্ছিদ্র অবরোধ তৈরি হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা নামতে তখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি রয়েছে। প্রহরারত সন্ত্রস্ত জনপদের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে গেল আতঙ্কের হিমশীতল স্রোত। ভয়ার্ত ফিসফিসানির ভেতর দিয়ে মুখে মুখে বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে পড়লো এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা।

অদৃশ্য মানব যদি সত্যি সত্যি হিনটনডীনের ঝোপঝাড়ের ভেতর আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, দুপুর গড়িয়ে গেলে হিংস্র কোনো পরিকল্পনা নিয়ে আবার সে নেমেছিল রাস্তায়। পরিকল্পনাটা ঠিক কী ছিল তা জানা না গেলেও সেটা যে মারাত্মক কিছু একটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ উইকস্টীডের মুখোমুখি যখন হয় সে, তখন তার হাতে ছিল একটি লোহার রড।

ঘটনার বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একটা পর্তের ধারে ঘটেছে ঘটনাটা—লর্ড বারডকের বাসভবনের গেট থেকে বড়জোর শ'দুয়েক গজ দূরে। একনজর তাকালেই ঘটনার প্রচণ্ডতা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। মাটিতে প্রচুর ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে, উইকস্টীডের সারা শরীরে অসংখ্য জখম, তার ছড়ি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু উন্মত্ত খুনের নেশার কথা বাদ দিলে এই পাশবিক আক্রমণের আর কোনো কারণ অনুমান করা শক্ত। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটাকে প্রায় অনিবার্যভাবে উন্মাদের কাণ্ড বলেই মনে হয়। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সের উইকস্টীড ছিল লর্ড বারডকের স্টুয়ার্ড। চেহারায় এবং স্বভাবে এমন নিরীহ গোছের ছিল লোকটা যে, তার পক্ষে এমন ভয়ঙ্কর এক শত্রুকে স্বেচ্ছায়

ঘাঁটানোর কথা কল্পনাই করা যায় না। এই উইকস্টীডের ওপরই ভাঙা একটা বেড়ার টুকরো থেকে খুলে নেয়া লোহার রড নিয়ে হামলা চালিয়েছে অদৃশ্য মানব। দুপুরের খাবার খেতে উইকস্টীড যখন ধীর পায়ে বাড়ি ফিরছিল তখনই অদৃশ্য শত্রু তার ওপর চড়াও হয়। তার নগণ্য প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে হাত ভেঙে ধরাশায়ী করে মাথা গুঁড়িয়ে দেয়। লোহার রডটা নিশ্চয় আগে থেকেই অদৃশ্য মানবের হাতে ছিল।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যে-গর্তের কিনারায় উইকস্টীডের মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেটা ঠিক তার বাড়ির পথে পড়ে না। পথ থেকে বেশ কয়েকশো গজ দূরে গর্তটা। পথের ওপর খুন করে মৃতদেহ টেনে গর্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে মাটিতে পরিষ্কার চিহ্ন থাকবার কথা। কিন্তু তেমন কোনো চিহ্ন আদৌ নেই। অর্থাৎ গর্তের ধারেই খুন হয়েছে উইকস্টীড। কেন গিয়েছিল সে ওখানে?

ব্যাখ্যাটা পাওয়া গেল অচিরেই। দুপুরের স্কুলে যাবার পথে ছোট একটি মেয়ে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি দেখতে পেয়েছিল নিহত লোকটিকে। উইকস্টীডকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে থেমে থেমে মাঠ পেরিয়ে ছুটতে দেখেছিল সে। মেয়েটির মূকাভিনয় থেকে বোঝা গেল, চলমান কোনকিছুর পেছন পেছন ছুটছিল উইকস্টীড, আর বার বার হাতের ছড়ি দিয়ে জিনিসটার ওপর ঘা দিচ্ছিল। জীবিতাবস্থায় তাকে শেষবারের মতো এই মেয়েটিই দেখতে পায়। মেয়েটির চোখের সামনে থেকে আড়াল হবার পর পরই খুন হয় সে। জায়গাটা সামান্য নিচু হওয়ায় আর কয়েকটি বীচগাছের আড়ালে থাকায় অল্পের জন্য মেয়েটি হত্যার দৃশ্য দেখতে পায়নি।

সম্পূর্ণ অকারণে ঠাণ্ডা মাথায় উইকস্টীডকে খুন করেনি অদৃশ্য

মানব, বোঝা গেল। লোহার রডটা অস্ত্র হিসেবেই হাতে নিয়েছিল সে, সন্দেহ নেই। তবে সেটা দিয়ে খুন করবার কোনো পরিকল্পনা হয়তো তার ছিল না। বাড়ি যাবার পথে রডটা হঠাৎ দেখতে পায় উইকস্টীড। সেটা আপনাআপনি ভেসে যাচ্ছে বাতাসে, দেখে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হয়ে যায় সে। পোর্ট বারডক ওখান থেকে দশ মাইল দূরে, হয়তো অদৃশ্য মানবের কথা তখন পর্যন্ত শোনেইনি সে। কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল চাপতে না পেরে সে লোহার রডের পিছু নিয়েছে। অদৃশ্য মানব চাইছিল নিঃশব্দে সন্তর্পণে চলে যেতে, তার উপস্থিতির কথা আশপাশের লোকজন জেনে ফেলুক তা সে চায়নি। ওদিকে উত্তেজিত কৌতূহলী উইকস্টীড উড়ন্ত রডের রহস্য বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ছড়ি দিয়ে সেটার ওপর ঘা মারতে শুরু করে।

উপায় থাকলে মাঝবয়েসী উইকস্টীডকে অদৃশ্য মানব নিঃসন্দেহে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু উইকস্টীডের দুর্ভাগ্য, সে অদৃশ্য মানবকে এমন এক বেকায়দা কোণে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, যার একদিকে গর্ত, অন্যদিকে দুর্ভেদ্য বিছুটির জঙ্গল। অদৃশ্য মানবের প্রচণ্ড বদমেজাজের কথা বিচার করলে পরের ঘটনা খুব সহজেই কল্পনা করে নেয়া যায়।

কিন্তু এ-সবই অনুমানমাত্র। এর কতটা ঠিক, কতটা ঠিক নয়, বলা শক্ত। অনস্বীকার্য বাস্তব শুধু এইটুকু : উইকস্টীডের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে গর্তের ধারে, আর রক্তাক্ত একটি লোহার রড খুঁজে পাওয়া গেছে বিছুটির জঙ্গলে। রড ছুঁড়ে ফেলা থেকে মনে হয়, যে-উদ্দেশ্যে ওটা হাতে নিয়েছিল অদৃশ্য মানব, উইক-স্টীডকে খুন করবার পর মানসিক উত্তেজনার বশেই হোক কিংবা

আর যে-কোনো কারণেই হোক, সে-উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে সে। এরপর সে সম্ভবত গ্রাম পেরিয়ে নিম্নভূমির দিকে রওনা হয়। ফার্ণ বটমের কাছে এক মাঠের ভেতর কয়েকজন লোক নাকি সূর্যাস্তের কিছু আগে একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। কখনো বিলাপ করছে সেই কণ্ঠ, কখনো হাসছে, কখনো ফোঁপাচ্ছে, কখনো আবার গোঙাচ্ছে। থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে জোরে। ক্লোভার-ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায় সেই ভূতুড়ে কণ্ঠ।

সেদিন বিকেলেই অদৃশ্য মানব নিশ্চয় জেনে গিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোনো বাড়ি-ঘরে ঢোকার রাস্তা পায়নি সে, হয়তো রেলস্টেশনে গিয়ে ঘোরাফেরা করেছে, ঘুর ঘুর করেছে বিভিন্ন সরাইখানার আশেপাশে। নিঃসন্দেহে পুলিসের বিজ্ঞপ্তিও পড়েছে সে—কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে কী ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। সন্ধ্যার দিকে সে অসংখ্য ছোট ছোট সশস্ত্র দলকে সমস্ত মাঠঘাট ছেয়ে ফেলতে দেখেছে, কুকুরের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। বিপদ বুঝে দূরে থেকেছে অদৃশ্য মানব। ঝুঁকি নেয়নি। তার নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি কার মাথা কাজ করছে সমস্ত আয়োজনের পেছনে নিজের সম্পর্কে স্বেচ্ছায় যে-সব তথ্য সে কেম্পকে দিয়েছে, সে-সবই এখন ক্ষমাহীনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে—তাকে ঘায়েল করবার চেষ্টায়।

সাতাশ

চটচটে কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা অদ্ভুত একটা চিঠি পড়ছেন কেম্প গভীর মনোযোগ দিয়ে।

'তোমার উদ্যম, কলাকৌশল আর চাতুর্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমার বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছো তুমি। জানি না তোমার এতে কী লাভ। পুরো একটি দিন তুমি আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছো, রাতের বিশ্রামটুকু থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করেছো। কিন্তু তোমার সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও আমার আহার বন্ধ থাকেনি। রাতে ঘুমিয়েছি আমি, তুমি বাধা দিতে পারোনি। এবং এ-শুধু খেলার শুরু—মাত্র শুরু হলো খেলা। আজ থেকে শুরু হলো ত্রাস। ত্রাসের প্রথম দিবস ঘোষণা করছি আমি। তোমার পুলিসের কর্ণেল এবং আরো যারা আছে সবাইকে বলে দাও, পোর্ট বারডক আজ থেকে আর রাণীর অধীন নয়, আজ থেকে পোর্ট বারডক আমার পদানত—মহাত্রাসের পদানত। শুরু হচ্ছে অদৃশ্য মানবের যুগ, নতুন যুগের প্রথম বর্ষের আজ প্রথম দিবস। আমি প্রথম অদৃশ্য মানব। আমার অভিষেকের মুহূর্তে দৃষ্টান্ত হিসেবে মাত্র একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে আজ। তার নাম কেম্প। তাকে আজ ছোবল দেবে কালমৃত্যু। ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে সে, যেখানে ইচ্ছে লুকিয়ে থাকতে পারে, প্রহরা বসাতে পারে নিজের চারপাশে, ইচ্ছে হ'লে দুর্ভেদ্য বর্ম পরে থাকতে পারে,—মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু তবু আসছে!

যতো ইচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করুক সে, তাতে বরং প্রজারা বুঝবে কতোখানি আমার ক্ষমতার পরিধি। লাল পিলার-বক্স থেকে আজ দুপুরে যাত্রা করবে লাল মৃত্যুর পরোয়ানা। গন্তব্যে পৌঁছুবে চিঠি, শুরু হবে খেলা। দণ্ডিতকে সাহায্য ক'রো না কেউ, নইলে তোমাদেরও ভাগ্যে জুটবে অমোঘ মৃত্যু।'

কেম্প আগাগোড়া দু'বার পড়লেন চিঠিটা। 'অন্য কারো ভাঁওতা নয়,' বললেন আপনমনে। 'ওরই লেখা! এবং শুধু মিথ্যে ভয়ও দেখায়নি।'

ভাঁজ-করা কাগজখানা উল্টে ঠিকানা-লেখা পিঠটায় চোখ বুলোলেন। হিনটনডীনের পোস্টমার্ক দেখা যাচ্ছে। কোনো টিকেট লাগানো হয়নি। দুই পেন্স দিয়ে ছাড় করতে হয়েছে। চিঠিটা এসেছে বেলা একটার ডাকে।

লাঞ্চ অসমাপ্ত রেখে উঠে পড়লেন কেম্প। স্টাডিতে গিয়ে বেল বাজিয়ে হাউসকীপারকে ডাকলেন জলদি বাসার সব জানালা-দরজার ছিটকিনি-খিল পরীক্ষা করে দেখতে বললেন তাকে এবং সমস্ত শাটার বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। স্টাডির শাটারগুলো বন্ধ করলেন তিনি নিজেই। বেডরুমের একটা চাবি-দেয়া ড্রয়ার খুলে বের করে নিলেন একটা ছোট রিভলভার। সাবধানে পরীক্ষা করে দেখে সেটা রেখে দিলেন লাউঞ্জ জ্যাকেটের পকেটে। দ্রুত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন। একটি লিখলেন কর্ণেল এডাইকে। চিঠিগুলো পরিচারিকার হাতে দিলেন জায়গামতো পৌঁছে দেবার জন্য। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সে-বিষয়ে তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিতে ভুললেন না। 'ভয়ের কিছু নেই,' বললেন তাকে, মনে মনে যোগ করলেন, 'তোমার জন্যে।'

পরিচারিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তার ভেতর ডুবে রইলেন কেম্প। তারপর নিচে নেমে প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসা খাবারের সামনে গিয়ে বসলেন আবার।

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে বেশ সময় নিয়ে লাঞ্চ শেষ করলেন কেম্প। কী যেন ভাবছেন গম্ভীরভাবে। শেষ পর্যন্ত টেবিলের ওপর সজোরে থাপ্পড় মেরে বলে উঠলেন, 'ঘায়েল করবোই ওকে আমরা! আমি থাকছি টোপ হিসেবে। ঝুঁকি নেবে ও, সন্দেহ নেই।'

ওপরে উঠে গেলেন তিনি। পথে যতগুলো দরজা পড়লো সাবধানে বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। 'অদ্ভুত খেলা,' আপনমনে বিড়বিড় করছেন কেম্প, 'কিন্তু, মিঃ গ্রিফিন, যতোই তুমি অদৃশ্য হও, পার পাবে না শেষ পর্যন্ত। জিত হবে আমারই।'

জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি একদৃষ্টিতে পাহাড়ের কোলে তাকিয়ে রইলেন। 'খাবার ও প্রতিদিনই পাবে—আমি হিংসে করছি না। কাল রাতে কি সত্যি ঘুমিয়েছে? হয়তো ঘুমিয়েছে, বাইরে খোলা জায়গায় কোথাও— যেখানে কারো যাবার সম্ভাবনা ছিল না। এই গরমের বদলে আবহাওয়া খুব স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা থাকতো যদি!'

একটু চুপ করে রইলেন কেম্প। তারপর ধীরে ধীরে আবার বললেন, 'হয়তো ঠিক এ-মুহূর্তে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ও।'

জানালার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ চৌকাঠের কিছু ওপরে ইঁটের দেয়ালে খুট্ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ভয়ানক চমকে উঠলেন কেম্প। 'নার্ভাস হয়ে পড়ছি,' ব'লে তাড়াতাড়ি সরে এলেন।

কিন্তু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। 'নিশ্চয় চড়ুই-টড়ুই হবে,' নিজেকে আশ্বস্ত কর-

বার সুরে বললেন মৃদু গলায়।

সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলেন কেম্প। দরজার ছিটকিনি এবং লক খুলে শেকল তুলে দিলেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে সামান্য ফাঁক করলেন দরজা।

'আপনার পরিচারিকার ওপর হামলা হয়েছে, কেম্প,' দরজার ওপাশ থেকে কর্ণেল এডাইয়ের কণ্ঠ ভেসে এলো।

'কী বললেন!' আর্তনাদ করে উঠলেন কেম্প।

'আপনার চিঠি কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে। কাছাকাছিই আছে সে কোথাও। ঢুকতে দিন আমাকে।'

কেম্প শেকল খুলে দিলেন। দরজা যতোটা সম্ভব কম ঠেলে সরু ফাঁক গ'লে ভেতরে ঢুকলেন এডাই। কেম্প আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন ভালোভাবে। হলঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এডাই বললেন, 'চিঠিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে মেয়েলোকটা। পুলিস স্টেশনে শুয়ে আছে। প্রলাপ বকছে।—কী লিখেছিলেন চিঠিতে?'

একগাদা অভিসম্পাত বেরুলো কেম্পের মুখ থেকে।

'কী বোকামি যে করেছি,' বললেন তিনি। 'আগেই ভাবা উচিত ছিল! হিনটনডীন থেকে এখানে হেঁটে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবার কথা নয়। কাজেই এরই মধ্যে নিশ্চয়—'

'কী হয়েছে?' বললেন এডাই উদ্বিগ্ন স্বরে।

'চলুন দেখবেন,' বলে এডাইকে সঙ্গে নিয়ে স্টাডিতে চলে এলেন কেম্প। অদৃশ্য মানবের চিঠিটা দিলেন তাঁর হাতে।

এডাইয়ের কপাল কুঁচকে উঠলো চিঠিটা পড়তে পড়তে। 'এবং এটা পেয়ে আপনি—'

'ফাঁদ পাতবার পরিকল্পনা করেছি,' বললেন কেম্প, 'এবং নির্বোধের মতো পরিচারিকার হাত দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছি আপনার কাছে। এখন দেখছি চিঠিটা আসলে—'

কেম্পের হঠকারিতা বুঝতে পারলেন এডাই। 'পালাবে এখন,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'না, তেমন লোক ও নয়।' কেম্পের কথা শেষ হবার আগেই ঝনঝন ক'রে কাচ ভাঙার শব্দ ভেসে এলো ওপরতলা থেকে। চমকে উঠলেন দু'জন। কেম্পের পকেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা ছোট চকচকে রিভলভারটার দিকে আড়চোখে তাকালেন এডাই।

'জানালা···ওপরতলায়!' ব'লে আগে আগে ছুটলেন কেম্প। সিঁড়ির অর্ধেকমাত্র পেরোতেই আবার একইরকম শব্দ হলো।

স্টাডির তিনটি জানালার ভেতর দু'টির কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রুমের অর্ধেকটা ভর্তি হয়ে আছে ভাঙা কাচের টুকরোয়। লেখার টেবিলের ওপর পড়ে আছে বড় একখণ্ড পাথর। হতবাক হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কেম্প ও এডাই। আবার অভিসম্পাত বেরিয়ে এলো কেম্পের মুখ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাশ্ করে একটা শব্দ হলো। তৃতীয় জানালার কাচ চৌচির হয়ে ঝুলে রইলো এক মুহূর্ত, তারপর ঝনঝন করে ঝ'রে পড়লো অসংখ্য চকচকে ধারালো ত্রিভুজের আকৃতি নিয়ে।

'মানে কী এসবের?' বললেন এডাই।

'সূচনা,' কেম্প বললেন।

'এখানে বেয়ে ওঠা যায় না তো?'

'বেড়ালের পক্ষেও সম্ভব নয়,' বললেন কেম্প।

'জানালার শাটার নেই?'

'এ-ঘরে নেই। নিচতলার সব ঘরে—'

কেম্পের কথা শেষ হবার আগেই আওয়াজ এলো নিচ থেকে। প্রথমে কাচ ভাঙার আওয়াজ, তারপর কাঠের তক্তায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ।

'জানোয়ার!' বলে উঠলেন কেম্প। 'নিশ্চয়—হ্যাঁ—কোনো একটা বেডরুমই হবে। সারা বাড়ির জানালা ভাঙতে চায়! কিন্তু গর্দভের মতো কাজ করছে ও। শাটার লাগানো আছে। ভাঙা কাচ বাইরে পড়বে। পা কাটবে ওরই।'

আরো একটা জানালা ধ্বংস হলো। কেম্প, এডাই দু'জনই হতভম্ব হয়ে ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'ঠিক আছে!' বলে উঠলেন এডাই। 'লাঠি-সোটা কিছু একটা দিন আমাকে, স্টেশনে গিয়ে কয়েকটা ব্লাডহাউণ্ড লেলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি ঠাণ্ডা না হয়ে যাবে কোথায়! কাছেই আছে কুকুরগুলো, দশ মিনিটও—'

বলতে না বলতে আরেকটি জানালার একই দশা হলো।

'আপনার কাছে রিভলভার হবে না?' আচমকা জিজ্ঞেস করলেন এডাই।

কেম্পের হাত চলে গেল পকেটে। এবং পরক্ষণে একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল তাঁর মধ্যে। 'না, নেই—মানে দেবার মতো নেই একটাও।'

'আবার ফেরত নিয়ে আসছি এখুনি,' বললেন এডাই, 'ঘরের ভেতর আপনি এমনিতেই নিরাপদে থাকবেন।'

অস্ত্রটা বের করে দিলেন কেম্প।

'এখন দরজা খুলতে হবে খুব সাবধানে,' বললেন এডাই।

এডাইকে নিয়ে হলঘরে দাঁড়িয়ে আছেন কেম্প। দু'জনেরই ইতস্তত ভাব। হুট করে দরজা খুলতে সাহস হচ্ছে না। নিচতলার পর দোতলার একটা বেডরুমের জানালার দফা রফা হচ্ছে এখন একটার পর একটা সশব্দে। কেম্প এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। যতোটা নিঃশব্দে সম্ভব ছিটকিনিগুলো খুলতে শুরু করলেন। কিছুটা যেন ফ্যাকাশে লাগছে এখন তাঁর মুখ।

'সোজা বেরিয়ে পড়বেন,' ফিসফিস করে বললেন কেম্প।

পরমুহূর্তে ফাঁক হলো দরজা। চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেন এডাই। ছিটকিনিগুলো আবার দ্রুত লেগে গেল।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এডাই। দরজার দিক থেকে পিঠ সরাতে ইচ্ছে করছে না। পরক্ষণে ঋজু ভঙ্গিতে দৃঢ় পায়ে সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন তিনি। লন পেরিয়ে এগোলেন গেটের দিকে। মনে হলো, সামান্য একটু বাতাস বয়ে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে। কী যেন নড়ে উঠলো কাছেই।

'একটু দাঁড়াও,' একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এডাই। হাত চেপে বসলো পকেটের রিভলভারের ওপর। 'বলো?' বিবর্ণ থমথমে হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। টান টান হয়ে গেছে সমস্ত স্নায়ু।

'দয়া করে বাড়ির ভেতর ফিরে যাও,' এডাইয়ের কণ্ঠের মতোই থমথমে সতর্ক একটা স্বর শোনা গেল।

'দুঃখিত,' কিছুটা কর্কশভাবে বললেন এডাই। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। বাঁ-দিক থেকে আসছে গলাটা, লক্ষ্য করলেন তিনি। কপাল ভরসা করে একবার দেখবেন নাকি গুলি ছুঁড়ে?

'কোথায় যাচ্ছো?' আবার প্রশ্ন এলো।

এডাই একটু নড়ে উঠতেই রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠলো তাঁর পকেটের খোলা মুখ। ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখে তিনি ভাবলেন কিছু-ক্ষণ! 'যেখানেই যাই,' বললেন ধীরে ধীরে, 'সেটা আমার নিজের ব্যাপার।'

কথাগুলো ঠোঁটের ওপর থাকতেই সতর্কিতে পেছন থেকে একটা অদৃশ্য হাত এসে গলা পেঁচিয়ে ধরলো তাঁর। পেছনে হাঁটুর একটা শক্ত গুঁতো খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। রিভলভারটা কোনরকমভাবে বের করে ট্রিগার টিপে দিলেন লক্ষ্য-হীনভাবে। পরক্ষণে একটা ঘুসি এসে পড়লো তাঁর মুখে। মুঠি থেকে রিভলভারটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়া হলো। পিচ্ছিল একটা শরীর আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তিনি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে অবিলম্বে আবার ধরাশায়ী হলেন।

কুটিল একটা হাসি শোনা গেল। 'বুলেট নষ্ট করতে চাই না। নইলে তোমাকে খুন করতাম এক্ষুণি,' কথাটার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে গেল রিভলভার। ছ'ফুট দূর থেকে সেটা স্থির চেয়ে আছে এডাইয়ের দিকে।

উঠে বসলেন এডাই।

'দাঁড়াও,' আদেশ হলো।

এডাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'শোনো,' বলেই ক্রোধে ফেটে পড়লো অদৃশ্য কণ্ঠ, 'কোনরকম চালাকির চেষ্টা ক'রো না। মনে রেখো, তুমি আমার মুখ দেখতে না পেলেও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখ। এই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর ফিরে যাবে তুমি।'

'আমাকে ঢুকতে দেবে না,' বললেন এডাই

'তাহলে তোমার ভাগ্য খারাপ বলতে হবে,' বললো অদৃশ্য

মানব। 'কারণ এমনিতে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।'

আবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন এডাই। রিভলভারের নলের ওপর থেকে তাঁর দৃষ্টি সরে গিয়ে নিবদ্ধ হলো দূরের দিগন্তে। দুপুরের রোদ-ঝলসানো আকাশের নিচে স্থির হয়ে আছে ঘন নীল সমুদ্র। সমুদ্রতীরের ধবল খাড়া পাহাড়, মসৃণ সবুজ উপত্যকা, বিস্তীর্ণ জনপদ—সবকিছু ছুঁয়ে এলো তাঁর দৃষ্টি। হঠাৎ জীবন বড়ো মধুর মনে হলো তাঁর কাছে। চোখ আবার এসে স্থির হলো ছ'ফুট দূরে শূন্যে ভাসমান ছোট্ট ধাতব জিনিসটির ওপর।

'কী করতে হবে আমাকে?' ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আমার হাতে কোনো বিকল্প নেই,' অদৃশ্য মানব বললো। বেরোতে দিলে তুমি গিয়ে লোকজন নিয়ে আসবে। কাজেই এখন তোমার একটাই কাজ, সোজা আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়া।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখছি,' বললেন এডাই। 'তবে আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাকে ঢুকতে দেয়া হয় যদি, তুমি আচমকা ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করবে না।'

'তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই,' উত্তর এলো।

এডাই বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কেম্প দৌড়ে ওপরতলায় উঠে গেছেন স্টাডিতে ভাঙা কাচের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে সাবধানে জানালার চৌকাঠের ওপর দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এডাই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে। 'গুলি করছে না কেন?' ফিসফিস করে বললেন কেম্প। ঠিক এই সময় অদৃশ্য মানবের হাতে ধরা রিভলভারটা একটু নড়ে উঠতেই রোদের ঝলক এসে লাগলো কেম্পের চোখে। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে তিনি চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলকের উৎস

বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'ঠিক!' চাপা গলায় বলে উঠলেন কেম্প। 'রিভলভার হাতছাড়া হয়ে গেছে এডাইয়ের।'

'বলো, আচমকা ঢুকে পড়বে না?' এডাই বলছেন।

'তুমি ভেতরে ঢুকবে কিনা বলো। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, কোনো প্রতিজ্ঞা-ট্রতিজ্ঞা আমি করবো না।'

যেন হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন এডাই। বাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে দু'হাত বেঁধে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছেন কেম্প। আরো দু'বার আলোর ঝিলিক দেখতে পেলেন। ভালোভাবে লক্ষ্য করে অবশেষে আবিষ্কার করলেন, ছোট্ট একটা কালো বস্তু এডাইয়ের পিছু পিছু এগিয়ে আসছে শূন্যের ভেতর দিয়ে। আলো পড়ে ঝলসে উঠছে বার বার।

এর পরের ব্যাপারগুলো ঘটে গেল খুব দ্রুত। আচমকা এডাই লাফ দিলেন পেছন দিকে, চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাবা মারলেন রিভলভার লক্ষ্য করে। পারলেন না ধরতে। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ শোনা গেল। দু'হাত শূন্যে তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন এডাই ঘাসের ওপর গা মুচড়ে এক হাতে ভর দিয়ে শরীরটা সামান্য তুললেন মাটি থেকে। তারপর আবার হুমড়ি খেয়ে পড়েই স্থির হয়ে গেলেন।

নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন কেম্প। চারদিক গুমোট হয়ে আছে। সবকিছু স্থির, নিষ্কম্প। শুধু দু'টো হলুদ প্রজাপতি আঙিনার ঝোপের ভেতর পরস্পরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গেটের কাছে অনড় পড়ে আছেন এডাই। পাহাড়ের রাস্তা বরাবর সমস্ত বাড়ির জানালা পর্দায় ঢাকা। শুধুমাত্র একটা ছোট্ট সবুজ সামারহাউসের ভেতর

শাদা কিছু একটা চোখে পড়ছে, সম্ভবত একজন বুড়োলোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কেম্প বাড়ির চারপাশটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। রিভলভারটা চোখে পড়লো না। এডাইয়ের ওপর গিয়ে স্থির হলো তাঁর চোখ। খেলার শুরুটা বেশ।

সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘা পড়তে শুরু করলো—প্রথমে মৃদু, তারপর জোরে জোরে। কেউ সাড়া দিচ্ছে না ভেতর থেকে। কেম্পের নির্দেশমতো পরিচারকের দল যার যার ঘরে খিল এঁটে দিয়ে বসে রয়েছে। একটু পরে শব্দ থেমে গেল। কিছুক্ষণ কান পেতে বসে থাকবার পর কেম্প সাবধানে একের পর এক তিনটি জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে অস্বস্তি নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেডরুমের ফায়ারপ্লেস থেকে আগুন খোঁচাবার শিকটা হাতে নিয়ে নিচতলার জানালাগুলো পরীক্ষা করতে গেলেন। সবকিছু নিরাপদ, স্বাভাবিক রয়েছে দেখে আবার ফিরে এলেন ওপরে। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, নুড়ি বিছানো পথের ধারে ঠিক তেমনি মুখ থুবড়ে স্থির পড়ে রয়েছেন এডাই। দূরে তাকাতেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো কেম্পের দৃষ্টি। দূরের ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে অসুস্থ পরিচারিকা এবং দু'জন পুলিস।

সবকিছু অস্বাভাবিক শান্ত চারদিকে। এত বেশি মন্থর পায়ে আসছে কেন ওরা তিনজন? অদৃশ্য মানব কী করছে এত চুপচাপ?

চমকে উঠলেন কেম্প। ভারি একটা আওয়াজ ভেসে এলো নিচতলা থেকে। একটু ইতস্তত করে আবার নিচে নেমে গেলেন তিনি। হঠাৎ একের পর এক প্রচণ্ড আঘাতের শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠলো। একটা ধাতব সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জানালার শাটার খুলে

আসবার মড়মড় শব্দ শোনা গেল। শব্দ লক্ষ্য করে কিচেনের দিকে ছুটে গেলেন কেম্প। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলামাত্র ভেতরের জানালার চূর্ণবিচূর্ণ শাটার উড়ে এসে পড়লো মেঝের ওপর। রক্তশূন্য হয়ে গেল কেম্পের মুখ। জানালার ফ্রেম এখনো মোটামুটি অক্ষত রয়েছে, তবে তার সঙ্গে কাচ বলতে শুধু ছোট ছোট ভাঙা কয়েকটা টুকরো লেগে আছে। একখানা কুড়ুল অনবরত সশব্দে আঘাত হেনে যাচ্ছে ফ্রেমের ওপর, থেকে থেকে কোপ পড়ছে আরো ভেতরে লোহার শিকগুলোর ওপর—স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে উঠছে। হঠাৎ কুড়ুলটা ছিটকে এক-পাশে স'রে গিয়ে আড়াল হয়ে গেল। বাইরে পথের ওপর পড়ে থাকা রিভলভারটা ঠিক সময়মতো চোখে পড়লো কেম্পের। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে ছোট্ট অস্ত্রটা। বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে এলেন কেম্প গুলির শব্দ হলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, দরজা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছেন কেম্প। দরজার কিনারায় গুলি লেগে কাঠের একটা টুকরো ছিটকে উড়ে চলে গেল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে। ত্রস্তহাতে তিনি দরজার চাবি লাগিয়ে দিলেন। বন্ধ দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন গ্রিফিনের চিৎকার এবং অট্টহাসি। আবার শুরু হলো উপর্যুপরি কুড়ুলের আঘাত আর ভাঙচুরের শব্দ।

প্যাসেজের ভেতর দাঁড়িয়ে কেম্প ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করবার চেষ্টা করছেন। কিচেনের ভেতর এক্ষুনি ঢুকে পড়বে অদৃশ্য মানব। এপাশের দরজা ভাঙতেও সময় লাগবেনা তার। তারপর—

আবার সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। নিশ্চয় পুলিসগুলো এসে গেছে। এক দৌড়ে হলঘরে চলে গেলেন কেম্প। দরজার শেকল তুলে দিলেন প্রথমে। তারপর ছিটকিনি খুললেন। পরিচারিকার গলা শুনে নিশ্চিত হয়ে শেকল নামিয়ে সাবধানে দরজা মেলে ধরলেন

খানিকটা। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তিনজন একযোগে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন কেম্প।

'অদৃশ্য মানব!' উত্তেজিত স্বরে বললেন কেম্প। 'রিভলভার আছে হাতে, দুটো গুলি আছে এখনও। এডাইকে খুন করেছে। দেখোনি লনে? লাশ পড়ে আছে।'

'কে খুন হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো একজন পুলিস।

'এডাই,' বললেন কেম্প।

'ঘুরে পেছনের পথ দিয়ে এসেছি আমরা,' পরিচারিকা বললো।

'ভাঙছে কী?' জিজ্ঞেস করলো আরেকজন পুলিস।

'জানালা ভেঙে কিচেনে ঢুকে পড়েছে—কিংবা ঢুকে পড়বে এখুনি। কোত্থেকে একটা কুড়ুল—'

কেম্পের কথা শেষ না হতেই কিচেনের দরজায় দমাদম কুড়ুলের কোপ পড়তে শুরু করলো। সভয়ে কিচেনের দিকে ফিরে তাকালো সবাই। পরিচারিকা মেয়েটির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে এক দৌড়ে ডাইনিং-রুমের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। কেম্প টুকরো টুকরো কথা দিয়ে পুলিস দু'জনের কাছে দ্রুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। এমন সময় মড়মড় করে ভেঙে পড়লো কিচেনের দরজা।

মুহূর্তে সচল হয়ে উঠলেন কেম্প। 'দৌড় দাও!' পুলিস দু'জনকে ডাইনিং-রুমের ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়লেন।

'পোকার!' ব'লে ফায়ারপ্লেসের দিকে ছুটে গেলেন তিনি। একটা ক'রে আগুন খোঁচাবার শিক পুলিস দু'জনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অক-স্মাৎ ছিটকে সরে গেলেন পেছনে।

'ঠিক!' মাথা নিচু করে একজন পুলিস কুড়ুলের একটা কোপ

ঠেকিয়ে দিলো পোকার দিয়ে। প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠলো পিস্তল। সিডনি কুপারের দামি একটা চিত্রকর্ম ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেল। বিন্দুমাত্র দেরি না করে আরেকজন পুলিস ধাঁই করে তার হাতের পোকার চালালো ছোট্ট অস্ত্রটা লক্ষ্য করে। ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গড়িয়ে চলে গেল রিভলভারটা।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে মেয়েটা। হঠাৎ দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে বন্ধ শাটার ধরে পাগলের মতো টানা-হ্যাঁচড়া করতে শুরু করলো। শাটার খুলে পালাতে চাইছে ও।

কুড়ুলটা প্যাসেজের ভেতর সরে গেছে। ঝুলে আছে মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচুতে। অদৃশ্য মানবের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'সরে দাঁড়াও তোমরা দু'জন!' হিংস্র গর্জন ভেসে এলো। 'কেম্পকে চাই আমি।'

'আমরা চাই তোমাকে,' বলেই প্রথম পুলিসটা অতর্কিতে এক পা সামনে বাড়িয়ে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে পোকার চালালো। বোধ হয় প্রস্তুত ছিল অদৃশ্য মানব লাফ দিয়ে পিছিয়ে যেতে দেখা গেল কুড়ুলটাকে। অদৃশ্য দেহের ধাক্কায় ছাতার স্ট্যাণ্ড সশব্দে উল্টে পড়ে গেল। পুলিসটা তাল সামলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই অদৃশ্য মানবের কুড়ুল প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো তার মাথায়। কাগজের মতো দুমড়ে গেল হেলমেট, ঘুরে পড়ে গেল সে কিচেনের সিঁড়ির মাথায়। চোখের পলকে দ্বিতীয় পুলিস পোকার চালালো কুড়ুলের পেছন দিকের শূন্য জায়গায়। থ্যাচ্ করে নরম কিছু একটার ভেতর গেঁথে গেল ধারালো শিকটা। অমানুষিক একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুলটা মাটিতে পড়ে গেল। আবার শূন্যের ভেতর পোকার ঘোরালো পুলিসটা, কিন্তু কোনকিছুর নাগাল

পেলো না। কুড়ুলের ওপর পা চাপা দিয়ে আবার এদিক-ওদিক খুঁজলো কিছুক্ষণ। তারপর পোকার উঁচিয়ে ধরে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ডাইনিং-রুমের জানালা খোলার শব্দ কানে এলো তার। ভেতরে দ্রুত পায়ের আওয়াজ উঠেই মিলিয়ে গেল।

গড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো আহত পুলিসটা। তার চোখ এবং কান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। 'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'জানি না। জখম করেছি আমি। হলঘরের ভেতর কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়—যদি তোমার পাশ কাটিয়ে না সরে পড়ে থাকে।' একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকালো পুলিসটা।—'ডক্টর কেম্প —স্যার!'

কোনো উত্তর নেই।

'ডক্টর কেম্প!' আবার হাঁক দিলো সে।

আহত পুলিস টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ খালি পায়ের ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া গেল রান্নাঘরের সিঁড়িতে। প্রথম পুলিস চিৎকার করে উঠে সবেগে ছুঁড়ে দিলো হাতের পোকার। ছোট একটা গ্যাস ব্র্যাকেট চুরমার হয়ে গেল সেটার ঘায়ে। অদৃশ্য মানবের পিছু ধাওয়া করতে গিয়েও কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ফিরে এসে ডাইনিং-রুমের ভেতর ঢুকলো।

'ডক্টর কেম্প,' বলেই থেমে গেল সে। সামনের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বললো, 'বুঝেছি—'

আহত পুলিসটা এসে উঁকি দিলো তার কাঁধের ওপর দিয়ে।

ডাইনিং-রুমের জানালাটা হাট করে খোলা। পরিচারিকা কিংবা কেম্প কারো ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

আটাশ

ভিলার মালিকদের ভেতর কেম্পের নিকটতম প্রতিবেশী হীলাস ঘুমোচ্ছিল তার সামার হাউসে শুয়ে। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে যে-গুটিকয় ব্যক্তি অদৃশ্য মানবের পুরো কাহিনী 'ছাইভস্ম' বলে উড়িয়ে দিয়েছে, হীলাস তাদের একজন। তার স্ত্রীর বিশ্বাস অবশ্য একেবারে উল্টো। কিন্তু স্ত্রীর কথা সে গায়ে মাখেনি। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভঙ্গিতে সকালে বাগানে পায়চারি করে বেড়িয়েছে সে। দুপুরের পর চিরদিনের অভ্যেস অনুযায়ী দিবানিদ্রায় মগ্ন হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হীলাসের। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো তার। তার মন বলছে, কোথাও কিছু একটা সাংঘাতিক গোলমাল হয়েছে। জানালা দিয়ে কেম্পের বাড়ির দিকে তাকালো হীলাস। চমকে উঠলো ভয়ানকভাবে। চোখদু'টো রগড়ে ভালো করে তাকালো আবার। দু'পা মেঝেতে নামিয়ে কান খাড়া করে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলো। কেনো ভুল নেই—যদিও অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা। মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেছে কেম্পের বাড়িটাকে ঘিরে, তারপর বড়িটা বিরান পড়ে রয়েছে বহুদিন। প্রত্যেকটা জানালার কাচ ভাঙা, এবং শুধু স্টাডির জানালাগুলো ছাড়া বাড়ির প্রত্যেকটি জানালার ভেতরের শাটার বন্ধ।

'বিশ মিনিট আগেও সব ঠিক ছিল,' ঘড়ির দিকে চেয়ে বিড়বিড়

করে বললো হীলাস। 'বাজি রেখে বলতে পারি আমি।'

বহু দূর থেকে ভেসে আসা উপর্যুপরি আঘাতের ক্ষীণ শব্দ এবার কানে পৌঁছুলো হীলাসের। হাঁ ক'রে তাকিয়ে বসে রইলো সে কী করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ আরো অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়লো তার। আচমকা খুলে গেল ড্রইং-রুমের জানালার বন্ধ শাটার। জানালায় দেখা গেল বাড়ির পরিচারিকাকে। তার পরনে বাইরে বেরোবার পোশাক, মাথায় হ্যাট। জানালার শাসি তোলার চেষ্টা করছে সে পাগলের মতো। এমন সময় আরো একজন লোক এসে দাঁড়ালো তার পাশে—ডক্টর কেম্প। পরমুহূর্তে খুলে গেল জানালা। মেয়েটা বাইরে লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখে হীলাস তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে। ততক্ষণে কেম্পও জানালার চৌকাঠ থেকে লাফ দিয়ে পড়েছেন ঝোপের ভেতর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা গেল তাঁকে। যেন কারো নজর এড়াতে চাইছেন এমনভাবে মাথা নিচু করে তীরবেগে ছুটছেন ঝোপঝাড়ের ভেতরের একটা পথ ধরে। একটা ল্যাবারনাম গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। এরপর আবার দেখা গেল তাঁকে বাড়ির প্রান্তসীমায়। বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। বেড়ার এপাশে লাফ দিয়ে গড়িয়ে পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে শুরু করলেন হীলাসের বাড়ি লক্ষ্য করে।

'ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠলো হীলাস। 'সেই অদৃশ্য মানব জানোয়ারটা নিশ্চয়! কথাটা মিথ্যে নয় তাহলে!'

তিন লাফে সামার হাউস থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটলো সে। দেখতে দেখতে ধুমধাম বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো সমস্ত

দরজা, ঘণ্টা বেজে উঠলো। ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে হীলাস, 'জলদি দরজা লাগাও, জানালা বন্ধ করো, সব বন্ধ করো! অদৃশ্য মানব আসছে! জলদি!'

চোখের নিমেষে গোটা বাড়ি জুড়ে কোলাহল, চিৎকার; দৌড়া-দৌড়ি শুরু হয়ে গেল। হীলাস নিজে দৌড়ে গেল বারান্দার দিকের ফ্রেঞ্চ উইনডো বন্ধ করতে। ঠিক সে-সময় বাগানের বেড়ার ওপাশ থেকে উদয় হলো কেম্পের মাথা, কাঁধ, হাঁটু। পরের মুহূর্তে অ্যাস-প্যারাগাসের ক্ষেত মাড়িয়ে টেনিস লন পার হয়ে বাড়ির কাছে এসে পড়লেন তিনি।

'ভেতরে ঢোকা হবে না আপনার,' দ্রুত ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে বলে উঠলো হীলাস। 'অদৃশ্য মানব আপনাকে ধাওয়া করে থাকলে খুব দুঃখিত আমি, কিন্তু ভেতরে ঢোকা চলবে না আপনার!'

কাচের ঠিক ওপাশেই কেম্পের ভয়ার্ত মুখ। অবিরাম ঘা দিচ্ছেন তিনি, ফ্রেঞ্চ উইনডো ধরে নাড়া দিচ্ছেন পাগলের মতো। লাভ নেই বুঝতে পেরে দৌড়ে বারান্দার শেষ মাথায় চলে গেলেন। দু'হাতে রেলিংয়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে ছুটে গিয়ে পাশের দরজায় ঘা দিতে লাগলেন জোরে জোরে। সেখান থেকে পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে চলে গেলেন বাড়ির সামনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেলেন পাহাড়ের রাস্তায়।

হীলাস ফ্রেঞ্চ উইনডো ছেড়ে নড়েনি। কেম্প অদৃশ্য হতে না হতেই সামনে তাকিয়ে জমে গেল সে। আতঙ্কে দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। অ্যাসপ্যারাগাস মাড়িয়ে ছুটে আসছে অদৃশ্য দু'টি পা। সার বেঁধে পিষে যাচ্ছে গাছগুলো, তাছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে

হীলাস সোজা ছুটলো ওপরতলায়। সিঁড়ির জানালা পার হবার সময় পাশের গেটের একটা ঘটাং শব্দ শুধু তার কানে এলো।

পাহাড়ের রাস্তায় পৌঁছে কেম্প স্বাভাবিকভাবেই নিচের দিকে ছুটেছেন। অভ্যেস না থাকলেও বেশ জোরেই ছুটছেন তিনি। মুখ শাদা হয়ে গেছে, ঘাম ঝরছে দর দর করে, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন পুরোপুরি। লম্বা লম্বা পা ফেলছেন—এবড়ো-খেবড়ো মাটি, পাথর কিংবা ভাঙা কাচের টুকরো চোখে পড়ামাত্র লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছেন নিরাপদে। পেছনে অদৃশ্য খালি পা ছুটে আসছে একই পথ ধরে।

জীবনে প্রথম কেম্পের মনে হলো, অসম্ভব বিস্তৃত আর বিরান এই পাহাড়ের রাস্তা, এখান থেকে যোজন যোজন দূরে পাহাড়ের নিচের ওই শহরের প্রান্ত। বিদ্রোহ করতে চাইছে পা-দু'টো। মনে হচ্ছে, দৌড়ই হলো দূরত্ব অতিক্রমের সবচেয়ে যন্ত্রণাকর আর মন্থর উপায়। চারপাশের নিস্তব্ধ ঘরবাড়ি পড়ন্ত রোদে তন্দ্রাচ্ছন্ন অসাড় হয়ে আছে। কেম্পেরই নির্দেশে সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়েছে—সন্দেহ নেই। তবু ক্ষীণ আশা জাগছে কেম্পের মনে, কেউ হয়তো বাইরে নজর রাখতে পারে এ-ধরনের কোনো দুর্বিপাকের আশঙ্কায়

ধীরে ধীরে শহর উঠে আসছে চোখের সামনে। শহরের পেছনে সমুদ্র আড়াল হয়ে গেছে। নিচে চোখে পড়ছে লোকজনের আনাগোনা। একটা ট্রাম মাত্র এসে দাঁড়ালো পাহাড়ের গোড়ায়। ট্রামলাইন ছেড়ে আর কিছুদূর এগোলেই পুলিস স্টেশন।—চমকে উঠলেন কেম্প। পেছনে কি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে? আরো বাড়িয়ে দিলেন তিনি ছোটার গতি।

নিচের লোকজন দেখতে পেয়েছে তাঁকে। প্রায় সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে দু'একজন। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে কেম্পের। মনে হচ্ছে, ধারালো করাত চলছে গলার ভেতরে। ট্রামটা বেশ কাছে এসে পড়েছে এখন। দুমদাম শব্দে জলি ক্রিকেটার্স-এর সব দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেম্প একবার মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন লাফ দিয়ে ট্রামের ভেতর উঠে দরজা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু পুলিস স্টেশনেই ওঠার সিদ্ধান্ত নিলেন শেষ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে জলি ক্রিকেটার্স-এর দরজা পেরিয়ে রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো শেষ মাথায় ভিড়ের ভেতর গিয়ে পড়লেন তিনি। কেম্পের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় দেখে ট্রামের ড্রাইভার আর তার হেলপার হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ঘোড়াগুলো ট্রাম থেকে খুলে ছেড়ে দিতেও ভুলে গেছে তারা। ট্রামলাইন ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে খোটা-খুঁটি আর নুড়িপাথরের স্তূপ—নর্দমার কাজ চলছে। নুড়িপাথরের ঢিবিগুলোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে চেয়ে আছে হতভম্ব মজুরের দল।

একটু কমে এসেছিল কেম্পের গতি, পেছনে দ্রুতধাবমান পায়ের শব্দ শুনে আবার এক লাফে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'অদৃশ্য মানব!' ছুটতে ছুটতে কেম্প মজুরদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন অস্পষ্ট ইশারা ক'রে। এক লাফে পার হয়ে গেলেন সদ্য-খোঁড়া নর্দমা। এখন তাঁর ও গ্রিফিনের মাঝখানে একদল তাগড়া জোয়ান। পুলিস স্টেশনে যাবার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিয়ে আচমকা পাশের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়লেন তিনি। সবজির গাড়ি যাচ্ছিল, পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা মিষ্টির দোকানের দরজায় এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দৌড় দিলেন একটা গলির মুখ লক্ষ্য করে। গলিটা সোজা গিয়ে

মিশেছে আবার সেই মূল হিল স্ট্রীটে। দু'তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল গলির ভেতর। কেম্পের ছুটন্ত ঝোড়ো মূর্তি দেখে ভয়ে চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বেশ কয়েকটা দরজা-জানালা, বাচ্চাদের চিৎকারের সঙ্গে যোগ হলো মায়েদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। আবার হিল স্ট্রীটে এসে পড়লেন কেম্প—ট্রাম-লাইনের শুরু থেকে তিনশো গজ দূরে। প্রচণ্ড কোলাহলে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হলো তাঁর। ছুটছে সবাই।

মুখ তুলে পাহাড়ের দিকের রাস্তা বরাবর তাকালেন কেম্প। দশ-বারো গজ দূরে প্রকাণ্ডদেহী এক মজুর ছুটে চলেছে। ভাঙা ভাঙা অবিশ্রান্ত খিস্তি বেরোচ্ছে তার মুখ দিয়ে। বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে হাতের কোদাল। তার ঠিক পেছনেই ট্রামের কনডাকটর ছুটছে ঘুসি পাকিয়ে। তাদের দু'জনের পেছনে চেঁচামেচি করতে করতে আরো লোকজন দৌড়ুচ্ছে রাস্তা ধ'রে। এদিকে শহরের রাস্তায় ছোটাছুটি করছে মেয়ে-পুরুষের দল। একটা দোকানের দরজা ঠেলে একজন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো লাঠি হাতে।

'ছড়িয়ে পড়ো! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো সবাই!' চিৎকার করে বললো কে যেন।

অকস্মাৎ অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কেম্পের কাছে। সবাই ভেবেছে, এখনও অনেক পেছনে রয়েছে অদৃশ্য মানব। লোকজন তাই উল্টো দিকে ছুটছে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন কেম্প। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে তাকালেন। হাপরের মতো দ্রুত ওঠা-নামা করছে বুক। 'ওদিকে নয়! এখানেই আছে কোথাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'সার বেঁধে

দাঁড়িয়ে চারদিক থেকে—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না কেম্প। পাশেই একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। মারাত্মক একটা ঘুসি পড়লো তাঁর কানের নিচে। ঘুরে পড়ে যেতে যেতেও প্রাণপণ চেষ্টায় দু'পায়ে খাড়া রাখলেন নিজেকে, ঘুরে দাঁড়ালেন অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি। আন্দাজে ঘুসি চালালেন শূন্যে। লাভ হলো না। অদৃশ্য দ্বিতীয় ঘুসিটা লাগলো তাঁর চোয়ালের নিচে। এবার আর তাল সামলাতে পারলেন না কেম্প, চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ওপর চেপে বসলো একটা হাঁটু। অদৃশ্য দু'টি হাত সজোরে চেপে ধরলো তাঁর গলা, একটা হাতের চাপ কিছু কম মনে হলো। অদৃশ্য কব্জিদু'টো খামচে ধরলেন কেম্প দাঁতে দাঁত চেপে। ব্যথায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো আক্রমণকারী। পরমুহূর্তে কেম্প দেখতে পেলেন, ভয়ঙ্কর বেগে প্রকাণ্ড একখানা কোদাল নেমে এলো ওপর থেকে, আকাশের গায়ে পলকের জন্য দেখা গেল একজন মজুরের ঘর্মাক্ত লালচে মুখ। ধপ্ করে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। ভেজা ভেজা কিছু একটা ছিটকে পড়লো কেম্পের মুখে। হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল গলায় চেপে বসা হাতদুটো। টানা-হ্যাঁচড়া করে নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিলেন কেম্প। হাতে ঠেকলো শিথিল একটা কাঁধ।। সেটা আঁকড়ে ধরে গড়ান দিয়ে ওপরে চলে এলেন। অদৃশ্য দু'টো কনুই শক্ত করে চেপে ধরলেন মাটির সঙ্গে। 'ধরেছি! ধরেছি আমি!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'জলদি! জলদি ধরো! এদিকে এসো! এই যে, মাটিতে! পা ধরো!'

মুহূর্তের মধ্যে একসঙ্গে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সবাই। হঠাৎ কোনো আগন্তুকের কাছে মনে হতে পারে, প্রচণ্ড উদ্দাম রাগবী

ফুটবল খেলা চলছে রাস্তায়। কেম্পের চিৎকারের পর থেকে আর কোনো চেঁচামেচি শোনা যায়নি—ভারি নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অবিরাম ঘুসি ও লাথির শব্দ।

অকস্মাৎ একসঙ্গে কয়েকজন ছিটকে পড়ে গেল এদিক-ওদিক। প্রচণ্ড শক্তিতে সবাইকে ঠেলে ফেলে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছে অদৃশ্য মানব। কেম্প তবু সেঁটে রয়েছেন সামনাসামনি—যেন দুর্দান্ত এক হাউণ্ড পলায়নপর হরিণের টুঁটি চেপে ধরে আছে। অসংখ্য হাত এখনও সমানে পিটিয়ে চলেছে অদৃশ্য শত্রুকে, ছিঁড়ে-খুড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে তার দেহ। ট্রাম-কনডাকটর হঠাৎ তার গলা এবং কাঁধ হাতে পেয়ে আবার টেনে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো তাকে।

তৎক্ষণাৎ আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই ঢাকা পড়ে গেল অদৃশ্য দেহটা। পর পর বেশ কিছু লাথি পড়লো সশব্দে। হঠাৎ তীব্র একটা কাতর গোঙানি শোনা গেল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, ছেড়ে দাও!'

পরমুহূর্তে রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠটা। মনে হলো গলা টিপে ধরেছে কেউ।

'সরো! সরে যাও,সরো বলছি!' কেম্পের উত্তেজিত গলা শোনা গেল। ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন তিনি তাগড়া লোকগুলোকে। 'জখম হয়ে পড়ে আছে ও। সরে দাঁড়াও সবাই!'

বেশ কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর ফাঁকা একটু জায়গা করা গেল। জোড়া জোড়া অসংখ্য কৌতূহলী চোখ বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে কেম্পকে। বৃত্তের মাঝখানে কেম্প হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। মনে হচ্ছে, মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে শূন্যে ভাসছে তাঁর হাঁটু। দু'হাত

দিয়ে চেপে ধরে আছেন অদৃশ্য দু'টি বাহু। তাঁর পেছনে একজন কনস্টেবল অদৃশ্য দু'পা ধরে আছে শক্ত হাতে।

'ছেড়ে দেবেন না, সাবধান,' রক্তাক্ত কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী মজুরটা বলে উঠলো, 'মরার ভান করে ঘাপটি মেরে আছে।'

'না, ভান করছে না,' সাবধানে হাঁটু তুলতে তুলতে বললেন ডক্টর কেম্প। তাঁর মুখের বেশকয়েক জায়গা ছ'ড়ে গেছে, লাল হয়ে উঠেছে। রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে ভালোভাবে কথা বলতে পারছেন না। মনে হলো, অদৃশ্য মানবের এক বাহু ছেড়ে দিয়ে তিনি তার মুখে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছেন। 'মুখ একদম ভেজা,' বললেন তিনি। পরক্ষণেই আর্তনাদ করে উঠলেন, ঈশ্বর!'

চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে কেম্প এক পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন মাটির ওপর। ভিড়ের ভেতর ঠেলাঠেলি চাপাচাপি বাড়ছে। অনবরত আরো লোকজন দৌড়ে এসে যোগ দিচ্ছে। ঘরবাড়ির ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল যারা, তারা সবাই বেরুচ্ছে এখন একে একে। জলি ক্রিকেটার্স-এর দরজা কখন যেন খুলে গেছে হাট হ'য়ে। প্রায় কিছুই বলতে হচ্ছে না কাউকে।

দেহটা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখছেন কেম্প। তাঁর হাত যেন শূন্যের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'নিঃশ্বাস পড়েছে না,' বলে উঠলেন তিনি। এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন, 'হার্টবিট নেই।' বোধ হয় বুক থেকে একপাশে স'রে গেল তাঁর হাত, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন, 'ইহ্!'

'দেখো, দেখো!' সরু গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে চমকে ফিরে তাকালো সবাই। প্রকাণ্ডদেহী মজুরটার হাতের নিচ দিয়ে এক

বৃদ্ধার ভয়ার্ত মুখ দেখা যাচ্ছে। বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার চোখ-দু'টো। শীর্ণ একটা আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাতে চাইছে সে মাটিতে।

একসঙ্গে সবার দৃষ্টি চলে গেল সেদিকে।

কাচের মতো আবছা, স্বচ্ছ একটা হাত—শিথিলভাবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, ভেতরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ধমনী, শিরা, হাড় এবং স্নায়ু। ক্রমেই ধোঁয়াটে চেহারা নিচ্ছে হাতখানা স্বচ্ছতা কমে আসছে ধীরে ধীরে।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠলো কনস্টেবল। 'এই যে পা দেখা যাচ্ছে এখানে!'

সবাই দেখতে পেলো, হাত এবং পা থেকে শুরু হয়ে অত্যন্ত ধীরে অদ্ভুত সেই পরিবর্তন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। প্রথমে ফুটে উঠছে সরু সরু শাদা স্নায়ু, তারপর অস্পষ্ট ধূসর ছায়ার মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে সেগুলোকে ঘিরে। স্বচ্ছ হাড়গোড়, জটিল শিরা-উপশিরা স্বচ্ছতা হারিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। মাংস এবং চামড়া ধীরে ধীরে হালকা কুয়াশার মতো ফুটে উঠে দ্রুত ঘন নিরেট রূপ ধারণ করছে। দেখতে দেখতে স্পষ্ট হয়ে উঠলো চওড়া কাঁধ, খোঁতলানো বিশাল বুক, ক্ষতবিক্ষত একটি প্রকাণ্ড মানবদেহ।

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কেম্প। লোকজন পিছিয়ে গিয়ে জায়গা করে দিলো। মাটির ওপর অসহায় ভঙ্গিতে চিত হয়ে পড়ে আছে বছর তিরিশেক বয়সের এক যুবকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত নগ্ন দেহ। চুল-দাড়ি ধবধবে শাদা, বয়সের কারণে নয়—লোকটা অ্যালবিনো। চোখদুটো গারনেটের মতো স্বচ্ছ লাল। দু'হাত

মুঠি পাকানো। উন্মুক্ত দুই চোখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে ক্রোধ এবং ভীতি।

'মুখ ঢেকে দাও!' ভিড়ের ভেতর থেকে একজনের আর্তস্বর শোনা গেল, 'ঈশ্বরের দোহাই, ওর মুখ ঢেকে দাও!'

তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে ভিড় ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়াতেই এক-সঙ্গে অনেকগুলো হাত তাদের বাধা দিয়ে সোজা ভিড়ের বাইরে ফেরত পাঠিয়ে দিলো।

একজন একখানা চাদর নিয়ে এলো জলি ক্রিকেটার্স থেকে। দেহটা ঢাকা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সরাইখানার ভেতরে।

উপসংহার

নতুন একটি ছোট্ট সরাইখানা তৈরি হয়েছে পোর্ট স্টো-র কাছে। নাম 'অদৃশ্য মানব'। সাইনবোর্ডে একটা হ্যাট এবং একজোড়া বুটের ছবি ছাড়া আর কিছু নেই।

নতুন এই সরাইখানার মালিক লোকটি বেঁটে এবং মোটাসোটা। সিলিণ্ডারের মতো লম্বাটে তার নাক, চুলগুলো সরু সরু তারের মতো, মুখের এখানে-ওখানে লালচে ছোপ বার-এ জাঁকিয়ে বসে দেদার মদ্যপান করতে করতে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে সে গড়গড় করে শুনিয়ে দেবে অদৃশ্য মানব নিহত হবার পর যা যা ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। তার কাছে যে-সব টাকা-কড়ি পাওয়া গিয়েছিল, কি করে উকিলের দল সে-সব খসাবার চেষ্টা করেছিল তা-ও বিস্তারিত বর্ণনা করবে সে।

'টাকার গায়ে তো আর নাম লেখা থাকে না,' বলবে সে, 'কিছুতেই যখন পেরে উঠলো না, তখন ওরা বলে বেড়াতে লাগলো, আমি নাকি এক আস্ত টাকার কুমির! আচ্ছা দেখুন তো, আমাকে দেখে কি তা-ই মনে হয়?—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, এম্পায়ার মিউজিক হল-এ নিজের মুখে অদৃশ্য মানবের

গল্প শোনাবো আমি নিয়মিত—পারিশ্রমিক হিসেবে পাবো প্রতি রাতে এক গিনি।'

লোকটার কথার স্রোত বন্ধ করতে চাইলে একটিমাত্র প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে হবে : তিনটে বাঁধানো খাতা নাকি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি ?

তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার করবে, খাতাগুলো সে দেখেছে। অনুযোগ ফুটে উঠবে তার কণ্ঠে, সবাই ভাবে সে-ই লুকিয়ে রেখেছে খাতাগুলো ! একদম বাজে কথা ! 'অদৃশ্য মানবকে ধোঁকা দিয়ে পোর্ট স্টো-র দিকে আমি পালিয়ে আসবার পর খাতাগুলো ওই অদৃশ্য মানব ই লুকিয়ে ফেলেছিল। অথচ মিস্টার কেম্প সবার কাছে বলে বেড়িয়েছেন খাতাগুলো নাকি আমি গায়েব করেছি।'

এ-পর্যন্ত বলেই হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যাবে সে। চোরাচোখে লক্ষ্য করবে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাস নাড়া চাড়া করবে। এক ফাঁকে হুট করে বেরিয়ে যাবে বার থেকে

বিয়ে করেনি সেও আজ, বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নেই। জামাকাপড়ের বাইরের বোতামগুলোর অস্তিত্ব তাকে এখন ঠিকঠাক রক্ষা করে চলতে হয়, কিন্তু ভেতরের পোশাকের অনেক জায়গার অনেক কাজ এখনও সে সুতো কিংবা রশি দিয়েই চালিয়ে নেয়। ভাবুক লোক সে, চলনে-বলনে ধীরগম্ভীর। বিজ্ঞতা এবং মিতব্যয়িতার জন্যে গ্রামে তার সুখ্যাতি আছে। তাছাড়া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের রাস্তাঘাট সম্পর্কে তার মতো গভীর জ্ঞান রাখে এমন লোক আশপাশের দু'-দশ গ্রামে নেই।

প্রতি রোববার সকালে এবং প্রতিদিন রাত দশটার পর বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেয় সে। সামান্য পানি-

মেশানো এক গ্লাস জিন হাতে নিয়ে সবার অগোচরে গিয়ে ঢোকে বার পারলারে। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দেয়। জানালার পর্দা ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে। এমনকি টেবিলের নিচেও উঁকি দিয়ে দেখতে ভোলে না। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না সে-বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে চাবি ঘুরিয়ে নিঃশব্দে কাবার্ড খোলে সে। তারপর কাবার্ডের ভেতরে রাখা একটা বাক্সের তালা খুলে বাক্সের একটা ড্রয়ার থেকে বের করে বাদামি চামড়ায় বাঁধানো তিনখানা খাতা। টেবিলের মাঝখানে সযত্নে নামিয়ে রাখে সেগুলো। মলাটে অনেক ঝড়-ঝাপটার চিহ্ন। সবুজ শ্যাওলার রঙে ছোপানো বাইরের দিকটা। কিছুদিন নালায় বসবাস করতে হয়েছিল খাতাগুলোকে, নোংরা পানিতে কিছু কিছু পৃষ্ঠা ধুয়ে ফাঁকা হয়ে গেছে।

একখানা আর্ম চেয়ারে আরাম করে বসে গৃহস্বামী লম্বা মাটির পাইপে তামাক ভরে ধীরেসুস্থে। খাতাগুলোর ওপর থেকে তার লোলুপ দৃষ্টি সরে না একবারও। তারপর একখানা খাতা টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে একের পর এক পৃষ্ঠা উলটে যেতে থাকে। একবার ওলটায় বাঁ থেকে ডাইনে, একবার ডান থেকে বাঁয়ে।

ভুরু কুঁচকে ওঠে লোকটার, ঠোঁটদু'টো প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে কাঁপতে থাকে 'হুম্, ছোট ছোট দু'টো আঁকড়ি ওপরে, একটা কাটা-চিহ্ন, তারপর···তারপর—হিজিবিজি! বাস্ রে, মাথা বটে!'

অনেকক্ষণ মাথা খাটিয়ে অবশেষে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেয় সে। পাইপের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। 'রহস্যে ঠাসা একেবারে,' ফিস্ ফিস্ করে বলে সে, 'অদ্ভুত

সব রহস্য ! একবার যদি একটুখানি মাথায় ঢোকে—ঈশ্বর !'

চোখদু'টো চকচক করে ওঠে লোকটার। 'ওর মতো আমি কক্ষণো করবো না, আমি শুধু—' ব'লে ঘন ঘন পাইপে টান দেয়।

ধীরে ধীরে আশ্চর্য অনির্বাণ এক স্বপ্নের ভেতর তলিয়ে যায় সে।

: শেষ :—